ISSN 1605-7023

অষ্টম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১০, নভেম্বর-২০০৩

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

অষ্টম বর্ষ সংখ্যা | কার্তিক ১৪১০

সম্পাদনা পর্ষদ

আহবাব আহমদ	চেয়ারম্যান
শেখ আলতাফ আলী	সদস্য
মোহাম্মদ শফিউল আলম	সদস্য
সৈয়দ মাহবুব হাসান	সদস্য
নূর মোহাম্মদ	সদস্য
ডঃ মীর ওবায়দুর রহমান	সদস্য
ডঃ এম. মতিউর রহমান	সদস্য
সৈয়দ শামসুল আলম	সদস্য

সম্পাদক : বণিক গৌর সুন্দর

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রসাশন পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 8th Year Issue, Kartik, 1410
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ চৈত্র, ১৪১১/মার্চ, ২০০৪

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার ঃ ০৫০.৩৫

টেলিফোন ঃ ৭৭১০০১০-১৫ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স ঃ ৭৭১০০২৯
ই-মেইল ঃ bpatc@sdnbd.org
ওয়েব ঃ http:/www.bpatc.org

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ-এর ঠিকানা

প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

বিনিময় ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে ঃ প্রকাশ প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
২৩/এফ-১ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ৮৬১১৭৬৬, ৯৬৬৯৫০০

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধকারদের। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

সমাজ সংগঠনে ভৌগলিক উপাদান এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট ১

আনিসুর রহমান খান

বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও
পরিবেশ ব্যবস্থাপনা: অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন কৌশল ২৫

মল্লিক আনোয়ার হোসেন

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণনীতি ও নৈতিকতা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ৪৭

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ

বাংলাদেশের শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা ৭৩

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষি খাতের ভূমিকা: ৯৭
শাকসবজি উপখাতের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা

সৈয়দ আবু রায়হান

ভূমি ব্যবস্থাপনা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ১১৫

ব্যোমকেশ তালুকদার

নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রবণতা: ১৩৯
গ্রাম পর্যায়ে একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন

বাংলাদেশে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ১৬৩

মোঃ আবুল হোসেন
ও
মুহঃ মিজানুর রহমান

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০

ISSN-1605-7023

সমাজ সংগঠনে ভৌগলিক উপাদান এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

আনিসুর রহমান খান*

Abstract: Since the inception of man's history it has been observed that the geographical phenomena/factors play a predominant role in shaping society. Hence it has got paramount importance to the sociologists to be interested in geographical factors and in the manner they enter our lives as social beings. Different social institutions & associations, social processes, rites & rituals, social codes, customs & habits, culture-either material or immaterial, historical destinies and other dynamics of social life are inextricably influenced by the geographical factors. It virtually means almost all social phenomena have been attributed to geographical influences. In the light of sociological thinkings and ideas this fact is perceived to be one of the prominent doctrines in the process of shaping of any social system. Here in this write-up it has been attempted to explore the links between geography and society in a wider dimention in particular, and additionally the context of Bangladesh has also been focused on in persuation of understanding the structure of the society in general.

ভূমিকা ঃ

মানুষ ও প্রকৃতি অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, নানাদিক দিয়ে প্রকৃতি মানুষকে স্পর্শ এবং প্রভাবিত করে। অন্যদিকে মানুষও তার বুদ্ধিমত্তা ও বিচিত্র কৌশল প্রয়োগে প্রকৃতিকে বশে আনার চেষ্টা করে। সৃষ্টির ঊষালগ্ন হতেই মানুষ প্রকৃতির সংগে প্রতিকূলতার সংগ্রামে লিপ্ত। সভ্যতার আবির্ভাব এই সুপ্রাচীন সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসেবেই উদ্ভূত। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Ogburn তাই বলেন, "There is a popular belief that climate produces races and races in turn produce civilization" (মহাপাত্র ঃ ২০০০, পৃ-১৬৭)। মূল কথা হল, প্রকৃতির সংগে সংগতি রেখেই মানুষকে জীবন ধারণ করতে হয়। প্রকৃতির ক্রোড়েই মানুষ এবং তার সমাজ ব্যবস্থার অবস্থান। সমাজ ব্যবস্থার রূপরেখা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয় প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষার মাধ্যমেই। প্রাকৃতিক পরিবেশকে আবার বোঝান হয় ভৌগলিক পরিবেশ রূপে। সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে সমাজ চারটি মৌল উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় যেমন, (১) ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ সংক্রান্ত উপাদান, (২) জৈবিক বা বংশগত উপাদান, (৩) উৎপাদন পদ্ধতি বা সংস্কৃতি সংক্রান্ত উপাদান এবং (৪) সামাজিক বা সমষ্টিগত বা শ্রেণীগত উপাদান (করিম ঃ ১৯৮৯, পৃ-৪১)। আর এই চারটি উপাদানের মধ্যে সমাজ রূপায়নে ভৌগলিক উপাদানের তাৎপর্যপূর্ণ

---

* সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিক সত্যতা হল, কোন দেশের ভৌগলিক অবস্থান এর অধিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনধারা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। এই সত্যের ধারাবাহিকতায় প্রাচীন, মধ্যযুগ এবং আধুনিককালের অনেক সমাজবিজ্ঞানীই যেমন, ইবনে খালদুন, মন্টেস্কু, বদিন, হানটিংটন, ম্যাকইভার, সরোকিন প্রমুখ তাঁদের রচনায় তা বিচিত্ররূপ ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন (রহমান ঃ ১৯৮৮, পৃ-৯৪)।

বর্তমান আলোচনায় আমরা দেখাতে চেষ্টা করব ভৌগলিক উপাদান কিভাবে যুগপরিক্রমায় মানব আচরণ, সমাজ সংগঠন এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার নানা আঙ্গিক রূপায়নে অবদান রাখছে এবং সেই সাথে এই দেশ ও সমাজের পরিচয় সন্ধানের অপরিহার্য বাস্তবতায় এর ব্যাপ্ততা। এজন্য সামগ্রিকভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে হবে সমাজতাত্ত্বিক, কেননা সমাজবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত সামাজিক অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে দেখাতে চেষ্টা করেছেন সমাজ সংগঠনে জড়িত বিভিন্ন সামাজিক প্রপঞ্চগুলো (phenomena) (ভৌগলিক উপাদান দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়। আর এই প্রেক্ষাপটে সমাজবিজ্ঞানী Sorokin বলেছেন, "Distribution of the population on the surface of the earth, the density of population, racial differences, the character of economic, political and social organization, the progress and decay of nations, the character of religious ideas and beliefs, the forms of the family and of marriage, health, fertility, intelligence, crimes, suicide, cultural achievements, the number of men of genius, the traits of literature, poetry and civilization, the movement of economic and social life, in brief, almost all social phenomena have been attributed to geographical influences" (Sorokin : 1928, p-100,101), এভাবে সমাজ ও ভৌগলিক উপাদানের পারস্পরিক যুগসূত্রতার সন্ধান নিরপণই বর্তমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য।

সমাজ রূপায়নে ভৌগলিক প্রভাব–সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

আদিকাল হতে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার কথা বিবেচনায় আনলে আমরা সমাজ সংগঠনে নানাবিধ ভৌগলিক উপাদানের প্রভাবকে উপেক্ষা করতে পারি না। ভৌগলিক পরিবেশকে মানুষের জীবন ও সমাজের অপরিহার্য শর্তরূপে অভিহিত করা হয়। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, আচার-ব্যবহারসহ সমাজ কাঠামো ও সামাজিক সম্পর্ক, সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার বিকাশ সম্পর্কিত নানাদিকের উপর ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব নিরূপণে বিভিন্ন সমাজতত্ত্ববিদদের রয়েছে দুর্নিবার আকর্ষণ (মিয়া ঃ ১৯৮৭, পৃ-২৪৫)। যাহোক, মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে নানাবিধ ভৌগলিক উপাদান বা এককথায় ভৌগলিক বা প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে স্বচ্ছ

ধারণা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভৌগলিক পরিবেশ বলতে সাধারণ ভৌগলিক ধারণায় জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা, আবহাওয়া, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি, আকাশ, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি নানা উপাদানের কথা বলা হয়। বস্তুতঃ এই তালিকা অতি দীর্ঘ এবং কোন কোন উপাদান ব্যাপক অর্থে ঠিক ভৌগলিক পরিবেশের অন্তর্গত তার উল্লেখ কষ্টসাধ্য (মহাপাত্র ঃ ২০০০, পৃ-১৬৭)। আর যেহেতু আমরা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনায় অগ্রসর হব তাই দেখা যাক প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিকরা ভৌগলিক পরিবেশ সংক্রান্ত উপাদানগুলো সম্পর্কে কিভাবে নিজেদের ধারণা ব্যক্ত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী Sorokin ও সমাজবিজ্ঞানী Maclver এর উক্তিগুলো এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। সরোকিন ভৌগলিক পরিবেশের ব্যাখ্যায় বলেন, "By this concept we mean all cosmic conditions and phenomena which exist independent of man's activity, which are not created by man and which change and vary through their own spontaneity, independent of man's existence and activity. In other words, if we take the total environment of a man or that of a social group and subtract from it all environmental agencies directly or indirectly created or changed through man's existence and activity, we will have left approximately what is known as geographical environment" (Sorokin: 1928, p-101,102). অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকইভার ভৌগলিক উপাদান সম্পর্কে বলেন, "The geographical environment consists of those conditions that nature provides for man. It includes earth's surface with all its physical features and natural resources..........." (Maclver: 1965, p-98). তিনি আরও বলেন, "We may view briefly the factors which together make up the geographical environment, for some are seemingly beyond the control of man while others in various degrees bear the imprint of his activity" (Ibid, P-98).

যাহোক, মূল কথা হল ভৌগলিক উপাদানসমূহ হল প্রকৃতির সেইসব উপাদান যেগুলোর সৃষ্টি ও সার্বিক নিয়মতান্ত্রিকতায় ব্যক্তিমানসের কোন ভূমিকা নেই, কিন্তু যেহেতু সমাজের উৎপত্তি এবং বিকাশে যুগ যুগ ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তাই সমাজতত্ত্বের মূল আলোচনায় সমাজ এবং ভূগোলের পারস্পরিক সম্পর্ক এক অনিবার্য বন্ধনে আবদ্ধ। আর এক্ষণে দেখে নেয়া যাক্ 'সমাজ' নামক প্রত্যয়টিকে সমাজবিজ্ঞানীরা কিভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন।

মানুষ সামাজিক জীব। আদিকাল হতে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে আসছে। গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টটল বলেছেন, "যে লোক সমাজের সভ্য নয়, সে হয় দেবতা না হয় পশু" আর এ উক্তির বিশ্লেষণ হল সমাজেই মানুষ জন্মগ্রহণ করে এবং

জীবন অতিবাহিত করে। সমাজের অত্যাবশ্যকীয়তা সম্পর্কে Maclver তাই বলেছেন, "Man is dependant on society for protection, comfort, nurture, education, equipment, opportunity, and the multitude of definite services which society provides. He is dependant on society for the content of his thoughts, his dreams, his aspirations, even many of his maladies of mind and body. His birth in society brings with it the absolute need of society itself" (Maclver: 1965, P-8). যাহোক, এই অত্যাবশ্যকীয় প্রাচীন মানবিক সংগঠনের বিভিন্ন আঙ্গিক, যার সৃষ্টি হয়েছিল নিরাপত্তা, বংশবৃদ্ধি এবং আন্তঃ ব্যক্তিসম্পর্ক বৃদ্ধির মানসে, বিশ্লেষণই সমাজতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়। এজন্যই সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে সবচাইতে মূল্যবান প্রত্যয় হচ্ছে 'সমাজ'। আর তাঁরা নানাভাবে 'সমাজ' শব্দটিকে ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞায়িত করেছেন এবং নানা তথ্য ও তত্ত্বের সমাবেশে সমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সমাজ বস্তুতঃপক্ষে একটি বিমূর্ত ধারণা। এর কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যিক অবয়ব নেই। প্রথিতযশা সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজ সম্পর্কে যেসব মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করে আমরা এর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করব। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস বলেন, "A member of like-minded individuals who know and enjoy their like-mindedness, and are therefore, able to work together for common ends" (মহাপাত্র ঃ ২০০৩, পৃ-৮০)।

জিসবার্ট বলেন, "সমাজ হল সামাজিক সম্পর্কের জটিল জাল, যে সম্পর্কের দ্বারা প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গীদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত" (মিয়া ঃ ১৯৮৭, পৃ-৮৯)। সমাজবিজ্ঞানী রিটারের অভিমত হল, "Just as life is not a thing but a process of living. So society is not a thing but a process of association" (মহাপত্র ঃ ২০০০, পৃ-৮০)। সমাজ সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকইভার ও পেজ এর মতামত হল, "Society is a system of usage and procedures, of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and liberties. This ever-changing, complex system we call society. It is the web of social relationships. And it is always changing" (Maclver: 1963, P-5).

সমাজ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞা ও মতামত অনুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সমাজ হল একটি জনগোষ্ঠী, যারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ। আর এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তারা নিজস্ব রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, প্রথা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে এবং স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে উদ্ভাসিত হয়। আরও সহজ কথায় বলতে গেলে সমাজ যদি সামাজিক সম্পর্কের জাল হয়, তবে এই জাল গড়ে উঠে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান,

প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতি এবং নানাবিদ বস্তুগত উপকরণের উপর ভিত্তি করে, আর এসব কিছু ও তাদের কার্যক্রমকে নিয়েই গড়ে উঠে সমাজ বা সমাজ কাঠামো। এখানে উল্লেখ্য যে, সমাজবিজ্ঞানীরা সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয়রূপ প্রত্যয়গত ধারণায় সমাজ সংগঠিত হয় বলে মনে করেন। ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে সমগ্র মানব জাতিকেই বুঝায়, আর সংকীর্ণ অর্থে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনসমষ্টি দ্বারা গড়ে উঠে সমাজ। এজন্য সমাজকে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা যায়।

আর আমরা সমাজ সংগঠনে ব্যাপক অর্থে বিশ্বসমাজ ব্যবস্থার রূপায়নে এবং সংকীর্ণ অর্থে বাংলাদেশের সমাজ সংগঠনে ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব আলোচনা করতে চেষ্টা করব। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করে এমন উপাদানগুলোর মধ্যে ভৌগলিক উপাদানের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এজন্যই সমাজজীবনে ভৌগলিক নিয়ন্ত্রণবাদ (Geographical Determinism) সম্পর্কে তাত্ত্বিক অবয়ব গড়ে উঠেছে। এ প্রসংগে প্রখ্যাত ভূগোলবিদ হান্টিংটনের Mainsprings of Civilization এবং বাকলের History of Civilization in England গ্রন্থদ্বয়ে এই নিয়ন্ত্রণবাদ সম্পর্কে যুগান্তকারী আলোচনা করা হয়েছে। এই বইগুলো ঠিক ঐ সময়ে প্রকাশিত যখন কার্ল মার্কস তাঁর Das Capital গ্রন্থে দেখালেন কিভাবে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন হয়। যাকে ইতিহাসে Economic Determinism বলা হয়েছে। অন্যদিকে হানটিংটন ও বাকলেও দেখিয়েছেন কিভাবে ভৌগলিক উপাদানসমূহ সমাজ সংগঠনে ভূমিকা পালন করে। বস্তুতঃ সমাজ বিশ্লেষণে ভৌগলিক নিয়ন্ত্রণবাদ তাই বিশেষ স্থান দখল করে আছে (করিম ঃ ১৯৮৯, পৃ-৪৩)। তবে উল্লেখ্য সমাজজীবনে ভৌগলিক প্রভাব সম্পর্কে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিক মন্টেস্কু সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন (নকী ও ইসলাম ঃ ১৯৯৩, পৃ-৭৭)। সমাজজীবনে কতিপয় ভৌগলিক প্রভাবের স্বরূপ নিম্নে আলোচিত হল;

১। ভৌগলিক পরিবেশ ও সভ্যতার উৎপত্তি এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ প্রাচীনকাল হতেই সমাজচিন্তাবিদগণ মানব সভ্যতার উন্মেষ ও তার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে ভৌগলিক পরিবেশের অনুকূলতার উপর বিশেষ গুরত্ব আরোপ করেছেন। খাদ্যের যোগান, বসবাসের উপযোগী ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দিক দিয়ে সুবিধাজনক স্থানেই সভ্যতা বা সমাজের বিকাশ শুরু হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ও নদী তীরবর্তী স্থানগুলোর ভৌগলিক পরিবেশ অনুকূল হবার ফলে সে সব অঞ্চল গড়ে উঠেছে মানব সভ্যতা (করিমঃ ১৯৮৯, পৃ-৪৪)। উদাহরণস্বরূপ, আমরা সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতা এবং নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতার কথা উল্লেখ করতে পারি। বেশীরভাগ নদী তীরবর্তী সভ্যতাগুলো ছিল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বলয়ে অবস্থিত, যা কার্যতঃ কৃষিকাজের জন্যও উপযোগী। আর আমরা জানি কৃষির আবিষ্কারের ফলে

পরিবারভিত্তিক স্থায়ী সামাজিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়। অন্যদিকে সমাজবিজ্ঞানীরা আরও বলেন যাযাবর জাতিসমূহ দ্বারা কৃষিপ্রধান বা উর্বর ভূমির অধিকারী জাতিসমূহ বারবার আক্রান্ত হয়েছে এবং কালক্রমে গড়ে তুলেছে মানব সভ্যতা। এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে অঞ্চলভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব। অর্থাৎ অনুকূল তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, জলবায়ু ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে সভ্যতার বিকাশে অবদান রেখেছে। সমাজবিজ্ঞানী সরোকিন বলেন, "It seems evident that geographical areas which, according to their climate, soil, relief of surface, distribution of water, flora and fauna, are more conveniernt for human habitation and for satisfaction of human primary necessities, are to be more densely inhabited than the area less convenient in this respect" (Sorokin: 1928, P-106). এজন্যই নিবিড় অরণ্য, মরু ও পর্বতময় অঞ্চল এবং অতিমাত্রায় হিমেল জলবায়ুতে জনবসতি কম দেখা যায়, আর ক্ষেত্রবিশেষে এসব অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশও হয় ধীরলয়ে। এর সাথে আরও উল্লেখ্য, ভৌগলিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় অনেক অঞ্চলে সভ্যতার ছোঁয়া লেগেছে অনেক দেরীতে। পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র এসবের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে কাজ করেছে। আবার অনুকূল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন সমাজের দ্রুত মিলন ঘটিয়েছে, ফলে পরিপুষ্ট হয়েছে মানব সভ্যতা।

আধুনিক অনেক সমাজবিজ্ঞানী সভ্যতা বিকাশে শুধুমাত্র অনুকূল ভৌগলিক পরিবেশই ভূমিকা পালন করে এরূপ একপাক্ষিক ধারণার বিরুদ্ধে, বরং তাঁরা দেখিয়েছেন কিভাবে মানুষ বিপরীত পরিবেশকে পরাভূত করে প্রকৃতির উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এমন অনেক জায়গায় সভ্যতা গড়ে উঠেছে যেখানে অনুকূল পরিবেশ ছিল না বরং মানুষকে বিরূপ পরিবেশ জয় করেই সৃষ্টি করতে হয়েছিল। বিখ্যাত মায়া সভ্যতা এর অন্যতম উদাহরণ, যার জন্ম হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ার উষ্ণ অঞ্চলে। তাঁদের মতে ভৌগলিক পরিবেশের অবস্থানই জীবনকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ওয়ালিস ও উইলির উক্তিটি যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে, "Geographical environment is the cradle in which man's genius awaits the promptings of motives which give him mastery over his fate" (নকী ও ইসলাম ঃ ১৯৯৩, পৃ-৭৮)। ব্যাপারটি যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, মূল বিষয় হলো ভৌগলিক উপাদান সভ্যতার বিকাশ ও জনসংখ্যা বণ্টনে অনাদিকাল হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে সমাজ রূপায়নে যে সহায়তা করে আসছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

২। পৃথিবীর পরিক্রমণ ও আবর্তন ঃ পৃথিবীর পরিক্রমণ ও আবর্তন এক কথায় নানাবিধ মহাজাগতিক অবস্থা ও ঘটনা মানুষের চালচলন, কাজকর্ম ও আচার-আচরণকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। সূর্যের উদয়-অস্ত, দিন-রাত, ষড়ঋতুর

আবতৃন যা ঘটে পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমণের ফলে, আমাদের সামগ্রিক জীবনধারার বিভিন্ন আঙ্গিকে, সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। কোন কাজ কখন করা হবে তা দিনের আলো বা রাত্রির অন্ধকার বিবেচনা করে নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে ষড়ঋতুর ক্রমিক আবর্তন দ্বারা নির্ধারিত হয় পোষাক-পরিচ্ছদের ধরন, সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম, উৎসব, অর্থনৈতিক উদ্যম প্রভৃতি নানাকিছু। তাইত দেখা যায় শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষের জীবন-ধারণ পদ্ধতি ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের জীব-ধারণ পদ্ধতি মোটেই এক নয়, বরং বহুলাংশে পৃথক ও স্বতন্ত্র। অন্যদিকে কৃষি যাদের জীবিকা তাদের কাছে ষড়ঋতুর আবর্তন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, তাদের সারাবছরের কাজকর্ম এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ 'প্রকৃতির উপর বিভিন্ন বৃত্তি নির্ভরশীল' সমাজগুলোর জীবনধারায় পৃথিবীর পরিক্রমণ ও আবর্তন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে (কর ঃ ১৯৯২, পৃ-৩৯, ৪০ ও মহাপাত্রঃ ২০০০, পৃ-১৬৮)। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী লৌঈ এর পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি কিরঘিজ যাযাবর দলের সমাজ কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে "In the summer the Kirghiz are communists and in the winter individualists" (করিমঃ ১৯৮৯, পৃ-১১৮) এই যাযাবর জাতির ইতিহাসে দেখা যায় শীতে অতিরিক্ত তুষারপাতের ফলে তাদের চারণভূমির অভাব ঘটত। তাই ঐ সময় ব্যবহার উপযোগী চারণভূমির অধিকারে তাদের বিভিন্ন দলে বা ব্যক্তিতে যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত, কিন্তু গ্রীষ্মে চারণ ভূমির উপর সকলের অধিকারই থাকত যেহেতু ব্যবহার উপযোগী চারণভূমির অভাব হত না, তাই ব্যক্তিগত অধিকারের বালাই ছিল না (প্রাগুক্ত, পৃ-১৯)। অর্থাৎ ঋতু পরিবর্তন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আনে।

৩। ভৌগলিক উপাদান ও ধর্ম ঃ যে কোন সমাজ রূপায়নে ধর্ম হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। খুব সম্ভবতঃ সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। ধর্ম বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে একটি সমাজের কাঠামোর অনেক কিছু নির্ভর করে (আফসারউদ্দীন ঃ ১৯৮৪, পৃ-৪০-৪১)। ধর্মীয় চেতনাকে চিরন্তন ও শাশ্বত বলে মনে করা হলেও সমাজবিজ্ঞানের একজন ছাত্র মাত্রই মানেন যে, ধর্মীয় চেতনা নিতান্ত ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকেই এসেছে। ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যায় দেখা যায় প্রাচীনযুগে কৃষিকাজের সুবিধার জন্য জরা, ব্যাধি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্নরূপ ঈশ্বর চেতনার মধ্য দিয়ে তোষামোদ প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর দেবতাকে তোষামোদ করা থেকেই প্রাচীন সমাজে ধর্মের উৎপত্তি। তবে এই ধর্ম বা ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস বিভিন্ন ভৌগলিক পরিবেশ ও উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্নরূপে বিকশিত। উদাহরণস্বরূপ, উষ্ণ মরুভূমি অঞ্চলের লোকদের ধারণা স্বর্গ বেশ ঠাণ্ডা জায়গা ও নরক গরম জায়গা। শীতের দেশের লোকদের ধারণা উল্টো, সেখানে স্বর্গ গরম জায়গা ও নরক ঠাণ্ডা। ভৌগলিক পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে দেবতারও পরিবর্তন হয়। যাযাবর অবস্থায় আর্যদের প্রধান উপজীবিকা ছিল পশুচারণ, দিগন্তবিস্তৃত চারণভূমির উপর আকাশই ছিল

প্রকৃতির বড় প্রতিনিধি। তাই আকাশদেবতা দিয়ায়ূস ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে বড় দেবতা। কিন্তু তারা যখন ভারতে এসে কৃষিজীবন আরম্ভ করল তখন কৃষিকার্যের জন্য বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্রের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ল। ইন্দ্র হল সবচেয়ে বড় দেবতা, যে কিনা পূর্বে তাদের কাছে ছিল ছোট দরের দেবতা। অন্যদিকে আকাশদেবতা তার প্রাধান্য হারাল। বিভিন্ন সমাজে পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভূমিকা বা ওগুলোকে নিয়েই গড়ে উঠেছে দেবতার রূপ। ভারত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ, এসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাচীন হিন্দুরা বিভিন্ন দেবতার রূপ দিয়েছে। নীল নদের জলের উত্থান পতনের জন্যই মিশরীয়রা নীলনদের পূজা করত। কৃষিজীবী আর্যদের কাছে আবার গঙ্গাদেবীও পরম পবিত্র কেননা গঙ্গার জল কৃষির কাজে প্রয়োজন। দেশে দেশে শয়তানের রূপও ভিন্ন, নরওয়ের লোকেরা কুয়াশা ও তুষারকেই শয়তান বা দুষ্টদেবতা বলে মানে, কেননা এগুলো তাদের দৈনন্দিন কাজে প্রতিবন্ধক। মিশরীয়দের কাছে টাইফুন নামের অসহ্য উত্তপ্ত বায়ু হল শয়তান। এরূপ আমরা দেখতে পাই আদিম সমাজ হতেই পরিবেশ ও আর্থিক প্রয়োজনবোধ ধর্মকে নানারূপে বিকশিত করেছে এবং বর্তমানের উন্নত ধর্মজ্ঞানও এই প্রয়োজনবোধ থেকে খুব বেশী বাইরে যেতে পারেনি (আফসারউদ্দীন ঃ ১৯৮৪, পৃ-৩৪-৩৮)।

৪। **আর্থিক ব্যবস্থার উপর ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব ঃ** একটি সমাজের অর্থনীতিতে বা সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ঐ সমাজের ভৌগলিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ মান নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। মানুষ কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করবে তা অনেক ক্ষেত্রেই নির্ধারিত হয় ভৌগলিক পরিবেশ দ্বারা। এ প্রসংগে অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেব বলেন, “Man’s occupations also are largely influenced by the geographical factors” (মহাপাত্র ঃ ২০০০, পৃ-১৭০)। আমরা দেখি যেসব অঞ্চল উর্বর বা চাষবাসের সহায়ক, সেখানকার অধিবাসীরা কৃষির উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ সেখানে এক কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। অন্যদিকে শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পর্যাপ্ত কাঁচামাল বা খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যতা। সুতরাং যেখানে এসব সম্পদের সহজলভ্যতা রয়েছে সেখানে সাধারণত শিল্পভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠে। অন্যদিকে অর্থনীতিতে যাকে বলা হয় Localization of industry তার মূলেও আছে ভৌগলিক কারণ। উদাহরণস্বরূপ, কাছের ভারতবর্ষের কথা বলা যায়, ঝারখণ্ডের খনিজের প্রাচুর্যতার জন্য গড়ে উঠেছে জামশেদপুরে টাটার লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। উত্তর প্রদেশে প্রচুর আখ উৎপাদিত হয় বিধায় সেখানে প্রচুর সংখ্যক চিনি কল বর্তমান। আগ্রাকে কেন্দ্র করে মার্বেল শিল্প গড়ে উঠার কারণ কাছের জবলপুরের মার্বেল ও তার শিল্প ঐতিহ্য। তেমনি সমুদ্র উপকূলের অধিবাসীরা মৎস্যজীবী। সারা পৃথিবী জুড়ে এরূপ হাজারো রকম সমাজ রূপায়নের উদাহরণ মিলবে (করিম ঃ ১৯৮৯, পৃ-৪৬)। আর প্রকৃতি যেখানে মানুষকে আনুকূল্য করে না সেসব সমাজের মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। অন্যদিকে

প্রকৃতির দানে সমৃদ্ধ সমাজের জীবনযাত্রার ধরন, আহার-বিহার, সাজ-সজ্জায়, চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে বৈভবের প্রাচুর্য ফুটে উঠে। আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রায় তা স্পষ্ট (মহাপাত্র ঃ ২০০০, পৃ-১৭০)। জীবিকার উপর ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা না বললেই নয়, যেমন আমরা দেখি এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে নৈসর্গিক সৌন্দর্য ছাড়া অন্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। সুইজারল্যান্ড, নেপাল, ভারতের দার্জিলিং ইত্যাদি অঞ্চলের কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। সুতরাং পর্যটনের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে এসব সমাজের আর্থিক বুনিয়াদ–সুইজারল্যান্ডের প্রসংগে বিশেষভাবে বলা যায় সকল জাতির সংগে সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব বজায় রাখার মনোভাব ও রাষ্ট্রীয় নীতি উপরোক্ত প্রয়োজন হতেই উদ্ভূত। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, সমাজের আর্থিক ব্যবস্থা ভৌগলিক উপাদান দ্বারা বিকশিত হয়।

৫। ঘরবাড়ির ধরন, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন ও যোগাযোগ এবং খাদ্যাভ্যাসের উপর ভৌগলিক উপাদান এর প্রভাব ঃ ভৌগলিক উপাদান মানুষের বাসস্থান, খাদ্য, যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিকে প্রভাবিত করে। ঘরবাড়ির বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে ভৌগলিক উপাদানের উপর। ঘরবাড়ি তৈরীর উপকরণ যেসব অঞ্চলে যেরূপ পাওয়া যায় সেসব অঞ্চলের ঘরবাড়িও সেরূপ উপাদানে নির্মিত হয়। যেসব অঞ্চল বনাঞ্চলে সমৃদ্ধ, সেসব অঞ্চলের ঘর-বাড়িগুলো সাধারণতঃ কাঠ দ্বারা নির্মিত। পাহাড়ী অঞ্চলে কাঠের প্রাচুর্যতার জন্য বাসগৃহ নির্মিত হয় সাধারণত কাঠ দিয়ে। বরফাঞ্চলে এস্কিমোরা অন্য কিছু না পেয়ে বরফ দিয়েই ঘর বাঁধে। উপাদানের প্রাপ্যতা এবং সেই সাথে জলবায়ু ও প্রকৃতির গতি-প্রকৃতি ও চরিত্র অনুসারে ঘরবাড়ির আকৃতি ও গঠনশৈলী নির্ভর করে। জাপানে ভূমিকম্প হয় বিধায় সেখানে নিরাপত্তার বিবেচনায় ঘর তৈরীতে কাঠের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষণীয়। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের ঘরগুলোতে বাতাস গ্রহণের জন্য বেশী দরজা জানালা দেখা যায়, শীতপ্রধান অঞ্চলে ঠিক তার উল্টো এরূপ ভূপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে ঘরবাড়ির গঠন বৈশিষ্ট্য।

কোন সমাজের যানবাহনের ধরন কি হবে সেটাও ভৌগলিক পরিবেশ দ্বারা নির্ধারিত হয়। নদীমাতৃক দেশগুলোতে নৌকা, লঞ্চ বা ষ্টীমার ইত্যাদি প্রধান বাহন হিসেবে ব্যবহৃত। মরুভূমির বালুতে উট হচ্ছে বাহক, বরফ আবৃত দেশে কুকুরের টানা স্লেজগাড়ি। তেমনি ভারতের মত বিশাল দেশে যোগাযোগ রেলগাড়ির উপর নির্ভরশীলতা, আর ছোট দেশগুলোতে সড়কপথে যোগাযোগ হয় বেশী। দুর্গম যোগাযোগের অঞ্চলগুলো যুগে যুগে সভ্যতার আলো হতে দূরে থেকেছে। এক্ষেত্রে আদি আন্দামান দ্বীপবাসী ও এস্কিমোদর কথা বলা যায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে যোগাযোগ স্থাপিত হলে এখানকার সমাজকাঠামোতো আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ব্যবসা, বাণিজ্য, শহরায়ন, শিক্ষা ও কর্ম ইত্যাদি সবকিছুতেই সচলতা সৃষ্টি হয়,

উদ্ভব হয় নতুন শ্রেণী ব্যবস্থা। অন্যদিকে কোন সমাজের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদও ভৌগলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। শীতপ্রধান অঞ্চলে মোটা বা পশমী কাপড়ের প্রচলন, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে হালকা ও আরামদায়ক কাপড়ের ব্যবহার ভৌগলিক উপাদান দ্বারাই নির্ধারিত। আবার একই অঞ্চলে ঋতুভেদেও পোশাক ব্যবহারে বৈচিত্র্য দেখা যায়। গ্রীষ্মের সময়কার পোশাক একরকম, শীতে আবার অন্যরকম।

খাদ্যাভ্যাসের উপরও ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব অনস্বীকার্য। অঞ্চল ভিত্তিক খাদ্যের প্রাচুর্যতার উপর নির্ভরশীল খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য উপকরণের ধরন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমুদ্র উপকূলের অধিবাসীরা প্রাচুর্যতার জন্য প্রচুর মাছ খায়। অন্যদিকে যেসব অঞ্চলে বেশী ফল হয় সেসব অঞ্চলের লোকেরা ফল খায় প্রচুর। তেমনি দুধ বা অন্যান্য পানীয়ের ক্ষেত্রেও একই কথা। ধান, গম ইত্যাদি বিভিন্ন সমাজের প্রধান খাদ্য, কেননা এসব অঞ্চলে এগুলো প্রচুর উৎপন্ন হয়। কোন বিশেষ একটি খাদ্য উপকরণ একটি সমাজের সামগ্রিক সংস্কৃতিতে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, যেমন ইন্দোনেশিয়ায় নারিকেলের প্রাচুর্য। নারিকেল দিয়ে ঘরের ছাউনি, তৈজসপত্র তৈরীর পাশাপাশি প্রচুর খাবার তৈরী হয়। এসবকে সমাজবিজ্ঞানীরা coconut culture নামে অভিহিত করেছেন (করিম ঃ ১৯৮৯, পৃ-৪৪)। খাদ্য উপকরণ এভাবে সমাজের খাদ্যাভ্যাসের ধরন নির্ণয়ের পাশাপাশি সামগ্রিক সমাজকাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৬। বিবাহ ও পারিবারিক জীবনের উপর ভৌগলিক উপাদানের প্রভাব ঃ যে কোন সমাজ বিশ্লেষণে বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কারণ এর মধ্য দিয়েই বিস্তৃত হয় সামাজিক সম্পর্কের জাল। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আবহাওয়ার কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ছেলেমেয়েরা তুলনামূলকভাবে কম বয়সে যৌবনে পদার্পণ করে, ফলে অল্প বয়সে বিয়ের প্রয়োজন দেখা যায়। আর এজন্যই উষ্ণ অঞ্চলে অল্প বয়সেই পারিবারিক জীবন শুরু হয়। সমাজজীবনে এর আবার বিরূপ প্রভাবও আছে, যার প্রধান হল দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সমস্যাগুলো হল তালাক ও বিচ্ছিন্নতার হার বৃদ্ধি, যৌথ পরিবার ব্যবস্থার ভাঙ্গন, জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া, দারিদ্রতার হার বৃদ্ধি ইত্যাদি (রহমান ঃ ১৯৮৮, পৃ-৮৭)। বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা ভৌগলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হবার আরও নানা চিত্ররূপ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে কৃষি ভিত্তিক সমাজগুলোর কথা বলা যায়। এইসব সমাজের পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী হয়, কেননা কৃষিকাজের জন্য অধিক লোকের প্রয়োজন, যা প্রধানত পরিবারে বংশবৃদ্ধি করে কর্মী সংখ্যা বাড়ানো হয়। দ্বিতীয়ত, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা দৃঢ়রূপ সংগঠনের মাধ্যমেও এই প্রয়োজনীয়তা মেটানো হয়। অন্যদিকে কৃষি সমাজের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্ত্রীর ভূমিকা থাকায় বিবাহের পাত্রী নির্বাচনে গৃহস্থালী কাজ করার দক্ষতা বিশেষভাবে বিবেচিত হয় (করঃ ১৯৯২, পৃ-

৩১৩ ও ৩১৪)। সুতরাং দেখা যাবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন ভাবেই হোক ভৌগলিক পরিবেশ বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে।

৭। রাজনীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর ভৌগলিক প্রভাব ঃ রাজনীতি ও প্রশাসনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভৌগলিক পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। মন্টেস্কু, রিটার, র‍্যাটজেল, ম্যাটেউজ্জি থেকে শুরু করে মার্কস ও এঙ্গেলস এর মত বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিকরা রাজনীতি ও প্রশাসনের সংগে ভৌগলিক পরিবেশের সংশ্রব দেখতে পেয়েছেন। র‍্যাটজেল এর মতে ভৌগলিক পরিবেশের সাথে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট, আর এ সম্পর্কিত তাঁর ধারণার মূল বক্তব্য হল- "The population of the states with large territories, because of vastness of the abode, possesses a spirit of expansion and militarism, an optimism and youthfulness, and a psychology of growth. Within such social bodies there are much less racial and social conflicts than in those with a small territory" (Sorokin: 1928, P-178). এ ব্যাপারে মন্টেস্কুর বক্তব্য হল শীতল জলবায়ু ও পার্বত্য অঞ্চল স্বাধীনতার অনুকূলে। আর প্রাচ্যের সমতল ও উষ্ণ অঞ্চল একনায়কতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের অনুকূলে। তাইত ইউরোপের শীত প্রধান দেশে স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা লক্ষণীয় এবং এশীয় ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ বার বার স্বৈরতন্ত্রের কবলে পড়েছে। এরই আলোকে রুশো বলেন, "Liberty is not the fruit of all climates". ম্যাটেউজ্জিও দেখিয়েছেন কিভাবে প্রাচীন মিশর, আমেরিকা, পারস্য, গ্রীসের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন ভৌগলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর মতে নীল, ইউফ্রেতিস ও টাইগ্রীসের জল ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে ঐ সমস্ত অঞ্চলে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে উঠে। তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত উদাহরণটি উল্লেখযোগ্য "In Egypt, a centralized political depotism was due to the plains of the Nile and the Nile's irregular overflows. Every district needed water and tried to abduce it upon its territory. In this way many conflicts between the districts arose and the weaker ones suffered. In order to protect the rights of the weaker districts-----, Ancient Egypt had to create a political power which would be able to control the matter. In this way the Nile determined not only the physical but the political structure of Egypt also" (Sorokin : 1928, P-179).

মার্কস ও এঙ্গেলস এ সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরত্বের সংগে দেখেছেন। তাঁদের মতে ভৌগলিক কারণে পশ্চিম ইউরোপীয় কৃষি নির্ভর অঞ্চলে জলসেচের প্রয়োজন হয় নি। কারণ সারা বছর ধরেই ঐসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। অন্যদিকে প্রাচ্যে বৃষ্টিপাত ছিল বছরের নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত। তাই জলসেচের জন্য নদীগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে

অতি প্রাচীনকাল থেকেই গড়ে উঠেছে কৃষি সভ্যতা এবং তারই আলোকে অনড় বৃহৎ সাম্রাজ্য। আর এই বৃহৎ সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রেখেছে এর মধ্যে গড়ে উঠা আমলাতন্ত্র। মার্কস ও ওয়েবার দ্বারা প্রভাবিত সমসাময়িক আরেক পণ্ডিত মার্ল উইটফোগেল দেখান যে, প্রাচ্যের এই জলসেচ ব্যবস্থা এতই ব্যয়বহুল ছিল যে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে এই ব্যয় নির্বাহ কষ্টকর ছিল- ফলে প্রয়োজন হয় কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা। অর্থাৎ ভৌগলিক ব্যবস্থাই আমলাতন্ত্র গড়ে তুলতে সহায়ত করেছে (হোসেন ও ইমাম ঃ ১৯৯৬, পৃ-১০৮)। ইতিহাস বলে যে, কৃষি প্রধান এলাকায় অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে এবং ফলে সামাজিক স্তরায়ন সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো সাধারণত গণতন্ত্রের অনুকূলে। আর স্তরায়ন এত স্থায়ী নয় বলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে social mobility বেশী থাকায় যে কেউ সমাজের শীর্ষস্থান দখল করতে পারে। সেজন্য প্রাচীন এশিয়া ও ইউরোপের বাণিজ্য প্রধান শহরগুলোকে কেন্দ্র করে গণতন্ত্র গড়ে উঠেছিল।

অনুর্বর মরুভূমি, পাহাড়ী, পার্বত্য বা বন এলাকায় যেখানে জমির উৎপাদন শক্তি কম সেসব জায়গা রাষ্ট্রীয় শক্তির উৎপত্তিতে কোন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। কারণ অনেক তাত্ত্বিকদের মতে রাষ্ট্র ও প্রশাসন প্রধানতঃ সম্পত্তি রক্ষণের জন্যই প্রতিষ্ঠিত। এজন্য এসব জায়গায় সরকার ব্যবস্থা কোন দিনই শক্তিশালী রূপে পাওয়া যায় নি, কেননা ঐসব এলাকায় বহিঃআক্রমণের আশংকা ছিল কম। অন্যদিকে দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণেও হয়ত শক্তিশালী প্রশাসন ব্যবস্থার বিকাশ সম্ভব ছিল না। ভারতে বৃটিশ শাসনের দিকে নজর দিলে আমরা দেখতে পাই উপরের এসব কারণগুলোর জন্যই হয়ত দুরধিগম্য, বন ও পার্বত্য এলাকাগুলোতে প্রত্যক্ষ বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নি বা সম্ভবও ছিল না (করিম ঃ ১৯৮৯, পৃ-৪৮-৪০)।

৮। মানবপ্রকৃতি ও দক্ষতা ঃ মানবপ্রকৃতি ও দক্ষতার উপর বিভিন্ন ভৌগলিক উপাদান যেমন আলো, বাতাস, আর্দ্রতা, জলবায়ু এসবের প্রভাব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে জলবায়ু বা তাপমাত্রা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাপমাত্রা খুব বেশী-বা মাত্রাতিরিক্ত শীত হলে মানুষের স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। অত্যধিক তাপমাত্রায় মানুষ অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, মেজাজ হয় খিটখিটে এবং কাজ করার ইচ্ছা কমে যায়। হান্টিংটন তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন সাধারণত ৬৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রা কায়িক পরিশ্রমের জন্য আদর্শ, অন্যদিকে ৩৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা ৪০ডিগ্রী ফারেনহাইট উৎকৃষ্ট মানসিক কাজের ক্ষেত্রে (Sorokin: 1928, P-150)। অর্থাৎ নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া মানুষের কর্মদক্ষতাকে উদ্দীপ্ত করে। এজন্যই সমাজবিজ্ঞানী রস বলেছেন "It is in the intermediate climates that such traits flourish as energy, ambitions, self reliance,

industry and thrift" (মহাপাত্র ঃ ২০০০, পৃঃ-১৬৮)। আরও উল্লেখ্য, প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ অঞ্চলের মানুষ rough & tough এবং কম আবেগপ্রবন। আর এজন্য national character বলে একটি কথা চালু আছে। যেটা অঞ্চলভিত্তিক জনগণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। অন্যদিকে মানব অপরাধ প্রবণতার সাথে ভৌগলিক উপাদানসমূহের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ সংস্রব। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেব এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী ডুরখাইমের মতামত ব্যক্ত করে বলেন "According to Durkhaim, there is a close relation between seasons and cirminal activity" (মহাপাত্র ঃ ২০০০, পৃ-১৬৯)। ফরাসী অপরাধবিজ্ঞানী Lomboros অপরাধের কারণ খুঁজতে গিয়ে ভৌগলিক পরিবেশকে দায়ী করেছেন। তাঁর মতে অপরাধ সমতলভূমিতে সবচেয়ে কম সংগঠিত হয়। পাহাড়ী অঞ্চলে কিছুটা, কিন্তু সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে পার্বত্য অঞ্চলে। কেননা, এর অন্য কারণ হল সমতল অঞ্চলের তুলনায় পাহাড়ী অঞ্চলে অপরাধীরা সহজে লুকিয়ে থাকতে পারে (নকী ও ইসলাম ঃ ১৯৯৩, পৃ-৮১)। বিরূপ প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে লড়াই করতে গিয়ে তারা হিংস্র হয়ে উঠে। এজন্য আফগানিস্তানসহ অন্যান্য দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে অপরাধের হার বেশী। অন্যদিকে যে অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী কিন্তু সম্পত্তি সীমিত সেখানে সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ বেশী হয়।

অন্যদিকে আত্মহত্যার যুগান্তকারী সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যায় ডুরখাইমের মতে অন্য অনেক সামাজিক কারণের মধ্যে সীমিত পরিসরে হলেও ভৌগলিক উপাদানের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। তাঁর মতে সভ্যতার বিকাশের সংগে সংগে সামাজিক বিচ্ছিন্নতার জন্য আত্মহত্যার হার বাড়ে। সেজন্য গ্রাম থেকে শহরে আত্মহত্যার হার বেশী। অন্যদিকে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে আত্মহত্যার হার বেশীর কারণে তিনি বলেন যে, "..... the chief conditioning factor may not be the temperature of the summer months but the longer days- when social life is more active and more intense" (Maclver & Page : 1963, P-109). এখানে গ্রীষ্মের দীর্ঘদিনের সামাজিক সম্পর্কের জটিলতাই আত্মহত্যার দিকে প্ররোচিত করে বলে বলা হচ্ছে, যা ভৌগলিক উপকরণেরই প্রকাশ। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে, মানবপ্রকৃতির নানারূপ ভৌগলিক কারণে প্রভাবিত আর এই প্রকৃতিই সমাজকাঠামোকে নানাভাবে রূপায়ন করতে পারে।

৯। নরবংশ ও ভৌগলিক উপাদান ঃ পৃথিবীর মানুষকে কতিপয় নরবংশে ভাগ করা হয় যেমন, ককেশয়েড, মঙ্গোলয়েড, অষ্ট্রালয়েড ইত্যাদি। নৃবিজ্ঞানীদের মতে বিভিন্ন দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ঐ নরগোষ্ঠীগুলো গড়ে উঠেছে। দৈহিক বৈশিষ্ট্য বলতে সাধারণতঃ চামড়ার রং, চুল, নাকের ধরন, চোখের রং, মাথার আকৃতি ইত্যাদি বুঝানো হয়। সাধারণতঃ শীতপ্রধান অঞ্চলের মানুষের চামড়ার রং শ্বেতকায়, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে কৃষ্ণকায় হয়। এর কারণ হিসাবে বলা যায় শীত প্রধান অঞ্চলে

মানুষকে সারাক্ষণ গরম ও মোটা কাপড় পরে থাকতে হয়। তাদের দেহ সারাক্ষণ আবৃত থাকে, তাই এ প্রভাব দেহের চামড়ার উপর পড়ে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের প্রায় অনাবৃত দেহের চামড়ার রং অতিরিক্ত সূর্যতাপে কৃষ্ণকায় হয়ে থাকে। বাকলে তাঁর History of Civilization in England গ্রন্থে নরগোষ্ঠীর উপর ভৌগলিক প্রভাবের কথা বলেছেন। তাঁর মতে নরগোষ্ঠীর ভিন্নতার জন্য জলবায়ু, খাদ্য ও মাটির যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিভিন্ন জলবায়ু ও মাটির বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন ধরনের ফসলাদি কম বা বেশী উৎপাদিত হয়। আর ঐ ফসলাদি বা খাদ্যগ্রহণের প্রভাব মানব দেহে গিয়ে পাড়ে (রহমান ঃ ১৯৮৮, পৃ-৪৩)। এরই আলোকে মার্কিন নৃবিজ্ঞানী বোয়াজ বলেন যে, ভৌগলিক পরিবেশের কারণে দৈহিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিবর্তন ঘটে। তাঁর মতে ইউরোপ থেকে আগত পিতামাতার যে সমস্ত ছেলেমেয়ে আমেরিকায় জন্মেছে সে সমস্ত শিশুদের মাথার আকৃতি পিতামাতার থেকে ব্যতিক্রম (কোনিগ, অনুঃ ২০০২, পৃ-২৯)। অন্যদিকে বিশিষ্ট জীববিজ্ঞানী কারুজিনার মতে মরুভূমি, গভীর অরণ্য, বিস্তৃত জলাশয়, পাহাড়, উপত্যকা, সমুদ্র ইত্যাদি মানুষের মধ্যে যোগাযোগে অন্তরায় সৃষ্টি করে, যা কিনা Biological mixture এরও অন্তরায় স্বরূপ। ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের typical নরগোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। আবার এসব জীববৈজ্ঞানিক বক্তব্যের পাশাপাশি নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন বিশুদ্ধ নরগোষ্ঠী একটি অতিকথন। কেননা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নরগোষ্ঠীর মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে বৈধ বা অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে মিশ্র জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। যাকে বলা হচ্ছে সংকর জনগোষ্ঠী (রহমান ঃ ১৯৮৮, পৃ-৪৬০)। কিন্তু এখানে উল্লেখ্য, এই প্রক্রিয়া বা population mixture কিন্তু শুরু হয়েছিল প্রাথমিক অবস্থায় অঞ্চলভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদের মোহে জনস্থানান্তরের মাধ্যমে।

১০। সমাজের নীতিবোধ ও ভৌগলিক উপাদান ঃ একটি সমাজের নীতি ও আদর্শ ঐ সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক সমাজেরই কিছু নিজস্ব নিয়ম-কানুন রয়েছে। আর ঐসব নিয়ম-কানুনগুলো অনেক ভৌগলিক উপাদান দ্বারা সৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, সু-প্রাচীনকাল হতে ভারতের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার প্রধান হাতিয়ার গরু। ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক কারণে গরুর প্রয়োজন সর্বাধিক। অন্যদিকে হিন্দুরা গো-মাতার পূজা করে এবং হিন্দুধর্মের পূজা অর্চনায় গরুর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ফলে ভারতে গো হত্যা মহাপাপ, অর্থাৎ গরুকে কেন্দ্র করে ভারতের সংস্কৃতি ও নীতিবোধের অনেক কিছুই নির্ভর করে। তেমনি আরবের সংস্কৃতিতে আতিথেয়তা একটি বড় নীতি-ধর্ম। এ দেশটির ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এমন যে, মরুভূমির প্রচণ্ড গরমে মানুষের পক্ষে ভ্রমণ করা কষ্টকর, তাকে পথিমধ্যে বিশ্রাম নিতে হয়। সেজন্য এখানে মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছে আতিথেয়তা। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল ও প্লেটো সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য

নীতিবোধের কথা বলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য সত্য এই যে, প্লেটো এবং এরিস্টটল সমাজের প্রয়োজনে আবার জঘন্য দাসত্ব ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। কেননা তখনকার গ্রীক নগররাষ্ট্রের সমাজব্যবস্থা দাসশ্রম ছাড়া চলতে পারত না। অপরকে খাটিয়ে নিলে শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এরূপে যাযাবর জীবন ছেড়ে মানুষ যখন জীবন ছেড়ে মানুষ যখন কৃষিকাজ করে সুসভ্য হয়ে উঠল, তখনই সভ্যতার জন্য দাস ব্যবস্থার প্রয়োজন হল। অন্যদিকে কৃষি ছেড়ে যখন শিল্প সভ্যতা এল তখন দেখা গেল দাসপ্রথার জন্য অল্প দরে শ্রমিক পাওয়া দুষ্কর, তাই জঘন্য এই প্রথার বিরুদ্ধে নীতিবোধ উদ্বুদ্ধ হলো। আমেরিকায় civil war এর সময় দেখা গেল কৃষিভিত্তিক দক্ষিণের রাষ্ট্রগুলো দাসপ্রথা বজায় রাখার পক্ষে অন্যদিকে উত্তরের শিল্পপ্রধান রাষ্ট্রগুলো দাসপ্রথা তুলে দেয়ার পক্ষে (আফসার উদ্দীন ঃ ১৯৮৪, পৃ-৪০,৪১)। এরূপ বিভিন্ন চিন্তা-চেতনা, নীতিবোধ সাধারণতঃ চিরন্তন কিছু নয়, বরং প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল এবং হচ্ছে।

১১। সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলার উপর ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব ঃ সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলা মনের ব্যাপার। তবে প্রয়োজনের দিকটিও এতে কম নয়। যে কোন সমাজের চিত্ররূপ এগুলোর মধ্যে ফুটে উঠে। সংস্কৃতির এই দিকটিও ভৌগলিক উপাদান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কোন সমাজের ভূপ্রকৃতি যুগে যুগে সাহিত্য, চিত্র, কাব্য ও সংগীতের সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। অর্থাৎ ভৌগলিক উপাদান মননশীল এসব কর্মে স্রষ্টাকে দিয়েছে অনুপ্রেরণা এবং বিস্তৃত পটভূমি। তাই অনেক স্রষ্টার নিজস্ব ভৌগলিক পরিমণ্ডলের প্রকাশও বিকাশ হয়েছে তাঁর সাহিত্য, চিত্রকলা, কাব্য বা সংগীতের নানা আঙ্গিকে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা দেখতে পাই একই সমাজে বা দেশের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং বিভিন্নতা। সরোকিনের বিখ্যাত কিছু সাহিত্যকর্মের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এই বক্তব্যের প্রতিফলন স্পষ্ট হয়ে উঠে, "........ the general scenary of the '*Thousand and One Nights*' or the *'Illiad'* and *'Odysey'*, or the *'Norse Edda'* or the 'Hindu Mahabharata' are quite different from each other and each is marked by the characteristics typical of the locality in which its creator lived" (Sorokin : 1928, P-171).

১২। অবসর বিনোদন ও ভৌগলিক উপাদান ঃ সমাজের মানুষকে শুধু খাওয়া পরা নিয়েই ব্যস্ত থাকলে হবে না, বরং তার জীবনে অবসর বিনোদনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অবসর বিনোদনের সুযোগ লাভ এক অপরিহার্য সামাজিক দাবী। যদিও সমাজবিজ্ঞানী সামনার ও কেলার বলেছেন যে, অবসর বিনোদন সব সমাজেই সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারেনি। কারণ যে সমাজের মানুষ সর্বদা জীবন সংগ্রামে লিপ্ত সে সমাজের অবসর বিনোদনের তাৎপর্য অল্প। তবে এটা সত্য, মানুষ কিভাবে তার অবসর সময় কাটাচ্ছে তার উপর তার সংস্কৃতি ও সভ্যতার মান

নির্ধারিত হয় (কোনিগ ঃ ২০০২, পৃ-১৩৫, ১৪১)। বিভিন্ন অবসর বিনোদনের মাধ্যম ভৌগলিক উপাদান দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খেলাধূলা ও শরীরচর্চা। প্রাচীন মিশর ও গ্রীসের সভ্যতায় এগুলোর যথেষ্ট প্রচলন ছিল। খেলাধুলা ও শরীরচর্চার জন্য আধুনিক নগরগুলোতে পার্ক ও উন্মুক্ত মাঠের প্রয়োজনীয়তার দাবী অনস্বীকার্য। শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এক এক ধরনের খেলাধুলার প্রচলন দেখা যায়। আবহাওয়া ও তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে খেলাধূলার ধরন নির্ভর করে যেমন, কোথাও indoor games এর প্রচলন বেশী, কোথাও outdoor games ইত্যাদি। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য উপভোগে ভ্রমণ যুগে যুগে অবসর বিনোদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

এতক্ষণ আমরা দেখতে চেষ্টা করলাম কিভাবে বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক উপাদানসমূহ ভৌগলিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সামাজিক সম্পর্কের জালকে প্রসারিত করে সমাজ সংগঠনে সহায়তা করে। আর এরই ধারাবাহিকতায় আমরা এখন দেখতে চেষ্টা করব বাংলাদেশের সমাজ সংগঠনে এদেশের ভৌগলিক উপাদানসমূহ কতটুকু প্রভাব বিস্তার করছে।

বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে বাংলাদেশ পৃথিবীতে অনন্য। এত নদ-নদী সম্পন্ন উর্বর সমতল ভূমি পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। যদিও অতীতে বছরের প্রায় অর্ধেক সময় ভূমি জলপ্লাবিত থাকত। এই উর্বর বাংলা পৃথিবীর বৃহৎ বদ্বীপ অঞ্চল, যার বেশীরভাগই গড়ে উঠেছে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রক্ষপুত্র বয়ে নেমে আসা পলিমাটিতে অপেক্ষাকৃত হাল আমলে। অন্যদিকে এখানকার আবহাওয়া মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং বায়ুমণ্ডল জলীয় বাষ্পপূর্ণ থাকে।

ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যই এদেশের ইতিহাসের ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। কোন বিশেষ সমাজ সংগঠনের উৎস সন্ধানে এটি জানা অপরিহার্য বাস্তবতা। বাংলার বড় বড় নদীগুলো যুগে যুগে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করায় বহু সমৃদ্ধ শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম, রাজধানী নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে অথবা বসতিহীন বিরান অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। আবার নতুন গতিপ্রবাহের সাথে তীরে তীরে নতুন শহর বন্দরের উৎপত্তি হয়েছে। অন্যদিকে নদ-নদী, জলাভূমি, বৃষ্টিপাত, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষাকাল, আর্দ্র আবহাওয়া বহিঃআক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার কাজ করেছে। এসব প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার জন্যই বাংলা স্বাধীন রাজনৈতিক জীবন অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল বহুদিন পর্যন্ত। (খান ঃ ১৯৮৬, পৃ-৩০-৩১)। এসব বিভিন্নমুখী পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রক্রিয়া ও বিশেষায়নের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এদেশের সমাজ সংগঠনের গতিধারা।

ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য বাংলার সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ধারণ করেছে। জমির মালিকানা ও পরিমাণ হচ্ছে এর মূল নিয়ন্তা। এগুলোর উপর ভিত্তি করেই এক ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক ও আর্থিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। বর্তমানে দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। মাটি, জলবায়ু, আবহাওয়া বাংলাদেশের চাষাবাদের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাংলার প্রধান কৃষিজ খাদ্যশষ্য ধান, তেমনি এর অগণিত নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয় সরবরাহ করেছে প্রচুর পরিমাণ মাছ। তাই এদেশের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য মাছ-ভাত। তাছাড়া মৌসুমী ফলাহার, শাকসব্জি ও পান-সুপারী খাওয়ার রেওয়াজ এ সমাজের শাশ্বত ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত। বাংলাদেশের সর্বত্র ভৌগলিক জলবায়ু ও আবহাওয়ার আনুকূল্য অনুযায়ী পল্লী সংগঠন গড়ে উঠেছে উন্মুক্ত কৃষি জমি, পুকুর এবং বসতবাড়ির সমন্বয়ে। এখনকার মত অতীতেও বেশীরভাগ লোক গ্রামে বসবাস করত, এর মূল কারণ হল জমির উৎপাদন ক্ষমতা চাষাবাদে মানুষকে আকর্ষণ করেছিল। আর এভাবেই এখানে ভূমি মালিকানাভিত্তিক জনগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে (রহিম ঃ ১৯৮২, পৃ-৩২)। এই জনগোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও গৃহনির্মাণ প্রণালী ভৌগলিক উপাদান দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত। গ্রামের অধিকাংশ লোক যেহেতু কৃষক, তাই তাদের পোশাক কৃষির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এজন্য তারা সাধারণতঃ লুঙ্গি, গেঞ্জি পরে, এক সময় ধুতিও পরত। যেগুলো আবার বছরের ছয়মাস জলপ্লাবিত এই নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় যথেষ্ট উপযোগী ও আরামদায়ক। শীতকালে চাদর বা গৃহে সেলাই করা কাঁথা তাদের পরিধেয়। যদিও মেয়েদের শাড়ী বা শহরের পোশাকরীতি গ্রামের মত ভৌগলিক অবস্থা দ্বারা তেমন প্রভাবিত নয়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণ ঋতুভেদে শহরের পোশাক রীতির ধরন নির্ধারণ করে।

প্রকৃতিই অঞ্চল ভেদে গৃহনির্মাণ রীতি নির্ধারণ করে। নদ-নদীর পরিবর্তনশীল প্রকৃতি, বৃষ্টি-বাদল ও বান-বন্যার পরিপ্রেক্ষিত এবং সেই সাথে নির্মাণ সামগ্রীর প্রাপ্যতা সাপেক্ষে গ্রাম বাংলার খড়কুটা, কাঠ, বাঁশ, কাদা, মাটি, টিন এবং অন্যান্য বহনযোগ্য হাল্কা উপকরণ গৃহ নির্মাণের উপযোগী অবলম্বন। ঘর তৈরীতে ভৌগলিক উপাদান যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে তার উদাহরণে বলা যায়, নিম্নভাটি অঞ্চলে অর্থাৎ সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় নলখাগড়া ও ছনের সহজ প্রাপ্যতার জন্য এগুলো গৃহনির্মাণে ব্যাপক ব্যবহৃত হয়। কোন কোন অঞ্চলে মাটির ঘর দেখা যায় যেমন সিলেট, গাজীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে। কেননা এ সমস্ত এলাকায় এঁটেল মাটির সহজলভ্যতা রয়েছে। বাসগৃহ সাধারণতঃ এক বা একাধিক পৃথক কুঁড়েঘর নিয়ে সৃষ্ট, একটি উন্মুক্ত উঠানের চারিদিক ঘিরে এই ঘরগুলো গড়ে উঠে। যেহেতু বাংলাদেশের এক অঞ্চল হতে অন্য অঞ্চলে তাপমাত্রার পার্থক্য কম তাই সর্বত্রই প্রায় একই ধরনের নির্মাণ কাঠামো পরিলক্ষিত হয়। শহরে ইটের তৈরী ঘরবাড়ি বেশী দেখা যায়, এর কারণ

আর্থিক ও প্রাকৃতিক উভয়ই; প্রথমতঃ এদেশে প্রকৃতিগতভাবে পাথরের স্বল্পতাহেতু মাটি পোড়া ইটের প্রাধান্য বেশী, অন্যদিকে শহরের লোকেরা গ্রামের তুলনায় স্বচ্ছল, তাই তারা ইটের ব্যয় বহন করতে কিছুটা সক্ষম (খান ঃ ১৯৭৪, পৃ-৮৬)।

যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে ভূগোলের সম্পর্ক নিবিড়। একটি দেশের ভূপ্রকৃতিই নির্ধারণ করে ঐ দেশের যোগাযোগের কাঠামো। নদীমাতৃক এ দেশের নদ-নদীগুলো চমৎকার নৌপথ, সেজন্যই নীচু অঞ্চলগুলোতে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম নৌকা, লঞ্চ, স্টীমার ইত্যাদি এবং সারা দেশে নৌপথেই পণ্য পরিবহন হয় বেশী। তাছাড়া এখন নদীগুলোর উপর সেতু নির্মাণের মাধ্যমেও সড়ক যোগাযোগ অনেক সহজ হয়ে গেছে যা সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ব্যাপক প্রভাব রাখছে। কেননা অর্থনীতির বিকাশে ভাল যোগাযোগ অন্যতম সহায়ক। এছাড়াও দেখা যায়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কোন অঞ্চলে নতুন রাস্তাঘাট স্থাপিত হলে সামগ্রিকভাবে ঐ এলাকার সমাজকাঠামোর মধ্যে পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। কিন্তু তারপরও এদেশের পল্লী অঞ্চলের রাস্তাঘাটগুলো প্রায় সবই কাঁচা। যেগুলো বর্ষাকালে সাধারণতঃ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে উঠে। অর্থনৈতিক কারণ, সড়ক যোগাযোগের ক্রমবিকাশ এবং সর্বোপরি ছোট ভৌগলিক পরিমণ্ডলের জন্য রেলপথ ঠিক সেভাবে বেড়ে উঠেনি, বরং বলা চলে অনেকটাই স্থবির।

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া এদেশের মানুষের আকৃতি, আচরণ ও দক্ষতার উপরও গভীর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। সমাজ সংগঠনে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক, কেননা মানুষের আচার-আচরণ ও আকৃতি সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক পরিচয়ের রূপায়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। মৃদু আবহাওয়া এদেশের মানুষকে শান্ত স্বভাবের ও আবেগপ্রবণ করে তুলেছে। সামগ্রিকভাবে এই বৈশিষ্ট্য এদেশের মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে কোমল, শান্ত স্বভাবের ও আবেগপ্রবণ করে তুলেছে। সামগ্রিকভাবে এই বৈশিষ্ট্য এদেশের মানুষের 'National character' এর মাধ্যমে বিকশিত হয়। বলা হয়ে থাকে পূর্ববাংলার মানুষ পশ্চিম বাংলার মানুষের চেয়ে বেশী আবেগপ্রবণ, এটা আর কিছু নয় বরং 'National character' এরই বহিঃপ্রকাশ। এই চমৎকার আবেগময়তা তাদের পারিবারিক জীবন ও সামাজিক সম্পর্ককে করেছে মধুময়। স্বজনদের জন্য অপরিমেয় স্নেহ-মমতা, প্রেম-ভালবাসা একান্নবর্তী পরিবার প্রথাকে টিকিয়ে রেখেছে আজও। এর পাশাপাশি সংগ্রামশীলতাও এ অঞ্চলের মানুষের প্রকৃতির আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কেননা সব সময় বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, নদীর ভাঙ্গাগড়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে লড়াই করে এদেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হয়। অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের মানুষের মত এদেশের বেশীরভাগ লোকই কৃষ্ণ বা শ্যামল বর্ণের, যেটা তাপমাত্রাই নির্ধারণ করেছে।

অন্যদিকে অপরাধ প্রবণতাও মানব প্রকৃতির অন্যতম দিক, এক্ষেত্রেও ভৌগলিক উপাদান দ্বারা বাংলাদেশের অপরাধের স্বরূপ অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারিত হয়। আমাদের দেশে চরাঞ্চলে জেগে উঠা জমি নিয়ে কোন্দল ও নানাবিধ অপরাধ সংগঠিত হয়। এর কারণ হল চর খুব উর্বর বলে খুব কম খরচে বিপুল ফসল উৎপাদন করা যায়। শুধু চরাঞ্চল কেন সব অঞ্চলেই মোটামুটি জমির মালিকানা ও অধিকারকে কেন্দ্র করে ছোট বড় কোন্দল লেগেই থাকে। দেশের বেশীরভাগ মামলাগুলো হয় জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে শীতের দীর্ঘ রাত্রে গ্রামে চুরি-ডাকাতি বৃদ্ধি পায়। কেননা শীতে কৃষকের ঘরে কিছু ফসল থাকে এবং রাতে মানুষের নিদ্রা গাঢ় হয়। এজন্য বলা হয় গ্রীষ্মে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধবৃত্তি এবং শীতে সম্পত্তির বিরুদ্ধে অপরাধবৃত্তি বাড়ে। আবার এর পাশাপাশি দেখা যায় জ্যোৎস্না রাতের চেয়ে অন্ধকার রাত্রে চুরি-ডাকাতির পরিমাণ বাড়ে। এরকম এ সমাজের নানা অপরাধ ভৌগলিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় (রহমান ঃ ১৯৮৮, পৃ-৮৬-৮৭)।

সমাজ জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বিবাহ ও পরিবার। আগেই বলা হয়েছে প্রকৃতিগত কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের লোকেরা অল্প বয়সেই যৌবনে পদার্পণ করে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়, তাই এখানে অল্প বয়সে বিয়ের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ফলে এসব ছেলে-মেয়েরা অল্প বয়সেই অধিক ছেলে-মেয়ের জন্ম দেয়। অন্যদিকে আমাদের কৃষির এখনো যান্ত্রিকীকরণ না হওয়ায় খেত-খামার ও গৃহস্থালী কাজের জন্য অনেক লোকের প্রয়োজন হয়। পরিবারেও কাজ কর্মের জন্য অধিক লোক প্রয়োজন এই ধারণার জন্য অধিক সন্তান জন্ম দেয় বা বহুবিবাহের প্রচলন একেবারে উঠে যায়নি (খান ঃ ১৯৭৪, পৃ-১৮৯)। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এগুলো অন্যতম প্রধান কারণ, যা সুস্পষ্টভাবে ভৌগলিক উপাদান দ্বারাই প্রভাবিত। অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই যৌথ পরিবারে আস্তে আস্তে ভাঙ্গন সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ যৌথ পরিবারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির উপর চাপ পড়ে, জমি বিভাজিত হয়ে একাধিক অণুপরিবারের সৃষ্টি হচ্ছে।

ভৌগলিক উপাদান এদেশের প্রশাসনের উপর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। মার্কস ও এঙ্গেলস এর ধারণা অনুয়ায়ী কৃষিভিত্তিক সভ্যতার কারণেই প্রাচ্যে আমলাতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল, আর বাংলাদেশ কিন্তু ঐ বাস্তবতারই প্রতিনিধিত্ব করে। অন্য অনেক কারণের মত ভৌগলিক কারণও আইন-শৃংঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাধা হয়ে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চরাঞ্চল বা পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম পাহাড়ী বনাঞ্চলে পূর্ণাঙ্গ শান্তি প্রতিষ্ঠা করা কষ্টকর এবং এটা স্পষ্ট যে, এই প্রশাসনিক দুর্বলতার সৃষ্টি ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই (নকী ঃ ১৯৯৩, পৃ-৮৪)।

নগরায়ন, শিল্পায়ন এবং শিল্পকারখানার স্থান নির্বাচনে ভৌগলিক অবস্থানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক যুগে বাণিজ্য ও শিল্পের বিকাশ হেতুই শহুরে সমাজের পত্তন। বাংলাদেশের সমাজেও এই প্রভাব স্পষ্ট। সাধারণতঃ বিভিন্ন নদীর তীরেই এদেশের শহরগুলো গড়ে উঠেছে। আরও বলা হয় বন্দর, শহর বা শিল্পনগরী হতে হলে তাকে অবশ্যই অন্য সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সংগে বিভিন্ন পথে সংযুক্ত থাকতে হবে। চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা বন্দর বা শিল্পনগরী হিসাবে এজন্যই প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি কাঁচামাল প্রাপ্তির প্রাচুর্যতার উপর ভিত্তি করে প্রথাগতভাবে এদেশেও বিভিন্ন শিল্প কারখানাগুলোর localization হয়েছে। রাজশাহীর রেশম শিল্প ঐ অঞ্চলের গুটি পোকার চাষের উপযোগী ভৌগলিক পরিবেশের জন্য গড়ে উঠেছে। সিলেট চা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এ অঞ্চলের ছোট ছোট পাহাড় ও সেই সাথে প্রচুর বৃষ্টিপাত চা শিল্পের জন্য আদর্শ। উত্তরবঙ্গে প্রচুর আখ হয় বলে ওখানে অনেক চিনিকল গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের পাট উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের কেন্দ্রস্থল নারায়ণগঞ্জে অবস্থিতির জন্য এর আশেপাশে প্রচুর পাটকল গড়ে উঠেছিল এবং এটি পরিচিত হয়েছিল প্রাচ্যের ডান্ডি নামে। কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এরূপ অঞ্চলভিত্তিক পরিচয়ের তালিকা অতি দীর্ঘ যা সাধারণত ভৌগলিক অবস্থান ও কাঁচামাল প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠে। অন্যদিকে কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও লৌহের অভাবে এদেশে বৃহৎ শিল্প ঠিক সেভাবে গড়ে উঠতে পারেনি। তাই দেখা যায় শিল্পায়ন ও নগরায়নের সাথে ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে (খান ঃ ১৯৭৪, পৃ-১৮৬)। এ সম্পর্কে আরও উল্লেখ্য যে, প্রকৃতির অপার দানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পর্যটন শহরও এদেশে গড়ে উঠেছে যেমন, কক্সবাজার, টেকনাফ, রাংগামাটি ইত্যাদি এবং সেই সাথে সেখানে পর্যটনভিত্তিক আর্থিক বুনিয়াদ।

শিল্পায়ন ও নগরায়নের সাথে সাথে সমাজের আরেকটি দিক স্পষ্ট হয়ে উঠে, তা হল migration বা জনসংখ্যার স্থানান্তর। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থা এক্ষেত্রে বহুলাংশে প্রভাব বিস্তার করে। জনসংখ্যার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধিতে গ্রামে কৃষি জমির ওপর চাপ পড়ায় জনগণ জীবিকা অন্বেষনে দ্রুত শহরমুখী হচ্ছে। এর পাশাপাশি এক অঞ্চলের লোক মৌসুমী ও দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে অন্য অঞ্চলে গমন করে, যেমন বিভিন্ন জেলার বিপুল সংখ্যক মৌসুমী খেতমজুর ধানকাটার মৌসুমে সিলেট, বরিশাল ও চট্টগ্রামে যায়, তাছাড়া জনসংখ্যাধিক্য-জেলার বহুলোক ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলাগুলোসহ বিভিন্ন কম জনসংখ্যাধিক্য জেলায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। আবার নদীর তীরে বসবাসকারী লোকেরা নদীর ভাঙ্গন শুরু হলে দূরে চলে যায় (খানঃ ১৯৭৪, পৃ-১৮৯)।

এদেশের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক ভৌগলিক উপাদান দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে হিন্দু ও বিভিন্ন উপজাতীয় ধর্মের আচার-বিশ্বাসের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। পবন দেব, মা মনসা প্রভৃতি দেবদেবীরা উপাসিত হন

উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারীদের দ্বারা। বৃক্ষলতার যারা পূজা করেন তারা হন সাধারণতঃ বনাঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানের বাসিন্দা। উপজাতীয় টিপরারা বাঁশ পূজা করে, কারণ তাদের জীবনযাত্রার জন্য বাঁশ অন্যতম উপাদান। পাহাড় পর্বতের পূজো করেন পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসীরা যেমন গারোরা চিকমাং নামক এক পাহাড়কে মনে করে মৃতের দেশ বলে, যেখানে মৃত আত্মা চলে যায়। তাদের বিশ্বাস সাধারণ মানুষ সেখানে যেতে পারবে না। তেমনি কৃষি কর্মের নানা পর্যায়ে যুক্ত থাকে নানারকম আচার অনুষ্ঠান যেমন, বৃষ্টির প্রার্থনায় আছে নামাজ, দোয়া বা পূজা ইত্যাদি। জনজীবনে কৃষির গুরুত্বের উদাহরণে বিয়েতে ধর্মনির্বিশেষে নববধূকে ধানদূর্বা দিয়ে বরণ প্রথাটির কথা বলা যায়। এটি প্রাচীন fertility cult এর একরূপ প্রকাশ, যার মাধ্যমে কামনা করা হয় এদেশের উর্বর জমি যেমন শস্য দেয় তেমনি নববধূও উর্বরা হোক। অর্থাৎ এখানেও প্রাকৃতিক কারণ যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে বিশ্বকর্মা পূজিত হন কলকারখানা ও শিল্প অঞ্চলগুলোতে। এরূপ নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা দেবতার তালিকা অতিদীর্ঘ। মুসলমান ধর্মেও চন্দ্রের গতিধারার উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারিত হয়। এক কথায়, ভৌগলিক উপাদান বাংলাদেশের ধর্মগুলোর বিভিন্ন আঙ্গিক অনিবার্যভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে। অন্যদিকে পৃথিবীর পরিক্রমন ও ঋতু বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে নানা আচার-বিশ্বাস। হিন্দু ও মুসলমানের বিয়েতে দিন-ক্ষণের বিচার করা হয়। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের সময় রয়েছে নানা বাধা নিষেধ। অর্থাৎ প্রকৃতির এই সব বৈচিত্র্যগুলো সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানকে যথেষ্ট প্রভাবিত করছে।

বাংলাদেশে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানাদিক ভৌগলিক পরিচয়ে বিকশিত ও পরিস্ফুষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ অঞ্চলভেদে নানারকম সাহিত্য, কাব্য, সংগীত ও চিত্রকলার বিশেষায়ন রয়েছে। ভাওয়াইয়া যেমন রংপুর, দিনাজপুর অঞ্চলের, তেমনি ভাটিয়ালী ময়মনসিংহ ও ফরিদপুরের মত ভাটি এলাকার পল্লী সমাজচিত্রের বর্ণনা দেয়। জীবনানন্দ দাশ, জসিম উদ্দীনের মত বিখ্যাত কবিরা বাংলার অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। জয়নুল আবেদীন এর মত বিখ্যাত পটুয়াগণ বাংলার রূপ অংকনে সিদ্ধহস্ত। এরূপ নানা সৃষ্টিতে বাংলার সমাজচিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

পূর্বে বলা হয়েছে যে, সমাজবিজ্ঞানী সামনার ও কেলারের মতে অবসর বিনোদন সব সমাজেই প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হতে পারেনি। বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রে এ উক্তি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তবে সীমিত পরিসরে হলেও অবসর বিনোদনের যে সুযোগ আছে তার অনেক কিছুই ভৌগলিক পরিবেশ দ্বারাই পরিস্ফুষ্ট। বাঙালিদের দুপুর বেলা ঘুমানো একটি বহুযুগের রীতি। আমাদের ভাত খাওয়া এবং সেই সাথে উষ্ণ আবহাওয়ার প্রভাব দুপুরের ঘুমকে প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। আড্ডা দেয়া

বাঙ্গালি সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। কাজের ফাঁকে বা অবসর সময়ে আড্ডা দেয়া এ সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষ সাধারণতঃ আড্ডা দেয় নদীর তীরে, হাটে-গঞ্জে, গাছের সুশীতল ছায়া তলে যেগুলো আবার ভৌগলিক উপকরণই। খেলাধুলা অবসর সময় কাটানোর অন্যতম মাধ্যম। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ভেদে নানাবিধ খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে। নদীমাতৃক এ দেশে নৌকাবাইচ হল অন্যতম আকর্ষণ। বাইরের প্রখর রৌদ্রে বা অবিরাম বৃষ্টিপাত এজন্য বিভিন্ন Indoor games ও খেলা হয়। এর মধ্যে রয়েছে দাবা-পাশা, লুডু, কেরাম ইত্যাদি। একটু স্বচ্ছল যারা তাদের মধ্যে ভ্রমণ পিপাসা ইদানিং বেড়ে যাচ্ছে–যা আর কিছুই নয় অবসর সময়ে প্রকৃতি দর্শন। সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে, অবসর সময়ও ভৌগলিক উপাদান দ্বারা অনেকভাবে বিকশিত (করিমঃ ১৯৮৯, পৃ-৫২)।

উপসংহার ঃ

মানবজাতি বা সভ্যতর ইতিহাসে সমাজের উদ্ভব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। মানুষ তার প্রয়োজন বা অভাব পুরণের নিমিত্তে, অর্থাৎ খাদ্য, নিরাপত্তা, নানারূপ প্রতিকূলতার মোকাবিলা ইত্যাদির জন্য সুপ্রাচীন কাল হতে সম্মিলিতভাবে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। এই সম্মিলিতভাবে বসবাস করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রক্তসম্পর্কীয় বন্ধন প্রসারিত করার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে অবিরাম মিথষ্ক্রিয়া ও পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে। এই মিথষ্ক্রিয়া ও সহযোগিতার মনোভাব থেকেই কালক্রমে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সংঘ-সমিতি ইত্যাদি নানা কিছু এবং সেই সাথে বিস্তৃত হয়েছে সামাজিক সম্পর্কের জাল। আর সমাজ বলতে যা বুঝায় তার ভিত্তিভূমি বা সংগঠন এই প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠে ধীরে ধীরে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে।

বর্তমান আলোচনায় সামাজিক সংগঠনের নানাদিক, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটসহ কিভাবে ভৌগলিক বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয় তার একটি ক্ষুদ্র বর্ণনা দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ভৌগলিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্বাসী সমাজতত্ত্ববিদদের অভিমত অনুযায়ী এই প্রভাব ব্যাপক বিস্তৃত। তাঁদের মতে, Any analysis of social phenomena, which does not take into consideration geographical factors, is incomplete. কিন্তু এর পাশাপাশি এটাও সত্য যে, মানুষ তার স্বীয় মেধা, প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার সাহায্যে প্রাকৃতিক উপাদনগুলোকে নানাভাবে নিজের ও তার সমাজের প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। এ প্রসংগে সমাজবিজ্ঞানী ডুরখেইম এর বিখ্যাত উক্তিটি লক্ষণীয়। তিনি বলেন,

"Man adapts himself to all kinds of geographical conditions, but he is not resourceless in meeting them. He changes when he is subjected to a new environment but he also puts his imprint upon it" (মহাপাত্র ঃ ২০০০, পৃ-১৭৮)।

এখানে উল্লেখ্য এই যে ব্যক্তি মানস ও ভৌগলিক উপাদানের সংশ্লেষ তা কিন্তু যুগে যুগে সমাজের নানা আঙ্গিককে বিকশিতই করেছে। ভৌগলিক পরিবেশ যদি মানুষের পক্ষে থাকে তাহলে তার জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়। যাহোক, যতই বলা হোক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রগতি বা সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে সমাজসংগঠনের নানা দিকগুলোর উপর ভৌগলিক পরিবেশের আপেক্ষিক গুরুত্ব আস্তে আস্তে কমে আসছে, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীরা মানব সমাজের উপর ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব প্রতিক্রিয়ার তাৎপর্যকে কোন ক্রমেই উপেক্ষা করতে পারে না, যেহেতু এ সুযোগ সীমিত এবং ক্ষেত্র বিশেষে অসম্ভব। আর বাংলাদেশের মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ ঐতিহ্যবাহী সমাজের পক্ষে তা আরও বেশী বাস্তব। এখানে মানুষকে প্রকৃতির মুখাপেক্ষী হয়েই বেঁচে থাকতে হয়। এদেশের সমাজ সংগঠনের প্রায় সকল দিকই কোন না কোনভাবে প্রকৃতির দ্বারাই প্রভাবিত বা বিকশিত।

তথ্য নির্দেশিকা

১। আফসারউদ্দীন, মুহম্মদ (১৯৮৪), *এ, কে, নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাঃ), সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

২। কর, পরিমল ভূষণ (১৯৯২), *সমাজতত্ত্ব,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা।

৩। করিম, নাজমুল (১৯৮৯), *সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ,* নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা।

৪। কোনিগ, স্যামুয়েল (২২০২), *সমাজবিজ্ঞান (অনুঃ),* জে, কে, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

৫। খান, কে, এম, রাইছউদ্দিন (১৯৮৬), *বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা,* খান ব্রাদার্স এণ্ড কোম্পানী, ঢাকা।

৬। খান, ফজলুল রশিদ (১৯৭৪), *বাংলাদেশের সমাজতত্ত্ব,* শিরীন পাকলিকেশন্স, ঢাকা।

৭। নকী, সৈয়দ আলী ও ইসলাম, মোঃ নজরুল (১৯৯৩), *সমাজবিজ্ঞান পরিক্রমা,* সর্বজনীন গ্রন্থালয়, ঢাকা।

৮। মহাপাত্র, অনাদিকুমার (২০০০), *বিষয় সমাজতত্ত্ব,* ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন, কলিকাতা।

৯। মিয়া, মোহাম্মদ আমীর হোসেন (১৯৮৭), *সমাজবিজ্ঞান,* গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ঢাকা।

১০। রহমান, হাবিবুর (১৯৮৮), *সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি,* হাসান বুক হাউজ, ঢাকা।

১১। রহিম, এম, স (১৯৮২), *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

১২। হোসেন, কাজী তোবারক ও ইমাম হাসান (১৯৯৬), *আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের চিন্তা ও তত্ত্ব,* সামাজিক বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকা।

১৩। Maclver, R. M. & Page, Charles H (1965), *Society-An Introductory Analysis,* Macmillan & Company Ltd., London.

১৪। Sorokin, Pintrim (1928), *Contemporary Sociological Theories,* Harper & Row, New York.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০
ISSN-1605-7023

বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ঃ অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন কৌশল

মল্লিক আনোয়ার হোসেন*

Abstract: The Southern Coast of Bangladesh is getting importance as a functional area for its natural resource potentials and a number of economic and environmental reasons. Despite national wealth and fish stock, forest resources have been declining sharply because of overfishing and for the lack of appropriate forest resource management and conservation. The Sunderbans is endowed with great eco-tourism potentiality with its natural beauty and wild lives. Without developing facilities we may not successfully market. At the same time shrimp culture plays a role in national development and enhancing foreign exchange but unplanned and unscientific shrimp culture have highly reduced the stock of indigenous fish and crop varieties in the southern cost. Planned cultivation could promote both shrimp and crops. Additionally the Mongla, natural sea-port is now going to be inactive due to lack of proper management and labor dissatisfaction. Thus, we see that the southern coast of Bangladesh is the richest area with its resources. The economic development and the sustainable use of natural resources of the Southern Coast and the protection of environment are synergistic and interdependent. The present article looks into the causes of destruction of natural resources and environment in southern coast of Bangladesh. It also emphasizes on the appropriate management and planning to overcome the problems.

ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। সুন্দরবন তার মধ্যে অন্যতম। দৃষ্টিনন্দন বৈচিত্র্যময় প্রাণী ও বৃক্ষ সম্পদে সমৃদ্ধ সুন্দরবন মানুষকে বিমোহিত করে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের সাহচর্যে অতীত থেকে তাই এখানে গড়ে উঠেছে জনবসতি ও ব্যবসা কেন্দ্র। বঙ্গোপসাগরের কূলঘেষে দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল। স্থলভূমি যেখানে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে সেই সংযোগস্থল উপকূল (Coast) নামে পরিচিত। জোয়ার ভাটা এ অঞ্চলের অন্যতম প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। সমুদ্রের জোয়ারের পানি স্থলভাগে সর্বাধিক সর্বাধিক যতদূর পর্যন্ত উঠতে পারে সে সীমানাকে উপকূলীয় রেখা ধরা হয়। সমুদ্রতরঙ্গ ও সমুদ্রস্রোতের গতিধারা প্রধানত উপকলূীয় রেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সমুদ্রতরঙ্গ ও স্রোতের প্রভাবে

---

* উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

এখানে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ Mangrove forest সুন্দরবন। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরের সাথে পশুর নদীর সংযোগস্থলে গড়ে উঠেছে সমুদ্র বন্দর মোংলা পোর্ট। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম এই সামুদ্রিক বন্দর সুন্দরবনের কূল ঘেঁষে পশুর নদীর পূর্ব পাশে অবস্থিত। সুন্দরবনের নয়নাভিরাম পরিবেশ ও বঙ্গোপসাগরের তীব্র ঢেউ প্রতিনিয়ত দেশ বিদেশের পর্যটকদের আকর্ষণ করে। তাই প্রতি বছর থাইল্যান্ড, চীন, সিংগাপুর, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা, মায়ানমার প্রভৃতি দেশের পর্যটকদের পদাচারণায় সুন্দরবন এলাকা মুখরিত থাকে। অসংখ্য ছোট বড় নদী সমগ্র সন্দুরবনের মধ্যে শিরা উপশিরার মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঐসব নদীতে প্রচুর মৎস্য সম্পদ থাকায় হাজার হাজার জেলে নদীতে মাছ ধরতে আসে। সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ, রকমারী বৃক্ষ ও বৈচিত্র্যময় প্রাণী পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে হাজার হাজার মানুষকে সম্পৃক্ত করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের ঐসব প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধ হতে পারে।

১.০ বনজ সম্পদ (Forest resources)

বাংলাদেশে গর্ব করার মত যে কয়টি প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তার মধ্যে সুন্দরবনের স্থান শীর্ষে। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ একক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট (Mangrove forest) সুন্দরবন। এই বনের ৬০ ভাগ এলাকা বাংলাদেশে এবং ৪০ ভাগ ভারতে অবস্থিত। বাংলাদেশে অবস্থিত সুন্দরবনের আয়তন ৫,৭৫৮ বর্গ কিঃমিঃ। সুন্দরবন বাংলাদেশের আয়তনের ৪% এবং মোট বনভূমির ৪৪% (BPC, 2002)। সুন্দরবন একটা সংরক্ষিত বনাঞ্চল। ১৯২৭ সালের বন আইনের বিধান অনুযায়ী বন বিভাগের অনুমতি ব্যতীত সুন্দরবনে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও বনজ সম্পদ, বন্যপ্রাণি ও মৎস্য সম্পদ আহরণ করা নিষেধ। সুন্দরবনসহ এ এলাকায় নদীনালা খাল-বিল হতে প্রতিবছর সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আসে। সুন্দরবনে সরকারিভাবে ১৯৩০ সাল থেকে রাজস্ব আদায় শুরু হয়। সুন্দরবন বিভাগের প্রশাসনিক কাঠামো চারটি রেঞ্জ ও ৪৭ টি কম্পার্টমেন্টে বিভক্ত। প্রশাসন, বন বিভাগ, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং নৌবাহিনীর সহায়তায় সুন্দরবনের নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং উপকূলীয় ইকোসিস্টেম (Eco-system) Mangrove সুন্দরবনে জীব-বৈচিত্র্যের (Biodiversity) এক বিশাল ভাণ্ডারে পরিণত করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুন্দরবনের বৃক্ষ, প্রাণি ও মৎস্য সম্পদ।

১.১ বৃক্ষ সম্পদ (Flora Resources)

পৃথিবীর ৩৫ প্রজাতির Mangrove উদ্ভিদের মধ্যে সুন্দরবনে ১৪ প্রজাতির Mangrove উদ্ভিদ আছে (BPC, 2002)। তবে অন্যান্য প্রজাতির সব উদ্ভিদ মিলে সর্বমোট ৩২৫ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। এর মধ্যে সুন্দরী বৃক্ষ সবচেয়ে বেশী, যার পরিমাণ ৫৫ ভাগ। সুন্দরবন এলাকায় নিয়মিত জোয়ার-ভাটার লবণাক্ত পানি প্রাবহিত হয়। ফলে যে সব উদ্ভিদ প্রজাতির গাছ লবণাক্ততা সহনশীল (Saline tolerant) সেসব গাছ সুন্দরবনে বেশী দেখা যায়। সুন্দরবনে যে সব বৃক্ষ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, গরান, বাইন, পশুর, সিংড়া, গোলপাতা, হরগজা ইত্যাদি। সমগ্র বন এলাকার মধ্যে সুন্দরীর ৭৩%, গেওয়াবন ৪.৯%, গরানবন ২.৩%, বাইনবন ০.১% ও পশুরবন ০.৫% এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। বাকী বন এলাকায় গোলপাতা, কেওড়া, কাকড়া আমুর, ধন্দুল প্রভৃতি গাছের সাথে সুন্দরী গাছও দেখা যায়। সুন্দরবনের নদী ও খাল বাদে শুধু বন এলাকার আয়তন ৪,০১৬.৮৫ বর্গ কিলোমিটার। জোয়ার-ভাটার কারণে সুন্দরবনের মাটি সব সময় ভিজে থাকে। ফলে মাটিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকে না। তাই গাছ প্রয়োজনীয় অক্সিজেন শ্বাসমূলের (Pneumatophore) মাধ্যমে গ্রহণ করে। সুন্দরবনের লবণাক্ত মাটি থাকার কারণে বিভিন্ন বনজ উদ্ভিদের বীজের অংকুরোদগমে (Germination) সমস্যা দেখা দেয়। ফলে প্রাকৃতিকভাবে সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া প্রভৃতি গাছের বীজে জরায়ুজ (Viviparous) অংকুরোদগম হয় অর্থাৎ গাছে থাকা অবস্থায় ফলের অভ্যন্তরে বীজ অংকুরিত হয়ে শিকড় বের হয়। অংকুরিত বীজ ফলের সাথে নরম মাটিতে পড়ে মাটি আকড়ে ধরে এবং নতুন গাছ জন্মায়। ফলে জোয়ার ভাটার পানির টানে গাছের বীজ নদী বা সমুদ্রে ভেসে যেতে পারে না।

সুন্দরবনের বৃক্ষ সম্পদ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার পাশাপাশি আমাদের দৈনন্দিন অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়। সারণী-১ হতে বিভিন্ন গাছের ব্যবহার সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

সারণী-১ ঃ সুন্দরবনের বৃক্ষ সম্পদ ও তার ব্যবহার

বৃক্ষের নাম	শতকরা হার	ব্যবহার
সুন্দরী	৫৫%	ঘরবাড়ী ও নৌকা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়
গেওয়া	২০%	নিউজপ্রিন্ট তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়
গরান	৫%	জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহার হয়
গোলপাতা	৩%	ঘরের ছাউনী ও বেড়া দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়
কেওড়া	২%	কাঠ জ্বালানী হিসেবে এবং গাছের ফল সব্জি হিসেবে ব্যবহার করা হয়
বাইন	১.৫%	জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয়

বৃক্ষের নাম	শতকরা হার	ব্যবহার
পশুর	১.৩%	আসবাবপত্র তৈরির কাজে ব্যবহার হয়
কাকড়া	১%	ঘরের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার হয়
সিংড়া আমুর ধুন্দুল অন্যান্য-হরগজা, অর্জুন ইত্যাদি	১২%	জ্বালানী খুঁটি হিসেবে ব্যবহার হয় জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার হয় কাঠ পেন্সিল তৈরির কাজে ব্যবহার হয় ঔষধিবৃক্ষ হিসেবে ব্যবহার হয়।

সূত্র ঃ বাংলাদেশের সুন্দরবন, পৃঃ ৬৪-৬৫ এবং বনবিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্য।

বনবিভাগের অনুমতিক্রমে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ সুন্দরবন হতে গোলপাতা কাঠ সংগ্রহ করে। এ পেশায় নিয়োজিত লোকদের বাওয়ালী বলে। এ খাত হতে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আয় হয়।

১.২ প্রাণী সম্পদ (Fauna Resources)

বাংলাদেশের সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর ৮০ ভাগ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর ৪০ ভাগ এবং পাখির ৫০ ভাগ সুন্দরবনে পাওয়া যায় (BPC, 2002)। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ৩২ প্রজাতি, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর ৩৫ প্রজাতি প্রাণীর ৩৫ প্রজাতি এবং পাখির ১৮.৭ সুন্দরবনে বসবাস করে (সচিত্র বাংলাদেশ জুন, ২০০৩)। বন্যপ্রাণীর মধ্যে অন্যতম রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রাল হরিণ, বানর, মায়া হরিণ, খেকশিয়াল, শুকর ইত্যাদি। সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে গুইসাপ, অজগর, কুমির এবং পাখির মধ্যে বনমোরগ, মদনটেক, চিল, সারস, গাংচিল, মাছরাঙ্গা, বক উল্লেখযোগ্য। বনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এসব প্রাণীর বসবাস এবং প্রজননে বিশেষ ভূমিকা রাখে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, সুন্দরবনে বর্তামনে ৩৬০টি বাঘ, ৮০,০০০ চিত্রাল হরিণ, ৪০,০০০ বানর আছে (BPC, 2003)। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য (Biodiversity) ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের অভাবে এবং জনসাধারণের জঙ্গলে অবাধ বিচরণে অনেক বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বিলুপ্ত প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বনমহিষ, জলকুমির, জাভান রাইনোসেরাস ইত্যাদি।

১.৩ সুন্দরবনের অন্যান্য সম্পদ (Other Resources in the Sundarbans)

সুন্দরবনে উৎপাদিত অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মধু ও মোম। বাংলাদেশের সর্বোৎকৃষ্ট মধু সুন্দরবনে পাওয়া যায়। গভীর জঙ্গলে মৌমাছি বাসা বাঁধে। বনের বিভিন্ন গাছে যখন ফুল ফুটে এ সময় মধুর উৎপাদন বেশী হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে সুন্দরবন হতে মধু আহরণ হয় ২৮১৭ মণ এবং মোম আহরণ হয়

৭০৩ মণ। ১৯৯৮-৯৯ সালে মধুর আহরণ হয় ৩১১৫ মণ এবং মোম আহরণ হয় ৮১৭ মণ (হারাধন বণিক ও বন বিভাগ)। যে সব গাছের ফুল হতে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে তার মধ্যে অন্যতম খলসী, বাইন, কাকড়া, গরান, গেওয়া, কেওয়া, পশুর ও সিংড়া। সুন্দরবনের মধু ও মোম সংগ্রহের কাজে শতশত লোক বনবিভাগের অনুমতি নিয়ে প্রতি বছর জঙ্গলে আসে। এ পেশায় নিয়োজিত লোকদের মৌয়াল বলে।

২.০ মৎস্য সম্পদ (Fish Resources)

দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে প্রচুর মৎস্য সম্পদ রয়েছে। ঐসব মৎস্য সম্পদ প্রধানত তিনটি উৎস হতে আসে। প্রথমত সামুদ্রিক মৎস্য, দ্বিতীয়ত সুন্দরবন এলাকায় অভ্যন্ত রীণ জলাশয় তথা নদী-নালা, খাল হতে উৎপাদিত মৎস্য এবং তৃতীয়ত উপকূলীয় চিংড়ী ঘেরে উৎপাদিত মৎস্য।

২.১ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ (Sea-fish Resources)

বঙ্গোপসাগরের ১২০,০০০ বর্গ কিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সীমানার মধ্যে অবস্থিত। এ বিশাল এলাকায় নানা জাতের মাছ পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে অন্যান্য মাছ বাদে প্রায় ৫৫ প্রজাতির চিংড়ী পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগরে প্রায় ১০০ প্রজাতির অন্যান্য মাছ রয়েছে। সাগরের মোহনা ও উপকূলের অগভীর অংশে ৪০ প্রজাতির মাছ হতে ৯৫% মাছ ধরা হয় যান্ত্রিক ও দেশীয় নৌকায়। কিন্তু গভীর সমুদ্রের ১০০ প্রজাতির মাছের মধ্যে মাত্র ৫% মাছ ধরা সম্ভব হয়। মাছ ধরার আধুনিক প্রযুক্তি না থাকায় এবং মৎস্য আহরণকারী জেলেরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হওয়ায় গভীর সমুদ্রের ৯৫% মাছ আহরণ করা সম্ভব হয় না। ১৯৯৬-৯৭ সালে সামুদ্রিক চিংড়ী ও সাদা মাছ হতে আয় হয় ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা। ১৯৯৮-৯৯ সালে আয় হয় ১ কোটি ৭২ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা (দৈনিক সংগ্রাম, ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০০)। এর মধ্যে আছে হিমায়িত চিংড়ী, হিমায়িত সাদা মাছ, তাজা মাছ, লবণাক্ত মাছ এবং শুকনা মাছ। জাতীয় উৎপাদনের ৩.৫ ভাগ এবং রপ্তানী বাবদ ১২ ভাগ অর্জিত হয় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ হতে। দেশে আহরিত মোট মাছের ২৮% সামুদ্রিক। মৎস্য আহরণের পেশায় নিয়োজিত আছে উপকূলীয় এগারটি জেলার দেড় লক্ষ মানুষ। এর সাথে পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল প্রায় ১ কোটি মানুষ। সুতরাং আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে সামুদ্রিক মৎস্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

২০০১-২০০২ সালে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা দেশে উৎপাদিত মাছের ২১% (দৈনিক দিনকাল, ১২ আগস্ট ২০০৩)। সত্তর ও আশির দশকের তুলনায় বর্তমানে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন কম। কারণ তখন

সামুদ্রিক মোট মাছের ৪০% আসত ইলিশ হতে যা বর্তমানে ১৪% নেমে গেছে। (নাসির উদ্দিন, ২০০৩)। জাটকা নিধন এবং জেলেদের ইলিশ মাছের প্রজনন ক্ষেত্রসমূহে অবাধ বিচরণের কারণে ইলিশ মাছের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমে গেছে।

২.২ সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ (Inland Water Fish Resources of Sundarbans)

সুন্দরবনের ৩০ ভাগ এলাকা জুড়ে রয়েছে ১৭৫৬ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের প্রায় ৪৫০টি ছোট বড় নদী-নালা ও খাল। এসব নদী-নালা ও খালে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোরাল, ইলিশ, চিংড়ী, রিটা, ট্যাংরা, শিলুন, গলদা, রেখা, পাংগাস, ভোল, দাতিনা ইত্যাদি মাছ। সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন নদী-নালা ও খালে ১৯৯৫-৯৬ সালে .০৭ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়। ২০০০-২০০১, ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ সালে মাছের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ০.১২ ০.১৩ এবং ০.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন (বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩)। উৎপাদিত মাছ দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাবে সুন্দরবন এলাকায় মৎস্য সম্পদ অনেক হ্রাস পেয়েছে। কারেন্ট জালের অবাধ ব্যবহার এবং চিংড়ী রেণু সংগ্রহ করতে গিয়েও অন্যান্য মাছের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট অঞ্চলে সত্তর দশকের শেষভাগে চিংড়ী চাষ শুরু হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ীর মূল্য ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়ায় চিংড়ী চাষের প্রতি এলাকার মানুষ আগ্রহী হয়ে উঠে। চিংড়ী চাষের প্রাথমিক পর্যায়ে জোয়ারের পানির সাথে যে চিংড়ীর রেণু চিংড়ী খামারে (Shrimp farm) প্রবেশ করতো সে রেণু বড় হয়ে পূর্ণাঙ্গ চিংড়ীতে পরিণত হতো। খামার মালিকগণ ঐ চিংড়ী বিক্রি করে লাভবান হতো। পরে বাণিজ্যিকভাবে অধিক লাভের আশায় আশির দশকে উপকূলীয় অঞ্চলে 'কারেন্টজাল' দিয়ে নদী থেকে চিংড়ী রেণু সংগ্রহ করা শুরু হয়। ঐসময় চিংড়ী রেণু সংগ্রহ করতে গিয়ে অন্যান্য মাছের রেণু ব্যাপকভাবে মারা যায়। নেটজালের মাধ্যমে আহরিত রেণুর মধ্যে মাত্র ৩% চিংড়ী রেণু বাকী ৯৭% অন্যান্য মাছের রেণু থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে ১টা বাগদা চিংড়ীর রেণু নদী হতে আহরণ করতে গিয়ে ১৭৭টি অন্যান্য মাছের রেণু এবং ১০৯৬টি মাছের খাদ্যকণা বিনষ্ট হয়। ফলে উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে এবং জলজ জীবের খাদ্য চক্র (Food cycle) ব্যাহত হচ্ছে।

২.৩ উপকূলীয় চিংড়ী সম্পদ (Coastal White Gold Resources)

প্রাকৃতিকভাবে উপকূলীয় এলাকায় বাগদা ও গলদা চিংড়ী উৎপাদন হয়। সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ীর চাহিদা ও মূল্য বেড়ে যাওয়ায় দক্ষিণ উপকূলীয় জেলায় বিশেষ করে সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগের হাটে চিংড়ী চাষ শুরু হয়। চিংড়ী

চাষ লাভজনক হওয়ার কারণে মহাজন শ্রেণী ফসলের জমিতে চিংড়ী চাষ শুরু করে। ১৯৮৯-৯০ সালে চিংড়ী খামারের আয়তন ছিল ৬৪ হাজার হেক্টর, ১৯৯৮-৯৯ তে খামারের আয়তন দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৪১ হাজার হেক্টর (দৈনিক দিনকাল, ১২ আগষ্ট ২০০৩)। দশ বছরে চিংড়ী খামারের আয়তন বৃদ্ধির হার ১০০ ভাগ। আয়তনের সাথে সাথে উৎপাদনও বেড়েছে। ১৯৯০-৯১ তে চিংড়ী উৎপাদন হয় ২৮,৪৩১ মেট্রিক টন এবং ২০০১-২০০২ তে উৎপাদন দাঁড়ায় ৯৪,৬০৫ মেট্রিক টন (নাসির উদ্দিন, ২০০৩)। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৫৯৭৮টি বাগদা চিংড়ী খামার আছে, এর সিংহভাগ দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত। প্রতিটি খামারের গড় আয়তন ৯.১৮ হেক্টর। দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার যেসব স্থানে লবণাক্ততার মাত্রা বেশী ঐসব এলাকায় বাগদা চিংড়ীর খামার এবং যেখানে বেড়িবাঁধের মাধ্যমে লবণ পানি প্রতিরোধ করা হয়েছে ঐ এলাকায় গলদা চিংড়ীর খামার গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ খামারে সনাতন পদ্ধতিতে (Traditional method) বাগদা ও গলদা চিংড়ীর আবাদ হওয়ায় উৎপাদন কম হয়। উল্লেখ্য উন্নততর প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে থাইল্যান্ডে হেক্টর প্রতি চিংড়ীর উৎপাদন ২.১৩৪ কেজি কিন্তু বাংলাদেশে হেক্টর প্রতি উৎপাদন হয় ৪৫৭.৩৪ কেজি (১৯৯৯-২০০০)। বিশ্ব ব্যাংক বিশেষজ্ঞের মতে নিবিড় ও আধা-নিবিড় (Intensive and semi-intensive) পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে বাংলাদেশে চিংড়ীর উৎপাদন ৩ থেকে পাঁচ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সারণী-২ ঃ বিশ্বের শীর্ষ ১২টি চিংড়ী উৎপাদনকারী দেশ (১৯৯৮ সালের হিসাব অনুযায়ী)।

ক্রমিক নং	দেশ	উৎপাদন (মেট্রিক টন)
১.	চীন	৯৭৫৯৮২
২.	ইন্দোনেশিয়া	৩৯৪৯৭০
৩.	ভারত	৩৮৫৪০৩
৪.	থাইল্যান্ড	৩৬৭৭৮৭
৫.	ইকোয়েডর	২৪৯৫০০
৬.	ভিয়েতনাম	১৯৬০০০
৭.	যুক্তরাষ্ট্র	১২৭৯৯১
৮.	কানাডা	১২০৮৮৩
৯.	মেক্সিকো	৯০৩৩৫
১০.	ফিলিপাইন্স	৭১৬০৮
১১.	বাংলাদেশ	৬৬০৮০
১২	আইসল্যান্ড	৬২৭২৭

সূত্র ঃ সাপ্তাহিক রোববার, ১৯ জানুয়ারী ২০০৩।

পূর্বের আলোচনা এবং সারণী-২ হতে দেখা যায় বাংলাদেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় হেক্টর প্রতি চিংড়ী উৎপাদন কম এবং উৎপাদনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ **১১তম** স্থানে আছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের সুনাম নষ্ট হওয়ায় এবং চিংড়ীর উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ স্বাস্থ্যসম্মত না হওয়ায় বাংলাদেশের চিংড়ীর মূল্য তুলনামূলকভাবে কম। ২০০০ সালে জাপান বিশ্বের ১০টি দেশ হতে চিংড়ী আমদানী করে কেজি প্রতি ভিন্ন ভিন্ন মূল্য পরিশোধ করে (সারণী-৩)।

সারণী-৩ ঃ জাপান কর্তৃক বিভিন্ন দেশ হতে আমদানী করা চিংড়ীর পরিশোধিত মূল্য।

ক্রমিক নং	দেশ	পরিশোধিত মূল্য (ইউএস ডলার/কেজি)
১.	হংকং	২০.২৬
২.	অস্ট্রেলিয়া	১৮.০২
৩.	তাইওয়ান	১৭.৯২
৪.	ব্রাজিল	১৬.০৪
৫.	পাকিস্তান	১৫.৮২
৬.	থাইল্যান্ড	১৪.৩৮
৭.	মালয়েশিয়া	১৩.৬৬
৮.	ইন্দোনেশিয়া	১২.৭৯
৯.	ভারত	১০.৯০
১০.	বাংলাদেশ	৭.৭৪

সূত্র ঃ The Bangladesh Observer, 25 June 2002.

দেশে ১২৭টি মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা আছে যার উৎপাদন ক্ষমতা ২ লক্ষ ৬৫ হাজার মেট্রিক টন। দেশের সুনাম বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীদের সৎ হওয়া প্রয়োজন এবং মাছ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত করা দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে এগুলির উন্নয়ন করা সম্ভব হলে চিংড়ীর রপ্তানী মূল্য ১০০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

চিংড়ি খামারগুলিতে ব্যবহৃত ৬০ ভাগ চিংড়ী রেণু ৪০ ভাগ প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণুর মৃত্যু-হার বেশী হওয়ায় খামার মালিকগণ প্রাকৃতিক উৎসের চিংড়ী রেণু বেশী পছন্দ করে। বর্তমানে ৪৪টি হ্যাচারিতে বছরে ৪০০-৫০০ কোটি রেণু উৎপাদন হয় যা চাহিদার তুলনায় কম। তাই প্রকৃতিক উৎস নদী-নালা, খাল থেকে চিংড়ী রেণু সংগ্রহ করতে হয়। হ্যাচারী শিল্পে বিনিয়োগের পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানায় হ্যাচারী গড়ে উঠলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, সাথে সাথে প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ী রেণু সংগ্রহ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ী রেণু সংগ্রহের সময় অন্যান্য মাছের অসংখ্য রেণু মারা যায়।

৩.০ উপকূলীয় অঞ্চলের ফসল ও পশু সম্পদ (Crops and Livestock in coastal Area)

উপকূলীয় এলাকায় ৭০ ভাগ কৃষি জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। মাটি লবণাক্ত হওয়ায় স্থানীয় জাতের আমন ধানের চাষ বেশী হয়। এসব জাতের মধ্যে রাজাসাইল, কার্তিকসাইল, সাদামোটা, লালমোটা, বেতিবালাম, জামাইনাড়ু, গন্ধকস্তুরী, আরমান সরদার, নোনাকচি উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় ধানের জাতসমূহ লবণাক্ততা সহিষ্ণু (Salt-tolerant)। কম চাষে এবং স্বল্পমাত্রার পরিচর্যায় এসব জাত ভাল ফলন দেয়। উচ্চ-ফলনশীল জাতের তুলনায় স্থানীয় জাতের ধানে ফলন কম। কিন্তু স্থানীয় জাতসমূহ রোগ প্রতিরোধী উপরন্তু রাসায়নিক সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তাই কৃষকের কাছে উচ্চ ফলনশীল জাতের (HYV) তুলনায় স্থানীয় জাত বেশী গ্রহণযোগ্য। উপকূলীয় এলাকায় উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের (Horticultural crops) মধ্যে নারিকেল, সুপারী, আমড়া, কুল, সফেদা ও খেজুর উল্লেখযোগ্য। এসব ফসল উৎপাদনের জন্য আর্দ্র ও অল্পমাত্রার লবণাক্ত মাটির প্রয়োজন হয়। সমুদ্র হতে স্থলভাগে প্রবাহিত ধীরগতির বায়ু প্রবাহ এসব উদ্ভিদের পরাগায়নে (Polination) সহায়তা করে থাকে। উপকূলীয় এলাকার মাটি, পানি ও আবহাওয়া ঐসব ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখে তাই নারিকেল, সুপারী এ অঞ্চলে বেশী চাষ হয়। উপকূলীয় এলাকায় পশু সম্পদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মহিষ। জলাভূমি এবং চর এলাকায় মহিষের প্রজনন ও উৎপাদন বেশী হয়। সে কারণে উপকূলে মহিষ বেশী দেখা যায়। মহিষের পাশাপাশি গরু ও ছাগল কম-বেশী উৎপাদন হয়। উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আবহাওয়া স্থানীয় জাতের আমন ধান, নারিকেল, সুপারী এবং মহিষ উৎপাদনের জন্য অনুকূল হলেও চিংড়ী চাষ শুরু হওয়ার পর ঐসব ফসল ও পশু সম্পদ আস্তে আস্তে কমে গেছে। কারণ চিংড়ী চাষের জন্য অত্যধিক মাত্রার লবণাক্ত পানির প্রয়োজন হয়। কিন্তু অত্যধিক মাত্রার লবণাক্ত পানি ফসল ও পশু সম্পদের জন্যে ক্ষতিকর। এ কারণে উপকূলীয় এলাকার সাধারণ কৃষকের আর্থিক অবস্থা চিংড়ী চাষের ফলে চরম সংকটের মধ্যে পড়েছে।

৪.০ প্রাকৃতিক সামুদ্রিক বন্দর মোংলা (Natural sea-port Mongla)

মোংলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর। সুন্দরবনের কূল ঘেঁষে পশুর নদীর মোহনায় পূর্ব ও উত্তর তীরে মোংলা বন্দর অবস্থিত। ১৯৪৭ সালের পূর্বে চট্টগ্রাম একমাত্র সামুদ্রিক বন্দর ছিল। ১৯৫০ সালে মোংলায় সিটি অব লীয়নস নামে সর্বপ্রথম এটা বাণিজ্যিক জাহাজ আসে। সেই থেকে মোংলা বন্দরের যাত্রা শুরু।

বন্দর হতে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। পশুর নদী সাগরের যে স্থানে মিলিত হয়েছে ঐ স্থানের নাম হিরণপয়েন্ট। বিদেশ হতে আগত বাণিজ্যিক জাহাজ

প্রথম হিরণপয়েন্টে নোঙ্গড় করে। পরে পশুর নদী ও সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলের মধ্যদিয়ে জাহাজ মোংলা বন্দরের জেটিতে আসে। সত্তর হতে নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বন্দরে বছরে প্রায় ১০০০ হাজার আমদানী রপ্তানী পণ্য নিয়ে আসা-যাওয়া করতো। গড়ে প্রতিমাসে বন্দরে ৮০-৯০টি জাহাজ দেখা যেতো কিন্তু নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি জাহাজের আগমন অনেক কমে গেছে। শ্রমিক ধর্মঘট, বন্দরের অব্যবস্থাপনা, ড্রেজিং সমস্যার কারণে বর্তমানে মাসে ১০-১৫টির বেশী জাহাজ থাকে না। এমনকি কোন কোন মাসে জাহাজ-শূন্য অবস্থা থাকে। সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকলে এ বন্দরের মাধ্যমে প্রচুর রাজস্ব আয় হতে পারে। সমুদ্র পথে দেশের মোট রপ্তানীর ১৩.৩০% এবং আমদানী রপ্তানীর ১১.০৮% মোংলা বন্দরের মাধ্যমে হয় (মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ)। এই বন্দরের কারণে মোংলায় গড়ে উঠেছে অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প কারখানা। শিল্পকারখানার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ও এলপি গ্যাস প্লান্ট। সরকারিভাবে মোংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা (EPZ)। এখানে গার্মেন্টস, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ এবং বিদেশে রপ্তানীযোগ্য পণ্যে বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ আছে। রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হলে মোংলা বন্দরের কার্যক্রম বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে বন্দরের কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ।

সারণী-৪ ঃ মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয়-ব্যয় বিবরণী

বছর	রাজস্ব আয় লক্ষ টাকা (প্রায়)	রাজস্ব আয় লক্ষ টাকা (প্রায়)	নীট মুনাফা লক্ষ টাকা (প্রায়)
১৯৯৫-৯৬	৬৪৬২	৪৪১৬	২০৪৬
১৯৯৬-৯৭	৬২৭০	৪৫৬৭	১৭০৩
১৯৯৭-৯৮	৬৮২৮	৪৭৮৩	২০৪৪
১৯৯৮-৯৯	৭৪২১	৫০৪৮	২৩৭৩
১৯৯৯-২০০০	৭৮৭৬	৫৪১৩	২৪৬৩
২০০০-০১	৭৫৮৬	৫৫০০৪	২০৮২
২০০১-০২	৬৪৬২	৫৪৬৪	৯৯৪
২০০৩-০৩ জানুয়ারী পর্যন্ত	৩০৬৬	২৮৭৭	১৮৯

সূত্র ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০০।

সারণী-৪ হতে দেখা যায় ২০০১-২০০২ সালে বন্দরের নীট মুনাফা পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় অর্ধেকেরও কম। এর অন্যতম কারণ, বন্দরে শ্রমিক ধর্মঘট ও বিভিন্ন শ্রমিক গ্রুপের ভিতর দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং বন্দর কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনা। বন্দর ব্যবস্থাপনা আধুনিকিকরণ করা হলে এবং শ্রমিকদের প্রকৃত সমস্যা সনাক্ত করে

সমাধান করা গেলে পণ্য আমদানী-রপ্তানী বেড়ে যাবে এবং বন্দর হতে রাজস্ব আয় বেশী হবে।

৫.০ উপকূলীয় পর্যটন এলাকা ঃ (Coastal Tourism Spot)

দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় অবস্থিত সুন্দরবন, সমুদ্র, নদী-নালা, খাল এবং নৈসর্গিক পরিবেশ ভ্রমণপিপাসু মানুষদের আকৃষ্ট করে। কেবল বাংলাদেশের নয়, পৃথিবীর অন্যতম টুরিস্ট আকর্ষণ সুন্দরবন। নদীপথে এখানে ভ্রমণ খুবই আনন্দদায়ক। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম কটকা, কচিখালী, নীলকমল ইত্যাদি।

কটকা ঃ সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে সুবিশাল বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে অপূর্ব মনোরম পরিবেশে কটকা অবস্থিত। একটু দূর হতে বনের দিকে তাকালে মনে হয় কোন এক শিল্পী তার কোমল হাতের তুলিতে বৃক্ষরাজি স্তম্ভেরমত এঁকে রেখেছে। বনের সব গাছ দূর থেকে সমান উচ্চতায় দেখা যায়। এখানে হরিণ, বানর, অজগরসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী বসবাস করে।

কচিখালী ঃ সুন্দরবনের বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য কেন্দ্র। ১৯৮২ সালে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ছোট বড় অনেক খাল বনের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। পর্যটকদের জন্যে আকর্ষণীয় স্থান। নৌকায় গেলে খালের দু'পাশে জঙ্গলে অনেক চিত্রল হরিণ ও বানর দেখা যায়।

নীলকমল (হিরণ পয়েন্ট) ঃ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, একটা সুন্দর দর্শনীয় স্থান। বঙ্গোপসাগরের সন্নিকটে নদীর দক্ষিণ পাড়ে মনোরম পরিবেশে নীলকমল অবস্থিত। এখানে হরিণ, বানর, বনমোরগ ও মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়।

মান্দারবাড়িয়া ঃ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে ভ্রমণের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মনোরম স্থান। এখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখা যায়।

দুবলারচর ঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র এবং পর্যটন এলাকা। এখানে প্রতি বছর কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় সপ্তাহব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাংলাদেশসহ ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন, জাপান হতে অনেক লোক দুবলারচরে সমবেত হয়।

বাংলাদেশের পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য সুন্দরবনসহ দেশে গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থান আছে। নিরাপত্তাহীনতা, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যটন এলাকার সুষ্ঠু অভাবে দেশী-বিদেশী পর্যটকগণ ভ্রমণে আগ্রহী হয় না। পর্যটন শিল্প হতে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের জন্যে জরুরী

ভিত্তিতে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায় সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সারণী-৫ ঃ বাংলাদেশে আগত পর্যটক সংখ্যা ও আয়

বিষয়	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯
পর্যটক আগমন (সংখ্যা)	১৮২৪২০	১৭১৯৬১	১৭২৭৮১
আয় (কোটি টাকা)	২৭৪ কোটি ১৪ লক্ষ	২৪৫ কোট ৪৮ লক্ষ	২৪৫ কোটি ১১ লক্ষ

সূত্র ঃ The Express, 12 September 2003

৬.০ উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ এবং ঐতিহ্য (Coastal Environment and Heritage)

শুধু বাংলাদেশের নয় সুন্দরবন বিশ্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (UNESCO) ১৯৯৭ সালে ৬ ডিসেম্বর সুন্দরবনকে বিশ্বের ৫২২তম বিশ্ব ঐহিহ্যের (World Heritage) অংশ হিসেবে ঘোষণা করে। বিশ্ব ঐতিহ্যের আওতায় ৩৮২ কোটি টাকা ব্যায়ে ডাইভারসিটি কনজারভেশন নামে একটা প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্প প্রণয়নে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকায় ২০০০ সালে প্রকল্পটি স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রকল্পটি ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়া চলছে। নতুন প্রকল্পে স্থানীয় জনসাধারণ ও সম্পদের বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নতুন প্রকল্পটি বাস্ত বায়নের পরে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতি সবার সচেতনতা বাড়বে। এ প্রকল্পে বনের ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্যে ইকো-টুরিজমকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

ঝড় জলোচ্ছ্বাস আর দুর্যোগপ্রবণ এলাকা বৃহত্তর খুলনার হাজার হাজার মানুষকে সুন্দরবন তার সন্তানের মতো আকড়ে রেখেছে। ফলে প্রতি বছর এপ্রিল-মে এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নিম্নচাপের প্রভাবে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবন এলাকার মানুষ এবং সম্পদ ব্যাপক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। সমুদ্রপৃষ্ঠে উৎপন্ন তীব্র ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনে বাধা পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ বা উড়িষ্যার উপকূল দিয়ে চলে যায়। এভাবে সুন্দরবন দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার মানুষ ও সম্পদ রক্ষা করে। সুন্দরবন দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার আবহাওয়ার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দক্ষিণ উপকূলে সুন্দরবনের প্রভাবে প্রচুর মৌসুমী বৃষ্টিপাত হয় যা ফসল উৎপাদনে সহায়তা করে। সুন্দরবনে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ২১৩০ মিলিমিটার। মার্চ হতে এপ্রিল মাসে সুন্দরবন এলাকার পানিতে লবণাক্ততার মাত্রা ২০০০-৪০০০ mmohs। জুলাই-আগস্ট মাসে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে লবণাক্ততা ১০০০ mmohs এ নেমে আসে (হারাধন বণিক ১৯৯৯)। উপকূলীয় এলাকায় পর্যাপ্ত পানি থাকায় পানির বাষ্পায়ন হার (Evaporation rate) বেশী হয় এবং আকাশে

মেঘের আনাগোনা বেশী থাকে। ফলে সমুদ্র হতে প্রবাহিত মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সুন্দরবন এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টির প্রভাবে উপকূলীয় এলাকার নদী, নালা, খাল, বিলের লবণাক্ত পানি মিষ্টি (Fresh) পানিতে পরিণত হয়। ফলে বর্ষা মৌসুমে এ অঞ্চলে আমন ধানের আবাদ বেশী হয়। উপকূলীয় এলাকায় প্রতিদিন ২৪ ঘন্টা ৫০ মিনিটে ২ বার জোয়ার ও ২ বার ভাটা হয়। জোয়ারের পানির বেগ ঘন্টায় ৪৮ কিলোমিটার। সাধারণ উচ্চতা ৩ থেকে ৪ ফিট। তবে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার সময় জোয়ারের পানির উচ্চতা ৬-৭ ফিট পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। জোয়ার-ভাটার কারণে এ অঞ্চলে মৌসুমী বৃষ্টিপাত বা উজানের পানির প্রবাহে বন্যা দেখা দিলে তা কখনও স্থায়ী হয় না। ফলে ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালে সারাদেশে বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হলেও উপকূলীয় এলাকায় বন্যায় তেমন ক্ষতি হয়নি। সাধারণত এ এলাকায় নভেম্বর হতে মার্চ পর্যন্ত ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। এ সময় ভ্রমণের উত্তম সময়।

৭.০ হুমকির মুখে দক্ষিণ উপকূলীয় প্রাকৃতিক সম্পদ

৭.১ সুন্দরবনের বৃক্ষ নিধন ঃ পৃথিবীর অন্যতম mangrove forest সুন্দরবন কৃষি জমির বৃদ্ধি, বৃক্ষ নিধন ও মানুষের অবাধ বিচরণে ধ্বংসের সম্মুখীন। অনুমতি নিয়ে অথবা অননুমোদিতভাবে যারা বন এলাকায় প্রবেশ করে তারা বনের ব্যাপক ক্ষতি করে। বন বিভাগ ও নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর অসততার কারণে বন থেকে কাঠ চুরি হয়। সুন্দরবন ৪৫ ভাগ জ্বালানী কাটের চাহিদা মিটায়। কাঠ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহের জন্য বন বিভাগের নিকট হতে পাশ গ্রহণ করতে হয়। পাশ গ্রহণের সময় জেলে, বাওয়ালী ও মৌয়ালদের ভাষ্যমতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত টাকা দিতে হয়। ফলে এসব পেশায় নিয়োজিত মানুষ অনুমোদনের অতিরিক্ত সম্পদ সুন্দরবন থেকে সংগ্রহ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, দৈনিক ৫০ হাজার মানুষ বিভিন্ন কাজে সুন্দরবন আসে। এর মধ্যে মধু, মোম, মাছ, গোলপাতা, সুন্দরী ও গেওয়া কাঠ, সংগ্রহের জন্যে ৭০% মানুষ জঙ্গলে আসে। মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত জেলেরা বনের ছোট ছোট গাছ কেটে মাছ ধরার সরঞ্জাম তৈরী করে, ফলে প্রতিদিন শতশত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সুন্দরী, বলা, সিংড়া, কাড়া জাতীয় বৃক্ষ নিধন হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক কারণেও বন উজাড় হয়। ফারাক্কা বাঁধের ফলেও দক্ষিণ উপকূলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণের তীব্রতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের অনেক বৃক্ষ মারা গেছে। ১৯৯৪-৯৫ সালে আগামরা (Top dying) রোগের কারণে ২৪,৫৫৬ কিউবিক মিটার কাঠ ও ৩৭,৪১৮ কিউবিক মিটার জ্বালানী কাঠ নষ্ট হয়েছে (হারাধন বণিক, ১৯৯৯)। এ রোগের প্রভাব এখনও সুন্দরবনে দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঘুর্ণিঝড়ে বনের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১, ১৯৯৫ সালের ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯৮৮ সালের ঝগে সুন্দরবনে ১৮,০০৯৩৬২টি বৃক্ষ মারা যায় (Arnon, 1988)।

৭.২ বন্যপ্রাণী নিধন ঃ ১৯৭৪ সালের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইন অনুসারে ১৯৭৭ সালে সুন্দরবনে তিনটি অভয়ারণ্য গড়ে উঠে। কটকা, কচিখালী, সুপাতি ও জামতলা নিয়ে সুন্দরবন ইস্ট নীলকমল (হিরণপয়েন্ট), কেওড়া, কালীরচর ও পাটনী নিয়ে সুন্দরবন সাউথ এবং মান্দারবাড়ী, নোটাবেকী নিয়ে সুন্দরবন ওয়েস্ট এ তিনটি অভয়ারণ্য গড়ে উঠে বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা বিধানের জন্যে। কিন্তু সুষ্ঠু বন ব্যবস্থাপনার অভাবে অভয়ারণ্যের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে বাস্তাবায়িত হয়নি। বনদস্যুরা চোরাই পথে বা গোপনে জঙ্গলে প্রবেশ করে বাঘ, হরিণ, পাখি ও সরীসৃপ জাতীয় অনেক প্রাণী শিকার করার ফলে ইতোমধ্যে ঐগুলি ধ্বংসের পথে চলে গেছে। ২০০১ সালের বাঘ-শুমারী অনুযায়ী সুন্দরবনের ২৫৮৫ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বাঘের সংখ্যা ২৫৪টি সনাক্ত করা হয়েছে। এ পরিমাণ পূর্বের তুলনায় কম। প্রতি বছর কার্তিক মাসে দুবলারচরে পূর্ণিমা মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় হাজার হাজার মানুষ সুন্দরবনে যাতায়াত করে এবং বণ্যপ্রাণী বিশেষ করে হরিণ শিকার করে। এ সময় হরিণ শিকার করা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে।

৭.৩ মৎস্য সম্পদ ধ্বংস ঃ প্রতিদিন ১০ হাজার জেলে মাছ ধরার জন্য সুন্দরবন এলাকায় প্রবেশ করে এবং ২৮০ টন মাছ আহরণ করে (DOF, 1998। অক্টোবর হতে মার্চ পর্যন্ত সমুদ্র শান্ত থাকায় ঐ সময় মাছ ধরার জন্য অনেক মানুষ সমুদ্রে যায়। সুন্দরবন সংলগ্ন নদী থেকে রেণু ও খাদ্যকণার ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ কারণে উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। খাদ্যকণা নষ্ট হওয়ায় জলজ জীবের খাদ্যচক্র (Food cycle) ব্যাহত হচ্ছে। মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রে জেলেদের অবাধ বিচরণে মাছের প্রজনন হার কমে গেছে। অন্যদিকে বিভিন্ন প্রজাতির মাচের রেণু ও জাটকা নিধনের ফলে সমুদ্রের ইলিশসহ অন্যান্য মাছের পরিমাণ কমে গেছে। জাহাজ হতে নির্গত বর্জ্য পদার্থ সমুদ্রের পানি দূষিত করে। এসব মানব সৃষ্ট কারণে ইতোমধ্যে উপকূলীয় ইকো-সিস্টেম-এ ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। ফলে মাছের পরিমাণ দিনে দিনে কমে গেছে। গভীর সমুদ্র হতে মাছ আহরণ পদ্ধতি উন্নত না হওয়ায় এবং জেলেরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত না হওয়ায় সমুদ্র হতে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মাছ আহরণ করা যায় না। উপরন্তু যে মাছ আহরণ করা হয় সংরক্ষণের অভাবে তার অনেকাংশ নষ্ট হয়ে যায়।

৭.৪ অন্যান্য সম্পদ ধ্বংস ঃ সুন্দরবন হতে মৌয়ালগণ বছরে ২৫০ মেট্রিক টন মধু ও ৫০ মেট্রিক টন মোম আহরণ করে (হারাধন বণিক)। মধু আহরণের পদ্ধতি আধুনিক না হওয়ায় প্রচুর মৌমাছি মারা যায় এবং মধুর গুণাগুণ নষ্ট হয়। মৌচাকে ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি বিতাড়িত করে মৌয়ালগণ মৌচাক ভেঙ্গে মধু সংগ্রহ করে। ফলে অনেক মৌমাছি মারা যায়। মৌয়ালদের অদক্ষতার কারণে সুন্দরবনে মধুর উৎপাদন কমে গেছে। একইভাবে সুন্দরী কাঠসহ অন্যান্য বনজ সম্পদ সংগ্রহের

পদ্ধতি উন্নত না হওয়ায় সুন্দরবনের অন্যান্য সম্পদ নষ্ট হচ্ছে। বনের প্রাণী ও নদীর মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হওয়ার কারণে জীববৈচিত্র্যে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক প্রভাব দেখা দিয়েছে।

৭.৫ উপকূলীয় পরিবেশ বিপর্যয় ঃ মানব সৃষ্ট কারণে এবং সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে উপকূলীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তাই ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা ও পরিমাণ পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে। উপকূলীয় এলাকার চিংড়ী চাষ বৃদ্ধির ফলে জমির উর্বরতা কমে গেছে। মাঠ-ফসল ও উদ্যান-ফসলের উৎপাদন ও ফলন কমে গেছে। অনেক ফসলের জাত ও বৃক্ষ সম্পদ ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুন্দরবন এলাকায় দস্যুতা ও ডাকাতি বৃদ্ধি পাওয়ায় পর্যটকদের যাতায়াত কমে গেছে। বৈধভাবে সমুদ্র হতে মাছ আহরণ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহের সাথে নিয়োজিত মানুষের ভয়ভীতির মধ্য দিয়ে দিন কাটে। ফলে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয়। উপকূলীয় এলাকার চিংড়ী চাষের ফলে উচ্চশ্রেণী ও নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যকার বৈষম্য দিনে দিনে বেড়ে যাওয়ায় সামাজিক পরিবেশ ও শৃংখলা নষ্ট হয়ে গেছে। চিংড়ী চাষের ফলে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটছে। বিগত বছরগুলিতে চিংড়ী ঘেরে মারাত্মকভাবে ভাইরাস আক্রমণের ফলে কোটি কোটি টাকার চিংড়ী মরে গেছে। অনেক ঘের মালিক নিঃস্ব হয়ে এলাকা ছেড়ে গেছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় দক্ষিণ উপকূলীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সঠিক ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার অভাবে ক্রমেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জরুরী ভিত্তিতে এ অবস্থার উত্তোরণ প্রয়োজন।

৮.০ উপকূলীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

৮.১ সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জল সীমার মধ্যে রয়েছে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ। সঠিক পরিকল্পনা ও বাস্তবসম্মত কর্মসূচির মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। অবাধে জাটকা নিধন, চিংড়ী রেণু সংগ্রহের সময় অন্যান্য মাছের রেণু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা গেলে ৪/৫ বছরের ভেতর সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের পরিমাণ কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। এক্ষেত্রে The Protection and Conservation of Fish Act, 2002 (সংশোধিত) আইনটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা গেলে মৎস্য সম্পদ রক্ষা পাবে। এ আইনে কারেন্ট জাল উৎপাদন, ব্যবহার, মজুদ, বাজারজাতকরণ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নভেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জাটকা রোধ করে দেশের ইলিশ সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব। উল্লেখ্য, আগে সামুদ্রিক মোট মৎস্যের মধ্যে ইলিশ মাছ ছিল ৪০ ভাগ বর্তমানে যা ১৪ ভাগে নেমে এসেছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার

আলোকে ২০০১-২০০২ সালে ৪ লক্ষ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন হয়, যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের ২১%; কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪০%। ভারত, শ্রীলংকা, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণকারীগণ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং মাছ ধরার পদ্ধতি আধুনিক। ভারতে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সমুদ্রে মাছের উপস্থিতি চিহ্নিত করে টেলিফোনে জেলেদের অবহিত করার ব্যবস্থা আছে। আমাদের দেশেও এ জাতীয় কর্মসূচির পাশাপাশি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেয়া যেতে পারে ঃ

- সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রশিক্ষণ দেয়া;
- মাছ আহরণের আধুনিক উপকরণ সহজ শর্তে ঋণের মাধ্যমে জেলেদের সরবরাহ করা;
- মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকিকরণ করা;
- মাছ বাজারজাতকরণ ও পরিবহনে সরকারি সহায়তা দেয়া;
- উপকূলীয় এলাকায় সরকারি/বেসরকারি/ব্যক্তি মালিকানায় বরফ কল ও হিমাগার স্থাপন করা;
- উপযুক্ত স্থানে সামুদ্রিক মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করা;
- সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ অপচয় রোধের জন্যে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা;
- ইলিশ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে জাটকা আহরণ, বাজারজাতকরণ ও বিক্রি কঠোর হাতে দমন করা;
- চিংড়ী ও অন্যান্য মাছের রেণু হেচারীতে উৎপাদন করে নদীতে অবমুক্ত করা; এবং
- কোষ্ট-গার্ডের দক্ষতা বৃদ্ধি করে দেশি-বিদেশি অবৈধ জেলেদের হাত থেকে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ রক্ষা করা।

[২০০১-২০০২ সালের জিডিপিতে মাছের অবদান ছিল ৫%। ঐ সময় রেকর্ড পরিমাণ ৪১.৫৯৭ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানী হয়েছে (দিনকাল, ১২ আগষ্ট ২০০৩)। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার মাধ্যমে জিডিপিতে মাছের অবদান ১০% এ বর্ধিত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদন ৪ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২০ লক্ষ মেট্রিক টনে বৃদ্ধি করা সম্ভব]

৮.২ উপকূলীয় চিংড়ী চাষ ঃ ১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১, ২০০১-২০০২ এবং ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে চিংড়ী রপ্তানী করে আয় হয় যথাক্রমে ১৭২২, ১৮৯৮, ১৪০০ এবং ১৭৯০ কোটি টাকা (ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ২০০৩, প্রথম আলো, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩)। সঠিক ব্যবস্থাপনা, আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি প্রবর্তন, মাছ

প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি উন্নত, স্বাস্থ্য সম্মত ও আধুনিক করা গেলে চিংড়ী থেকে রপ্তানী আয় দ্বিগুণ করা সম্ভব। বিশেষজ্ঞদের মতে চিংড়ী চাষের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি (Shrimp seal of quality (SSOWQ) ব্যবহার করা গেলে উৎপাদন ১০ গুণ পর্যন্ত বাড়বে। এর ফলে-

- চিংড়ীর গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের চিংড়ীর চাহিদা বাড়বে।
- একর প্রতি উৎপাদন বেশী হবে
- চিংড়ী খামার ব্যবস্থাপনা উন্নত করা সম্ভব হবে
- ভাইরাসের আক্রমণ হতে চিংড়ী খামার রক্ষা করা যাবে এবং
- মাছ প্রক্রিয়াকরণ স্বাস্থ্যসম্মত হবে।

SSOQ পদ্ধতিতে নিবিড় (Intensive) চিংড়ী চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতি বর্গমিটার চিংড়ী খামারে ১০টি চিংড়ী রেণু থাকে এবং উৎপাদন ১৬০০-২০০০ কেজি/হেক্টর। পক্ষান্তরে চলমান দেশীয় পদ্ধতিতে প্রতি মিটারে ১ থেকে ২ টি রেণু থাকে এবং উৎপাদন ৪০০-৫০০ কেজি/হেক্টর। SSOQ পদ্ধতিতে ক্লোরিন প্রয়োগ করে খামারের পানি জীবাণু মুক্ত করা হয়। ফলে যেসব পরজীবী ভাইরাস বহন করে সেগুলি মারা যায়। ইতোমধ্যে বাগেরহাট অঞ্চলে কিছু কিছু চিংড়ী খামার ও মাছ প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় SSOQ চালু হয়েছে এবং ভাল ফলাফল পাওয়া গেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে চাহিদার তুলনায় কম পরিমাণ চিংড়ী রেণু হ্যাচারীতে উৎপাদন হয়। তাই প্রাকৃতিক উৎস হিসেবে সমুদ্র ও নদীতে জন্মানো চিংড়ী রেণু সংগ্রহ করে খামার মালিকগণ চিংড়ী চাষ করে। সমুদ্র বা নদী হতে আহরিত রেণুতে মাত্র ৩% চিংড়ী রেণু বাকী ৯৭% অন্যান্য মাছের রেণু থাকে। অন্যান্য মাছের রেণুর কোন বাজার মূল্য না থাকায় রেণু আহারণকারীগণ নির্বিচারে যত্রতত্র অন্যান্য মাছের রেণু ফেলে রাখে। ফলে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ রেণু অবস্থায় প্রতি বছর নষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- ব্যক্তি মালিকানায়/বেসরকারিভাবে হ্যাচারী স্থাপন করা;
- প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ী রেণু আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা;
- গবেষণামূলক উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া;
- চিংড়ী চাষীদের প্রশিক্ষণ দেয়া; এবং
- মৎস্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ করে রেণু আহরণকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া।

উপকূলীয় চিংড়ী সম্পদ আমাদের জাতীয় আয়ের গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ (সারণী-৬)। কিন্তু চিংড়ী চাষের ফলে দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশ বিপর্যয়ের পাশাপাশি ফসল উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে গেছে। বর্তমানে চিংড়ী চাষের ৮০ ভাগ জমিতে ভাল ফসল হয় না। ফলে সাধারণ কৃষকের চরম খাদ্য ও অর্থ সংকটের মধ্য দিয়ে কাটে। সুতরাং স্থানীয় পরিকল্পনা ও জাতীয় পরিকল্পনায় সমন্বয়ে বর্তমান অবস্থার উন্নয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। একই সাথে জাতীয় চিংড়ী চাষ নীতিমালা প্রণয়ন করা খুবই জরুরী।

সারণী-৬ ঃ জাতীয় রপ্তানীতে চিংড়ীর অবদান

সাল	রপ্তানীকৃত অন্যান্য মাছের মধ্যে চিংড়ীর শতকরা হার	জাতীয় রপ্তানীতে চিংড়ীর শতকরা হার
১৯৯৯-২০০	৯০%	৬.০%
২০০০-২০০১	৯৩%	৫.০%
২০০১-২০০২	৮৮%	৪.৫%
২০০২-২০০৩ নভেম্বর পর্যন্ত	৯১%	৬%

সুত্র ঃ সাপ্তাহিক রোববার, ১৯ জানুয়ারী ২০০৩ এবং ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ২০০৩, প্রথম আলো, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩।

৮.৩ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ঃ সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৭ সালের গৃহীত প্রকল্প নতুন করে ঢেলে সাজানো হয়েছে। প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তাবায়িত হলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। সুন্দরন সংলগ্ন দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় ৫,৭,২০ ও ২১ নং ব্লকে তেল গ্যাস উত্তোলনের কর্মসূচিও ইতোমধ্যে স্থগিত করা হয়েছে। শেল তেল কোম্পানি সুন্দরবনে তেল গ্যাস অনুসন্ধান না করার ঘোষণা দেয়ায় এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য যেমন আছে তেমনই থাকবে। চিংড়ী রেণু সংগ্রহকারীদেরও নিবৃত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সবকিছু সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে Sound wild life management system কার্যকর (Sustainable) ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বৃক্ষ সম্পদ, বন্যপ্রাণী, পাখি ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদসহ উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য টিকে থাকবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে।

৮.৪ বৃক্ষ সম্পদ সংরক্ষণ ঃ উপকূলীয় সবুজ বনায়ন প্রকল্প ১৯৯৪ সালে বাণিজ্যিক ও পরিবেশ দু'দিকে লক্ষ্য রেখে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় নতুন বন সৃষ্টি হয়েছে। বনায়নের তুলনায় কাঠ চুরি বেশী হয়, তাই বনায়নের পাশাপাশি সুন্দরবন হতে কাঠ চুরি বন্ধ করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক কারণে বন ধ্বংস হলে সাথে সাথে বনায়ন কর্মসূচি হাতে নেয়া প্রয়োজন। সুন্দরবনের সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভিন্ন একটা সংস্থা গটন করা

যেতে পারে। সংস্থাটি সুন্দরবনে প্রশাসন, নিরাপত্তা, পর্যটনসহ সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। এটি বাস্তবায়িত হলে সুন্দরবনের ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত হবে। চোরাচালান রোধের জন্য ১৯২৭ সালের বন আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। সুন্দরবনে অন্যান্য বৃক্ষের সাথে মূল্যবান অনেক ঔষধি গাছ (Medicinal plant) আছে। সুন্দরবনে প্রতি হেক্টরে প্রায় ১৫ ডলার মূল্যের ঔষধি গাছ পাওয়া যায় (Bhattacharia 1999) । টিম্বার, জ্বালানী কাঠ ও ঔষধি গাছ সংরক্ষণের জন্য নতুন প্রকল্প হাতে নেয়া প্রয়োজন।

৮.৫ উপকূলীয় এলাকায় ইকো-টুরিজম ঃ ইকো-টুরিজম হলো পরিবেশ বান্ধব ভ্রমণ, যাতে পরিবেশে বিদ্যমান উপাদানগুলি যেভাবে আছে সেভাবে থাকে। এ ধারণাকে কাজে লাগাতে পারলে জীববৈচিত্র্যের উপাদানগুলি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। এজন্যে করণীয়-

- ইকো-টুরিজমের এলাকা নির্ধারণ করে তার উন্নয়ন করা;
- ইকো-টুরিজম এর মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের এলাকাগুলি উন্নয়ন করা;
- ভ্রমণকারীদের বনাঞ্চলের নিয়মনীতি (Code of conduct) প্রবর্তন করা;
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন করা; এবং
- পর্যটন প্রসারের লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন ও গণমাধ্যমে প্রচার করা।

২০০০ সালে বিশ্বে প্রায় ৭০ কোটি পর্যটক ভ্রমণ করেছে। WTO-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ২০২০ সালে পর্যটকের সংখ্যা হবে ১২০ কোটি। ইকোটুরিজম জনপ্রিয় হওয়ায় এশিয়া ও আফ্রিকায় প্রাকৃতিকভাবে গড়ে উঠা দর্শনীয় স্থানসমূহ পর্যটকদের বেশী আকৃষ্ট করবে। বাংলাদেশের উপকূলীয় সুন্দরবনসহ অন্যান্য দর্শনীয় স্থানসমূহের উন্নয়ন ও যোগাযোগ আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান হতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও বেকার সমস্যা সমাধানের একটা উল্লেখযোগ্য খাত হতে পারে পর্যটন শিল্প। এক্ষেত্রে দক্ষিণ উপকূলীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ, সুন্দরবন, সমুদ্র সৈকত বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

৮.৬ মোংলা বন্দর উন্নয়ন ঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে বিরোধ দূর করা প্রয়োজন। কারণে অকারণে ধর্মঘট মোংলা বন্দরে বাণিজ্যিক পরিবেশ নষ্ট করে দিয়েছে। তাই জাহাজের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কমে গেছে। বন্দর আধুনিকীকরণ, ড্রেজিং ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জাহাজে মালামাল উঠানামার ক্ষেত্রে আরও গতি আনা প্রয়োজন। মোংলা বন্দরের সাথে মাওয়া হয়ে ঢাকার সংযোগ হলে ঢাকা-মোংলা দূরত্ব অনেক কমে যাবে। উল্লেখ্য মোংলা-খুলনা-আরিচা হয়ে ঢাকার দূরত্ব ৩৫৩ কিঃ মিঃ এবং মোংলা-মাওয়া হয়ে ঢাকার দূরত্ব মাত্র

২১০ কিঃ মিটার। মাওয়ায় প্রস্তাবিত পদ্মা সেতু বাস্তবায়িত হলে মোংলা-ঢাকা-চট্টগ্রাম পণ্য পরিবহণে দূরত্ব অনেক কমে যাবে। ফলে আমদানী-রপ্তানী গতিশীল হবে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজের কাছে পদ্মা সেতু ইতোমধ্যে চালু হয়েছে নির্মাণাধীন রূপসা সেতুর কাজ শেষ হলে সমগ্র উত্তরবঙ্গসহ নেপাল পর্যন্ত সড়ক পথে পণ্য পরিবহনে অনেক সুবিধা হবে। মোংলার সন্নিকটে অবস্থিত খানজাহান আলী বিমান বন্দর চালু হলে বন্দরের কাজকর্মের গতি বৃদ্ধি পাবে। দেশে উৎপাদিত চিংড়ী, পাট, গার্মেন্টস, চামড়া সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানী করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে চাল, গম, ভোজ্যতেলসহ অন্যান্য পণ্য মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানী করা যাবে ফলে মোংলা বন্দরের কর্মব্যস্ততা বাড়াবে। যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মাধ্যমে মোংলা বন্দর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

৮.৭ উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের জন্য উপকূলীয় এলাকার পরিবেশ উন্নয়ন অপরিহার্য। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের নিরাপত্তা বিধান, উপকূলীয় পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং মোংলা বন্দর সচল রাখার জন্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায় হতে উদ্যোগ নিতে হবে। উপকূলীয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্থানীয় সম্পদের টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব। উপকূলীয় এলাকার চিংড়ী সম্পদ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশকে সমৃদ্ধশালী করেছে। কিন্তু চিংড়ী চাষের ফলে এলাকার পরিবেশ বিপর্যয়, ফসলহানী এবং পশু সম্পদ হ্রাস পেয়েছে। ফলে নিম্ন ও মধ্যবিত্ত কৃষকের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। কৃষকের জমিতে এখন আর আগের মতো ধান চাষ হয় না, আঙিনাতে সবজি জন্মায় না, চারিদিকে শুধু অথৈ পানি। খাদ্যের অভাবে ও লবণাক্ততায় গরু, মহিষের সংখ্যা কমে গেছে। কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নে নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। চিংড়ী চাষের জমির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ (Compensation) প্রদানের ব্যবস্থা প্রশাসনিকভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কৃষকের ভাগ্য উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং আধুনিক পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষের জন্য স্থানীয় পরিকল্পনা নেয়া যেতে পারে। সর্বোপরি চিংড়ী চাষের নীতিমালা প্রণয়ন করে এ অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা অতীব জরুরী।

উপসংহার ঃ

পরিবেশ ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন একই সূত্রে গাঁথা। জাতিসংঘ ঘোষিত Millennium Development Goals এর আলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে অনেকগুলি ক্ষেত্রের সাথে টেকসই (Sustainable) পরিবেশ নিশ্চিতকরণের কথা বলা হয়েছে। জাতিসংঘের প্রদত্ত লক্ষ্যের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে দক্ষিণ উপকূলীয় প্রাকৃতিক

সম্পদ রক্ষার জন্য পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বিশ্বের সর্ববৃহৎ Mangrove forest, জীববৈচিত্র্য ও মৎস্য সম্পদের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে। তবে, এজন্যে প্রয়োজন জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা ও তার সঠিক বাস্তবায়ন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মোংলা সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ। বন্দর অব্যবস্থাপনা, শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা সম্ভব হলে বন্দর আরও গতিশীল হবে। Eco-tourism এর জন্য সুন্দরবনের কিছু স্থান সনাক্ত করে ভ্রমণকারীদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং অবস্থানের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা গেলে এ খাত থেকে প্রচুর বৈদেশিক অর্থ আসতে পারে। সুন্দরবনের বনজ সম্পদ, প্রাণিজ সম্পদ রক্ষা, বনদস্যু ও জলদস্যুদের কবল থেকে জেলে, মৌয়াল ও বাওয়ালিদের নিরাপত্তার জন্য কোস্টগার্ড ও নিরাপত্তা বাহিনীকে দক্ষ ও আধুনিক করা প্রয়োজন। সুন্দরবনে সৎ ও দক্ষ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারি নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। নৌ-আদালত, বন-আদালত, শ্রম-আদালত ও পরিবেশ-আদালতের একটা করে শাখা মোংলা বন্দরে স্থানান্তরিত করা অত্যাবশ্যক। এর ফলে সমুদ্র হতে অবৈধ মৎস্য সম্পদ আহরণ বন্ধ করা সম্ভব হবে এবং সুন্দরবনের বনজ সম্পদ চুরি ও অপচয় রোধ করা যাবে। মোংলা বন্দরে অবৈধ শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ করে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা গেলে বন্দর আরও শাক্তিশালী হবে। বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হতে পারে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক নবদিগন্ত। তাই এ মুহূর্তে প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। এ পরিকল্পনায় জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পরিকল্পনার সমন্বয় ঘটাতে হবে। একই সাথে স্থানীয় সম্পদ, সংস্কৃতি, মানুষের চহিদা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ সবকিছু বিবেচনায় রেখে টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে আরও সমৃদ্ধিশালী হতে পারে।

সহায়ক তথ্যসূত্র ঃ

১। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অণুবিভাগ, অর্থমন্ত্রণালয়, পৃঃ ৬, ৫৫ ও ৬২।

২। মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ ২০০৩, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাত ও উন্নয়ন সম্ভাবনা, দৈনিক দিনকাল, ১২ আগস্ট ২০০৩।

৩। হারাধন বণিক ১৯৯৯, বাংলাদেশের সুন্দরবন, পৃষ্ঠা ৩৩, ৮০, ১৪১।

৪। মাহবুব হাসান ১৯৮৫, বাংলাদেশের প্রকৃতি ও সম্পদ, বাংলা একাডেমী, পৃঃ ৪৬।

৫। সড়ক বিভাগ ঃ মহাসড়কে স্থাপিত পিলার অনুযায়ী।

৬। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৩।

৭। সচিত্র বাংলাদেশ, জুন ২০০৩ ঃ সুন্দরবন আমাদের জাতীয় সম্পদ।

৮। প্রথম আলো, ৮ ডিসেম্বর ২০০৩।

৯। দৈনিক সংগ্রাম, ১২ ফেব্রুয়ারী ২০০০ এবং ১৭ জুন ২০০৩ ঃ বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা।

১০। দৈনিক দিনকাল, ১২ আগষ্ট ২০০৩।

১১। সাপ্তাহিক রোববার, ১৯ জানুয়ারী ২০০৩।

১২। ইত্তেফাক, ১৫ অক্টোবর ২০০৩।

১৩। Arnon 1988 : Assessment of cyclone damage in the Sunderbans during cyclone of 1988.

১৪। Bhattacharia D, M. Rahman and F. A. Khatun 1999. Environmental Consequences of Structural Adjustment : Towards Sustainable Shrimp Culture in Bangladesh, pp. 1-33.

১৫। Bayes, A. & A. Muhammad (ed) Bangladesh at 25, An Analytical discourse on Development, p. 325-335.

১৬। BPC 2002 : Visit Bangladesh Sundarbans, Bangladesh Parjatan Corporation.

১৭। The Bangladesh Observer, 25 June 2002 and 15 December 2002 : Potential and Constraints of Marine Fisheries in Bangladesh by Dr. M. H. Kabir.

১৮। The Express : 12 September 2003.

১৯। DOF, 1998 : Department of Fisheries.

২০। Gain, P. 2002, the last Forests of Bangladesh p. 19 & 33.

২১। Hussain, Z. & G. Acharya (edt) 1994, Mangroves of the Sunderbans Vol-IOI : Bangladesh, p. 178, 217.

২২। Perspectives on forestry resources management, Asian Productivity organization, 1997.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০

ISSN-1605-7023

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ নীতি ও নৈতিকতা : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ড. এ এইচ এম মোস্তাইন বিল্লাহ*

Abstract : The evergreen Bangladesh is very rich in biodiversity since long. This resource has paramount importance for all living being including human in order to extend the facilities for habitat and their subsistence. To conserve and maintain this resource sustainably Bangladesh has taken a good number of initiatives both locally and nationally. Since the stock of other natural resources of the country is very limited the stress on biodiversity of rapid population growth is still remain unabated. Against this backdrop, the article gives an accounts of the stock of biodiversity for the different regions of the country. The socio-economic implications for the conservation of biodiversity and potential challenges ahead are also emphasised.

In conservation and sustainable management of biodiversity Bangladesh made huge investment, in reality, the economic analysis may demonstrate that investment cost outweighs the social benefits in term of poverty reduction, social awareness raising and people attitudes towards biodiversity conservation. Moreover, the gap between extraction rate and regeneration rate of biodiversity is widening over time forcing the nation to a critical condition that needs urgent attention. In the current efforts of resource management including biodiversity, people's participation is duly emphasized. Despite those, social benefits derived are not at the desired level. This is because of the erosion of morale of the people that needs to elevated. In order to boost up these morals the religious values of the respective community people including Islam to be upheld. This sort of efforts would enable us not only conservation of biodiversity but also enhancing the social relationships amongst the different religious community. Such initiatives no doubt will yield much higher social benefits than the investment cost. Besides, the attitudes of people towards biodiversity conservation, this includes humanity, participatory natural resource management and social cohesions.

বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ইতিহাস অতি প্রাচীন। ঔপনিবেশিক শাসনামলে Elephant Preservation Act 1879, Wildbirds and Animal Protection Act 1912 প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্বাধীনতাত্তোর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে ১৯৭৩ সালে

---

* পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

বাংলাদেশের Wildlife Preservation Act (1973) প্রবর্তনের সময় পূর্বের আইনগুলো বাতিল করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। ধরিত্রী সম্মেলনে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ Convention of Biodiversity (CBD) স্বাক্ষর করে। সে সময় থেকে বিভিন্ন জাতীয় এবং খাতভিত্তিক নীতি নির্ধারণে জীববৈচিত্র্যের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ RAMSAR Convention 1971 (Convention on Wetlands of International importance and waterfowl Habitat, the convention concerning the protection of World caltural heritage (1972) and the Convention of International Trade and Endangered Species (CITES) স্বাক্ষর করেছে।

উপর্যুক্ত চুক্তিগুলোর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপর অনেক দায়িত্ব কর্তব্য বর্তায়। এসব লক্ষ্যার্জনে ১৯৯৫ National Environmental Management Action Plan (NEMAP) দলিল 1975 সালে National Conservation Strategy (NCS) দলিল, ১৯৯৩ সালে Forestry Master Plan, ADB operational strategy প্রণয়ন করা হয়েছে। হালে বাংলাদেশে IUCN এর সহায়তায় Biodiversity Conservation Strategy Action Plan প্রণয়নও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য কনভেনশান (১৯৯২) অনুসারে জীববৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন উৎসের জৈব অর্গানিজমকে বুঝায়। এ ক্ষেত্রে ভূচর (Terrestrial) উপকূলীয় (Marine) ও অন্যান্য জল্‌জ উদ্ভিদ এবং এ সংক্রান্ত জটিল প্রতিবেশকে বুঝায়। অর্থাৎ বিচিত্র প্রজাতির জৈব অর্গানিজম, জেনেটিক বৈচিত্র্য ও ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু সংস্থানকে বুঝানো হয় (UNEP 1995)। জীববৈচিত্র্য খাদ্যচক্রের প্রধান উৎস, বিশেষত মানব জাতির। এ সম্পদ হ্রাস পাওয়ায় সারা বিশ্ব আজ উদ্বিগ্ন। জীববৈচিত্র্যের এ বিরাট ভাণ্ডার মূলত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চলে, যার আসল ঠিকানাও তৃতীয় বিশ্বই। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে এবং মানব কর্মকাণ্ডের ফলে জীববৈচিত্র্যের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে। যার ফলে এ সম্পদ ভাণ্ডারের জেনেটিক পুল দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে, যা ধরিত্রীকে ক্রমান্নয়ে ঝুকিপূর্ণ করেও তুলেছে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে বন নিধনের ফলে বিশ্বে প্রতিদিন ২০ থেকে ৭৫টি প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে (মিলার, ১৯৯৩)। প্রতিবৎসর ১৭ মিলিয়ন হেক্টর ট্রপিক্যাল বন উজার হয়ে যাচ্ছে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ৩০ বৎসরে ৫% কে ১০% ট্রপিক্যাল বন উজার হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য আশির দশকের শুরু থেকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টার ধারা বাংলাদেশেও অব্যাহত রয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বদ্বীপ বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে আজ মারাত্মকভাবে বিপন্ন হতে যাচ্ছে এ অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশে প্রায় ৫,০০০ প্রজাতির পুষ্পক উদ্ভিদ, ৫০০ প্রজাতির মাছ, ৮৪০ প্রজাতির বন্যপ্রাণী রয়েছে, তার মধ্যে ১৯ প্রাজতির উভচর প্রজাতির সরীসৃপ, ৫৭৮ প্রজাতির পাখি, ১১৯ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং ২০০ প্রজাতির অভিবাসনকারী পাখি রয়েছে (NCS-Project Report 1999, Bangladesh state of Biodiversity, 2001, p-36)। তাই এ দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের তাৎপর্য অপরিসীম। প্রথমত যদি খাদ্যচক্র (food chain) এর বিষয়ে আলোচনা করা যায় দেখা যাবে মানব জীবনের অস্তিত্বের অন্যতম উপাদন খাদ্য তার প্রধান উৎস এ জীববৈচিত্র্য। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও দেশের বর্তমান জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠীরও খাদ্য সরবরাহ যেখানে সম্ভব ছিল না সেখানে হালে বাংলাদেশ প্রায় খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ (শস্য) তার প্রধান কারণ উন্নতমানের ধান চাষ, মৎস্য ও পশু সম্পদের চাষ ও এসবের উৎপাদন সম্প্রসারণ। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে উঠা জীববৈচিত্র্য যার মধ্যে অনেক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ছোঁয়া রয়েছে তা সংরক্ষণ করাও অত্যাবশ্যক। অন্যথায়, পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ও জলবায়ুর মোকাবেলায় এ ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, চিকিৎসা ও বাসোপযোগী পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে। তাই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আজ সারা পৃথিবী সোচ্চার। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মত জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম ঝুকিপূর্ণ এবং বিশাল জনগোষ্ঠীর দেশকে পিছিয়ে থাকার কোন সুযোগ নেই। উক্ত প্রবন্ধে জীববৈচিত্র্য সম্পদ সম্ভার ও এর সম্ভাবনা, আর্থিক ও সামাজিক তাৎপর্য এর সংরক্ষণের প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সব সমস্যা মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যাগগুলো ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রকৃতি বিশেষত আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি তাদের দীর্ঘদিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের এবং ধর্মীয় অনুভূতিকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজে লাগানো যেতে পারে।

এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা জীববৈচিত্র্য সম্পদ-সম্ভারের গতি প্রকৃতির বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব, চতুর্থ অনুচ্ছেদে এ সরকারি উদ্যোগগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে সামাজিক মূল্যবোধ ও

নৈতিকতার প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিশেষে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সময়োপযোগী কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২.০ বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য প্রতিবেশগত কারণে বিভিন্ন এলাকায় এদের অবস্থা ও প্রকৃতি ভিন্ন। তৎপ্রেক্ষিতে, নিম্নে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ এলাকাগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে বাংলাদেশের বৃহত্তর এবং সমৃদ্ধতম এক বিরাট এলাকার বনভূমি রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি এলাকার মোট ৭০৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বনাচ্ছাদিত ভূমি রয়েছে। এই পার্বত্য বনরাজির তলদেশ জুড়ে আছে বিস্তীর্ণ বাঁশবন। এছাড়া এ অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির শ্যাওলা, অর্কিড ও অন্যান্য পরাশ্রয়ী উদ্ভিদ রয়েছে্ এ বনাঞ্চলে ৬১ প্রজাতির স্ত ন্যপায়ী জীব, বিভিন্ন ধরনের পাখি, সরীসৃপ এবং জলচর পাখি রয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার দুস্প্রাপ্য প্রজাতির প্রাণী রয়েছে যেমন, এশীয় হাতি, বাঘ, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, অজগর, বুনো শুকর এবং সাদা অন্যান্য বন ঘুঘু ও দেখা যায়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চলের মধ্যে ১৫৩৮.৭৯ বর্গকিলোমিটার রিজার্ভ ফরেষ্ট, বাকী ৫৪৫২.৫০ বর্গকিলোমিটার অশ্রেণীভুক্ত। রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে বেশীরভাগ বৃক্ষরাজি উজাড় হয়ে শুধুমাত্র ঝোপঝাড় এবং নতুন বনায়নের আওতাধীন কিছু বন রয়েছে। এত ব্যাপক হারে বন ধ্বংসের ফলে উদ্ভিদ প্রজাতির মতই দুর্লভ প্রজাতির প্রাণীরও ব্যাপক হারে বিলুপ্তি ঘটছে। (NCS-Project Report 1999, Bangladesh state of Biodiversity, 2001) ।

সুন্দরবনের বনাঞ্চল

বাংলাদেশের প্রধান বনাঞ্চল হল সুন্দরবন। প্রথিবীর বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ বনভূমির মোট আয়তন ১০,০০০ হেক্টর স্থল ও জলাভূমি। এই বনাঞ্চলে ৩৩০ প্রজাতিরও বেশী সংখ্যক উদ্ভিদ রয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদ্ভিদ হচ্ছে সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতা ইত্যাদি। এই বনাঞ্চলের বিভিন্ন প্রজাতির জীববৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে ১২০ প্রজাতির বিভিন্ন মাছ, ৬০ প্রজাতির ছোট বড় চিংড়ি, ২৭০ টিরও বেশী প্রজাতির পাখি এবং ৪২টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রল হরিণ, রীসাস বানর ইত্যাদি। ৫০টি সরীসৃপ জাতীয় প্রজাতি দেখা যায়, যেমন বড় কুমীর, অজগর এবং ৮ প্রজাতির উভচর প্রাণী

রয়েছে। সুন্দর বনের এ বিশাল সম্পদ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে দ্রত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে চকোরিয়া সুন্দরবন নামে অন্য একটি ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চিংড়ি চাষের ফলে আজ তা ক্রমাগত বিলুপ্তির পথে। (রণজিৎকুমার ১৯৯৯)।

ঢাকা-মধুপুর বনাঞ্চল

৯৫২ বর্গ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ এ বনাঞ্চল। এ অঞ্চলের প্রধান প্রজাতির বৃক্ষ হচ্ছে শাল এখানে ১৪০ প্রজাতির পাখি এবং ২১ প্রজাতির স্তন্যপায়ী জীব রয়েছে। পূর্বে এ বনে এক-শৃঙ্গ গণ্ডার, বাঘ, চিতাবাঘ এবং হাতিও পাওয়া যেত। বর্তমানে এসব প্রজাতি এ অঞ্চল থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সোহরাওয়ার্দি এবং রমনা পার্ক ঢাকা শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে বিশাল এলাকা নিয়ে বিস্তৃত। দেশী বিদেশী ৭১টি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এর মধ্যে ৩০ মিটার প্রশস্ত এবং ৮০০ মিটার দৈর্ঘ্য একটি লেকও রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। সোহরাওয়ার্দি পার্ক ৮৩ একর বিস্তৃত জায়গা জুড়ে। এখনেও ৭১টি প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। ৩৫টি গোত্রের ৯৬টি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি প্রজাতির প্রাণী শীতকালে আগমন করে। ২৩টি প্রজাতির পাখি এখানে ডিম এবং বাচ্চা দেয়।

বাংলাদেশ জলাভূমির দেশ। রামসার কনভেনশানের সংজ্ঞা অনুসারে বাংলাদেশের দুই-তৃতীয়াংশই ওয়েটল্যান্ড বা জলাভূমি। দেশের ৬.৭% অংশ সারা বৎসর জল নিমজ্জিত। এর বিরাট অংশ মারাত্মকভাবে বন্যাকবলিত থাকে এবং প্রায় ৩৫% এলাকা হালকাভাবে বন্যায় প্লাবিত হয় (এফ,এ,ও ১৯৮৮) (বাংলাদেশ পরিবেশ চিত্র ১৪০৬/২০০১ পৃ-৩) বাংলাদেশের জলাভূমিসমূহ নিম্নোক্তভাবে বিভাজন করা যেতে পারে, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এলাকায় ৫৭৭, ১০০ হেক্টর এলাকা প্রাকৃতিক লেক (রেইন থাইয়োন কাইন, বোগা কাইন এবং আনুলিয়া) কৃত্রিম জলধারা (কাপ্তাইলেক) পরিষ্কার পানির জলাভূমি (৪০০) হাওর, ৫৪৮৮ হেক্টর বাঁওর ১,০০০টি বিল এবং ১১৫,০০০ হেক্টর ছোট পুকুর ও মাছের পুকুর। ৯০,০০০-১,১৫,০০০ হেক্টর চিংড়ি চাষের জলাশয়। এই বিশাল জলাভূমির প্রাণী সম্পদ অসংখ্য। এসব জলাশয় ছোট বড় চিংড়ি ছাড়া ঘড়িয়ালসহ নানা প্রজাতির সরীসৃপ ২৫ প্রজাতির কাছিম, কাইট্টা গঙ্গাশালুক এবং ১৫০ প্রজাতির জলচর পাখি যার মধ্যে প্রায় ৭০ প্রজাতির জলচর প্রাণী একেবারে দুষ্প্রাপ্য।

দেশের সবচেয়ে বড় জলাভূমি বলতে এখনো সিলেট-ময়মনসিংহের হাওর এলাকাকেই বুঝায় যা প্রকৃতপক্ষে মেঘনা নদীর বিস্তীর্ণ বর্ষা প্লাবিত ভূমি এবং বর্ষায় এ এলাকার বিল অঞ্চলে পানিতে ডুবে গিয়ে এক বিশাল জলাভূমিতে পরিণত হয়। এ সব নদী নালায়, হাওর, বাঁওর এবং বিল এলাকায় প্রচুর পরিমাণে সুস্বাদু মাছ পাওয়া

যায় এবং ৩৫ প্রজাতির কাছিম ও কাইট্টা দেখা যায়। উপসাগরীয় এলাকায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৬৫ প্রজাতির মাছ সাধারণত ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ধরা হয়ে থাকে। (বাংলাদেশ পরিবেশ চিত্র-২০০১)

উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব

এক সময় বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ প্রজাতির ধান চাষ করা হত। বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল প্রজাতির ধান চাষ ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়াতে অন্যসব প্রজাতির অধিকাংশই প্রায় বিলুপ্তির পথে। ফলে দেশে ঐতিহ্যবাহী বিচিত্র প্রজাতির দৌশয় গম ও ধানের চাষ আজ হারিয়ে যেতে বসেছে। সর্বোপরি উদ্ভিদের গুণাবলী সম্বন্ধে উন্নয়নশীল দেশে সচেতনতার অভাব রয়েছে। শীতকালে লাউ এর তরকারী এ দেশে বেশ জনপ্রিয়। লাউ এর কোন অংশই ফেলনা নয়। লাউগাছের লতা ও ডাটা দিয়ে সুস্বাদু শাক রান্না করা যায়, যা বেশ পুষ্টিকর। এছাড়াও আলো বিভিন্ন পদ্ধতিতে লাউ এর তরকারী এবং বিভিন্ন প্রকার খাবার তৈরী করা হয়ে থাকে। লাউ এর গুণাবলী নিয়ে আমাদের দেশে তেমন বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনো হয়নি। পুষ্টি বিজ্ঞানীদের মতে ১০০ গ্রাম লাউ এর পুষ্টি উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তাতে প্রোটিন রয়েছে ০.২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ২.৫ গ্রাম, ফ্যাট ০.১ গ্রাম, খনিজ পর্দা ০.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ২০ মিঃ গ্রাম, ফসফরাস ১০ মিঃ গ্রাম, লোহা ০.৭ গ্রাম, ভিটামিন বি-১, .০৩ মিলি গ্রাম, ভিটামিন-২০.০১ মিঃ গ্রাম, সিয়াসিন ০.০২ মিলিগ্রাম। অনুরূপভাবে ১০০ গ্রাম কমলালেবুর পুষ্টি উৎপাদনের পরিমাণ রয়েছে–ভিটামিন-সি ৫০ গ্রাম, প্রোটিন ০.৯৩ গ্রাম, ফ্যাট ০.২ গ্রাম, কার্বোহাইড্রেট ১১.২ গ্রাম, এনার্জি ৪৫ কিলো ক্যালরী। তাছাড়া খনিজ পদার্থের ক্যালসিয়াম ৩৩ মিলিগ্রাম, আয়রন ০.৬ মিলিগ্রাম, ফসফরাস ২৩ মিলিগ্রাম, পটাসিয়াম ২৪০ মিঃ গ্রাম (ইত্তেফাক, ২৮ নভেম্বর, ২০০০)।

পরিবেশ সংকটাপন্ন ঘোষিত এলাকায় জীববৈচিত্র্যের অবস্থা

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে, উপকূলীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্যের আবাস স্থল হিসেবে মোট ১৬,০০০ হেঃ এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। অতিরিক্ত ২০,০০০ হেক্টর এলাকার পরিবেশ অবক্ষয় (degraded) হচ্ছে তবে জীববৈচিত্র্য-সমৃদ্ধ পাহাড়ী বনাঞ্চলকে বাফার জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্যে (BIOD) সমৃদ্ধ এলাকাগুলোর গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হল।

(ক) টেকনাফ উপদ্বীপ-টেকনাফ ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত (প্রায় ১১,৬১৫ হেক্টর ব্যাপী)। এ সৈকত অবস্থার প্রাপ্তিকালীন (Transitional) সৈকত ইন্দো-হিমালয়ান এবং ইন্দো-মালেয়ান প্রতিবেশ উপ-অঞ্চলের বিচিত্র প্রাণী (Fauna) এর

অবস্থান প্রাপ্তিকালীন আবাসস্থল (Transitional ground) হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ এলাকাটি আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সম্পন্ন চারটি প্রজাতির সূতিকাগার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেগুলো হচ্ছে উপকূলীয় কচ্ছপ (Turtles), আন্তর্জাতিক পাখিদের উড়ে খাবার স্থান, পাখির চারণভূমি এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বিলুপ্ত প্রায় স্তন্যপায়ী জীবদের (Threatened marine mamals) আবাসস্থল।

টেকনাফ গ্যাস রিজার্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯৮৩ সালে। এ এলাকায় ৮৭ প্রজাতির প্রাণী, ৪২ প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৪০ প্রজাতির সরীসৃপ, ৪ প্রজাতির উভচর এবং ৩৭ প্রজাতির পাখি দেখা যায়। এছাড়া ১১২ প্রজাতির উদ্ভিদ প্রজাতিও রয়েছে (BCAS ১৯৯৭)।

(খ) সেন্ট মার্টিন্স-পৃথিবীর অন্যতম Coral algai community rockcy reefs-দের আবাসস্থল হিসেবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ (Tomasceik, 1998)। এ স্থানটি জৈব ও অজৈব সম্পদের অবস্থানের জন্য পরিবেশগত দিক দিয়ে বাংলাদেশে অদ্বিতীয়। এ দ্বীপটিও সামুদ্রিক কচ্ছপের (Turtles) এক সূতিকাগার এবং যাযাবর (Migratory) জলচর দীর্ঘপদ পাখি (wader) এর চারণভূমি।

(গ) সোনাদিয়া-এ এলাকাটি বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের শেষাংশ। এ ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলটি সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের চেয়ে ভিন্ন। কারণ এ জায়গায় বহু প্রজাতির পাখি এবং অত্যন্ত সমৃদ্ধ Mullusks, echinoderms এবং সামুদ্রিক কচ্ছপ রয়েছে।

উপর্যুক্ত এলাকাগুলোতে জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির নিম্নোক্ত কারণগুলো চিহ্নিত করা হয়েছেঃ

- জ্বালানী হিসাবে নির্বিচারে ম্যানগ্রোভ বন নিধন;
- সকল এলাকায় নির্বিচারে অবৈধভাবে সামুদ্রিক কচ্ছপ এবং এদের ডিম আহরণ;
- ধ্বংসাত্মক পদ্ধতিতে মাছ চাষ এবং মৎস্য সম্পদ আহরণ;
- সামুদ্রিক পাখিদের নির্বিচারে শিকার করা;
- অনিয়মিত ও অবৈধভাবে পশু চারণ হিসেবে ব্যবহারের ফলে ম্রানগ্রোভ দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

জীববৈচিত্র্যে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কৃষি সম্প্রসারণ, লবণ চাষ, শিল্প কারখানা স্থাপন এবং পর্যটনের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে জীববৈচিত্র্যের চারণভূমি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পর্যটন, শিল্প কারখানার বর্জ্য নির্গমন এবং কৃষি রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে ভূমিসহ দ্রুত অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দূষণ হয়ে যাচ্ছে মানুষের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে। বালুর পাহাড়গুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যেমন মৎস্য চাষীদের কর্তৃক

অস্থায়ী আবাসন, ট্রাফিক ও বোটডফিং-এ সব কর্মকাণ্ডের ফলে কচ্ছপদের আবাসস্থল ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

(ঘ) হাকালুকি হাওর-এ হাওরটিকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় ১৯৭৪ সালে। এ হাওরে ১০০ প্রজাতির বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতি (গাছ, ঘাস, বাঁশ, বনলতা ইত্যাদি) এবং ৬৫ প্রকার প্রাণী প্রজাতি রয়েছে (BCAS 1997)। এ হাওরটি প্রায় ২৯০৩ হেক্টর এলাকা ব্যাপী। বিচিত্র ওয়াটার ফাউলস এর জন্য এ হাওরটির গুরুত্ব অপরিসীম। এ হাওরটি যাযাবর উপকূলীয় পাখি এবং মৎস্য সম্পদের সূতিকাগার হিসেবে অত্যন্ত তাৎপর্য বহন করে। এ হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নিম্নোক্ত সমস্যাগুলো পরিলক্ষিত হচ্ছে। দ্রুত কৃষি সম্প্রসারণের ফলে মহাল (reed land) জলাভূমি বন (Swamp forest) বিলুপ্ত হয়ে হচ্ছে। ব্যাপক সেচের জন্য পানি নিষ্কাশন, এবং পলি পড়ে এ হাওরটি বিলীন হয়ে হচ্ছে। সে সাথে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাছের আবাসস্থল। কৃষি রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহারের ফলে মৎস্যের আবাসস্থলগুলোকে দূষিত করে তুলেছে।

হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তির কারণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

- এ সম্পদ সংরক্ষণে কোন আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নেই। কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও নেই।
- স্থানীয় জনগণের নীতি নির্ধারণে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগও সীমিত।
- প্রাকৃতিক সম্পদ সংক্রান্ত তথ্যের অভাব,
- সচেতনতার অভাব, বিকল্প জ্বালানী ও পশু খাদ্যের অভাব, কারিগরি দক্ষতা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার অভাব।

টাংগুয়ার হাওর- দেশের অন্যতম জলাভূমি হিসাবে টাংগুয়ার হাওরের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের মূল্য অত্যধিক। শীতের মৌসুমে এ হাওরে প্রায় ৬০ হাজারেরও বেশি যাযাবর পাখি এবং আবাসিক পাখি এসে থাকে। এ হাওরে রয়েছে ১৪০ প্রজাতির মাছ। ১৭টি বিপন্ন-প্রায় মাছের প্রজাতি রয়েছে। এ এলাকায় ৪৬টি গ্রামে ২৬,০০০ অধিবাসী; তাদের অধিকাংশই কৃষিকাজ এবং মাছ চাষের কাজে নিয়োজিত। টাংগুয়ার হাওরের বর্তমান সমস্যাগুলো হচ্ছে ঃ

- মাছ উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে
- অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, যেমন ছন সম্পদ।
- প্রতি বৎসর আগত যাযাবর পাখির সংখ্যা কমে যাচ্ছে।
- জলাভূমি বন (swamp forest) বিপন্ন হবার পথে।

(উৎস ঃ Management plan for Tanguar Haor, 1997)

জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তির কারণ

দেশের সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের অবস্থাও ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্যের দ্রুত বিলুপ্তির নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য।

(ক) বাংলাদেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনার অভাব;

(খ) জীববৈচিত্র্য এবং শস্য-উদ্ভিদের জেনেটিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং প্রশিক্ষণের অভাব।

(গ) বর্তমানের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সরকারি বন বিভাগ কয়েকটি নির্দিষ্ট বনাঞ্চলকে বন্য প্রাণীর জন্য অভয়ারণ্য ঘোষণা করেছে। কিন্তু বন্য প্রাণীদের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই।

(ঘ) বনভূমির অন্তর্গত জলাভূমির জলচর প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থাপনা এবং কার্যক্রম এখনো গ্রহণ করা হয়নি।

(ঙ) বনভূমি এলাকার জল ও স্থলভাগ ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকার উদ্ভিদ এবং প্রাণী সংরক্ষণের বিষয়ে এবং ব্যবস্থাপনার জন্য তেমন কোন নীতি বা কর্মসূচি বাংলাদেশে নেই।

(চ) দেশে বিশাল এলাকা জুড়ে জলাভূমি এবং জলাভূমির জৈব-সম্পদের ব্যবস্থাপনায় সরকারি নীতি এবং কর্মসূচির অভাব।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতা

জীববৈচিত্র্য (সম্পদ) আহরণের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে উপকার পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে সম্পদ আহরণের/ধ্বংসের পূর্ণ অর্থনৈতিক মূল্য, সামাজিক মূল বিবেচনা করা হয় না। এই ধরনের অবিবেচকভাবে সম্পদ আহরণের পলে ভবিষ্যতে বিবিধ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজকেই এর মূল্য দিতে হবে। সাধারণত যে জাতি জীববৈচিত্র্যে বেশি সমৃদ্ধ সে জাতি এ সম্পদ সংরক্ষণে তুলনামূলকভাবে তত কম সচেতন। কেননা তারা এ সম্পদ নির্বিচারে আহরণ করে ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণ করে এবং তাদের আয় বাড়ায়। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনার অভাবে যখন এ সব প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় করা হয় তখনই মূলত সমস্যা সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আরো কতিপয় বড় ধরনের অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে।

ক) বাজার মূল্যে কদাচিৎ জীববৈচিত্র্যের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে থাকে।

খ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সামাজিক সুবিধা অদৃশ্যমান হলে বাজার মূল্যে তা প্রতিফলিত হয় না। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে খরচ-সুবিধা Cost benefit সাধারণত বিবেচনায় আনা হয় না।

গ) দুর্বল মালিকানা পদ্ধতির ফলে প্রজাতি, বস্তু সংস্থান (Eco-system) এবং বস্তু সংস্থান-সেবা অত্যন্ত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ঘ) হালে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা যে, Discount rate নীতি অনুসরণ করা হয় তাতে জৈব সম্পদের সংরক্ষণ না করে ধ্বংসকেই উৎসাহিত করে।

ঙ) গতানুগতিক জাতীয় আয় (Traditional system of national accounts) পরিমাপ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক সম্পদের মূল্যকে সাধারণত ধরা হয় না। অথচ প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় নীট আয় থেকে বাদ দিলে জাতীয় আয়ের নতুন পরিমাপ পাওয়া যাবে। তৃতীয় বিশ্বের এ সব হিসেবের ফলাফল উৎসাহব্যঞ্জক নয়। সাম্প্রতিককালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ভারত এবং বাংলাদেশেও গ্রীন একাউন্টিং এর কাজ চলছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও বিভিন্ন সাংগঠনিক উদ্যোগ নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

জীববৈচিত্র্যের মূল্য নির্ধারণ

দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের নীতি র্নিধারকদের জীববৈচিত্র্যের মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য অর্থনৈতক বিষয়াদি বিবেচনায় আনা আবশ্যক। জৈব সম্পদের মূল্য নির্দ্ধারণের পদ্ধতি নিম্নোক্তভাবে হতে পারে।

(ক) প্রাকৃতিক সম্পদের উৎপাদনের মূল্য পরিমাপ করা যেমন, জ্বালানী কাঠ, গো-খাদ্য এবং মাংস যা সরাসরি ভোগ করা হয় প্রকৃত বাজার যাচাই ব্যতীত।

(খ) বাণিজ্যিকভাবে আহরণ করা হয় এমন সব উৎপাদিত জৈব পণ্যের মূল্য পরিমাপ করা যেমন টিম্বার, মৎস্য সম্পদ, আইরী এবং বনজ ঔষধি বৃক্ষলতা।

বস্তু সংস্থান (Eco-system) কার্যাবলীর পরোক্ষভাবে মূল্য পরিমাপ করা যেতে পারে, যেমন (Watershed Protection, photo synthesis) আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ এবং মৃত্তিকা উৎপাদন। বাস্তবে কতিপয় জৈব সম্পদ আহরণ করে বিপুল পরিমাণে রাজস্ব পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে এমন কতিপয় জৈব সম্পদ রয়েছে যা শুধু সেবা প্রদান করে যার দৃশ্যত কোন মূল্যমান করা যায় না। বস্তু সংস্থানের (Eco-system) অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে অথবা যে আবাসস্থলে অন্য

প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, সে সম্পদের বিনিময়ে (অর্জিত) আয়ের দ্বারা পুনর্নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। বনায়ন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মূল্য এবং মরুময়তার প্রতিক্রিয়া রহিতকরণের মূল্য অতি-আহরণকৃত অথবা অন্যান্যভাবে জৈব সম্পদ ব্যবহার করে অর্জিত অর্থনৈতিক মুনাফা থেকে অনেক বেশী। তাই প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের মূল্য, পরিবেশ মূল্য, সময়ের মূল্য এ সম্পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার মূল্যকে বিবেচনা করা উচিত। জৈব সম্পদ সংরক্ষণের মূল্য এবং এর খরচের পরিমাপ কোন সংরক্ষিত এলাকা সংরক্ষণের অথবা অন্য কোন প্রকারে জৈব সম্পদ সংরক্ষণের মোট মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

জৈব সম্পদ সংরক্ষণ যেহেতু অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণকেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা সমীচীন হবে। অতএব জৈব সম্পদ সংরক্ষণের অর্থনৈতিক মূল্য এবং বিনিময় ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করা সমীচীন এ জন্য যে, এ বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা প্রদান করবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে শুভ প্রভাব ফেল্‌বে।

৩.০ জীববৈচিত্র্য ও অর্থনীতি

এ ধরনীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ প্রাকৃতিক বন, ভূমি, পাহাড়/পর্বত জলাভূমি এবং সামুদ্রিক আবাসস্থল। ভূমণ্ডলে জীববৈচিত্র্যের আধার এসব স্থানেই। জীববৈচিত্র্য দু'ধরনের হতে পারে। জীব বিচিত্রা এবং উদ্ভিদ জীববৈচিত্র্য। দক্ষ এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির মাধ্যমে এ সম্পদ প্রয়োজনীয়ভাবে ব্যবহার করেও বৃদ্ধি করা যায় এবং সংরক্ষণ করা যেতে পারে। এ ধরনের নীতি অনুসরণ করলে টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে বন সম্পদ, জলাভূমি এবং সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের পরিবর্তে ব্যাপক হারে ধ্বংস করা হচ্ছে। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে শুধু বাজার মূল্য বিবেচনায় এ সব সম্পদ আহরণ করা হলে এ সম্পদ সংরক্ষণ করা একেবারেই সম্ভব হবে না। কারণ এ সব সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে বাজার মূল্য অর্থনৈতিক, মূল্য, সামাজিক মূল্য, পরিবেশগত মূল্য এবং সম্পদ ধ্বংসের অন্যান্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার বিষয়াদি বিবেচনা করা হয় না। এ অবস্থায় এ সব সম্পদ সংরক্ষণে বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারি হস্তক্ষেপ একান্ত আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক লাভের (Economic incentive) কথা তুলে ধরার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান (Economic Incentive to Promote Conservation)

প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের বিষয়টি বেশীর ভাগই মানুষের ব্যক্তি অথবা দলীয় স্বার্থ সংরক্ষণের স্বার্থে পরিচালিত হয়। এ জন্যে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে নতুন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রবর্তন করে ব্যক্তি এবং জনগোষ্ঠীর আচরণ বিধি ও মূল্যবোধে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। যেহেতু স্বীয় স্বার্থকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধা/প্রলোভন (Profit motive) বলে সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে, তাই এ সম্পদ সংরক্ষণে অর্থনৈতিক সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরে জনগণ এবং বিভিন্ন সংস্থাকে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে, তাহলেই এ প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।

প্রত্যক্ষ আর্থিক উৎসাহ (Direct Economic Incentive)

আর্থিক অথবা সেবা প্রদানের মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য অর্জন করা যেতে পারে। যেমন সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা যেতে পারে-এ ক্ষেত্রে ভূমি, মূলধন শ্রমকে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অত্যন্ত দক্ষ এবং সুনিপুণভাবে ব্যবহার করতে হবে। সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী জনগণের শ্রম ও সম্পদকে এমনি সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন তারা বাহ্যত দেখতে এবং বুঝতে পারে যে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের চেয়ে তাদের বর্তমান কর্মসংস্থান অনেক লাভজনক ও সুবিধা দানকারী। এ জন্যে সংরক্ষিত এলাকার পার্শ্ববর্তী জনগণের জন্যে আইন করে এবং উপযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বৈষম্য দূর করা যেতে পারে যেমন সমবায় গড়ে তোলা যেতে পারে। যারা নতুন কর্মসূচির নিয়ন্ত্রণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন লোকজনকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, পুনর্বাসন করতে হবে। এ ধরনের উৎসাহ তখনই অর্থবহ হবে, যখন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণ অনুপ্রাণিত হবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানসহ এ সব কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক খরচ অর্থনৈতিক সুবিধার চেয়ে কম হবে। এ ধরনের ব্যবস্থাপনাকে সফল করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় আনা যেতে পারে।

(ক) সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আইনগত আচরণবিধি প্রণয়ন,

(খ) এসব আচরণ বিধির প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ,

(গ) এসব কার্যকলাপ নিরীক্ষণ ও মল্যায়ন,

(ঘ) এসব কার্যকলাপ বাস্তবায়নে স্থানীয়, সামাজিক, ধর্মীয়,সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঙ) আচরণ কর্মসূচি আরোপ না করে উদ্বুদ্ধকরণে মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে অবশ্যই সামঞ্জস্য রাখতে হবে।

বিপদগামী অর্থনৈতিক উৎসাহ সমস্যা (Perverse Economic Incentive)

কতিপয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রলোভন এসব জৈব সম্পদ সংরক্ষণের পরিবর্তে এ সম্পদের অপচয় ও ধ্বংসকেই বেশী উৎসাহিত করে। যেমন অর্থনৈতিক সুবিধা পাবার জন্যে বনাঞ্চলে প্রবেশ শিথিল করে দেয়া এবং সরকারি সহযোগিতা বা অর্থে বনাঞ্চলে উন্নত রাস্তা নির্মাণ করা এর ফলে জৈব সম্পদ আহরণের সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং এ ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বাজার সৃষ্টি করে। দুর্গম বন এলাকায় দরিদ্র জনগণের বসতি স্থাপন করলে, ধীরে ধীরে বনাঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটে এবং রাস্তাঘাট সৃষ্টি হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে তাদেরকে এ সব জমির মালিকানা প্রদান করতে হয়। এর ফলে জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ সংরক্ষণের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া পড়ে। জৈব সম্পদের আহরণ এবং টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের এ সংক্রান্ত প্রচলিত বিধি বিধান এবং নীতিমালা, এ সম্পদের স্টক ও এর বৃদ্ধির অবস্থা পর্যালোচনা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণে অসঙ্গতিপূর্ণ নীতিমালা গ্রামীণ দরিদ্রদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে এ ধরনের কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক অদক্ষতা বাড়ায় এবং সম্পদ অপচয় করে। এরূপ বিধি ও নীতির অসঙ্গতিগুলো যথাসম্ভব দূর করতে হবে অথবা কমাতে হবে। এভাবে ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক প্রলোভন বিলোপ করে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য যুগোপযোগী অর্থনৈতিক প্রলোভন প্রবর্তন করে জৈব (প্রাকৃতিক) সম্পদ সংরক্ষণে জনগণকে সংগঠিত ও সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

৪.০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে সরকারি উদ্যোগ

প্রতিবেশগত মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন এলাকা (Ecologically critical areas for Biodiversity)

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের সংকট ও সংরক্ষণের কথা বিবেচনা করে এ সম্পদে সমৃদ্ধ আরো কয়েকটি এলাকাকে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে জীববৈচিত্র্য দ্রুত বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। "বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫" এর-৫ ধারা অনুযায়ী "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা" ঘোষণা করার বিধান রয়েছে। উক্ত আইনে উল্লেখ রয়েছে যে, (১) সরকার যদি এ মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে বা হবার আশংকা রয়েছে তা সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) ঘোষণা করতে পারে। (২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন কোন কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাবে না তা উপ-ধারা (১) এর অধীন জারীতব্য প্রজ্ঞাপন বা আলাদা প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার নির্দিষ্ট করে দিবে।

বর্তমানে জীববৈচিত্র্যের দ্রুত বিলুপ্তির ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের বিধান অনুসারে এ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ৮ (আট) টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন (ECA) হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

নাম	এলাকা (হেক্টর)
সুন্দরবন	৭৬২,০৩৪
কক্সবাজার-টেকনাফ সুমদ্র সৈকত	১০,৪৬৫
সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ	৫৯০
সোনাদিয়া দ্বীপ	৪,৯১৬
হাকালুকি হাওড়	১৮,৩৮৩
টাংগুয়ার হাওড়	৯,৭২৭
মারজাত হাওড়	২০০
ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক	

উৎস ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নং প্রবম-৪/৭/৮৭/৯৯/২৪৫, তাং-১৯.০৪.১৯৯৯

গেজেট দ্বারা এ সকল এলাকাতে ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নরূপ কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

১. প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ;
২. সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা;
৩. ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ;
৪. প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংস বা সৃষ্টিকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ;
৫. ভূমি এবং পানির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নষ্ট/পরিবর্তন করতে পারে এমন সকল কাজ;
৬. মাটি, পানি, বায়ু এবং শব্দ দূষণকারী শিল্প বা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
৭. মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণীর ক্ষতিকারক যে কোন প্রকার কার্যাবলী;
৮. লেকের চারপাশের বসতবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পয়ঃপ্রণালী সৃষ্ট বর্জ্য ও তরল বর্জ্য নির্গমন;
৯. লেকের চারপাশের বাসাবাড়ী, বৈদেশিক মিশন, শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য নিক্ষেপন;

১০. লেকের কিনারায় বা লেকের পানিতে কোন প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সদস্য, ব্যক্তিবিশেষ বা ব্যক্তিসমষ্টির গোসল করা, কাপড় কাচা, মলমূত্র ও অন্যান্য বর্জ্য ত্যাগ করা।

[পরিশিষ্ট ক-এ পরিবেশ সংকটাপন্ন ঘোষিত এলাকাসমূহে গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।]

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে সরকারি উদ্যোগ-

বাংলাদেশ পানি সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ সমস্যা মূলত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। দেশের মৎস্য সম্পদ উৎপাদন ও আহরণের প্রধান উৎস হচ্ছে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক এলাকা। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন ৪৩.৬৭ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে প্লাবন-ভূমিসহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর এবং উপকূলীয় চিংড়ি খামারসহ বদ্ধ জলাশয় ২.৯০ লক্ষ হেক্টর।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির দেশী ও ১২ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি মাছ রয়েছে। সমুদ্র এলাকায় ৪৭৫ প্রজাতির মাছসহ ২৪ প্রজাতির চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির কাছিম, কাকড়া, ঝিনুক, শৈবাল ইত্যাদি রয়েছে, যেগুলোর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মাছ মানুষের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রোটিনের প্রধান উৎস। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত জনবহুল দেশের জন্য সহজলভ্য এবং সুলভ। প্রয়োজনীয় সুষম প্রোটিনের অভাবে মানব দেহে নানাবিধ জটিল রোগের প্রতিরোধ ও নিরাময়ে এ সম্পদ সহায়ক। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মোকাবিলায় প্রকট খাদ্য ঘাটতি পূরণে মৎস্য সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। মৎস্য সম্পদ হ্রাসের সাথে সাথে খাদ্যচক্রের প্রক্রিয়াতে দেশের ব্যাপক পাখি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য ও মারাত্মক হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। তাই পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রার্জন বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ সম্প্রসারণ/সংরক্ষণ ও আর্থ সামাজিক কর্মকাণ্ডে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা অপরিসীম। বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদ সম্প্রসারণের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নরূপ ঃ

- মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও প্রবৃদ্ধি পরিপন্থী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন জলাশয়গুলো লিজ দেয়ার ফলে অধিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নির্বিচারে ছোট মাছ ধরা;
- পোকা মারার ঔষধ ধান ক্ষেতে' ছিটানোর ফলে ব্যাপক মাছের মরক দেখা দেয়;
- দারিদ্র্য ও অভাবজনিত কারণে জীবিকার জন্য নির্বিচারে মৎস্য সম্পদ আহরণ;

- বাণিজ্যিক, মুনাফা লাভ এবং অধিক চাহিদার জন্য ব্যাপকহারে নৈতিকতা বিবর্জিতভাবে ইলিশ মাছসহ অন্যান্য মাছের জাটকা আহরণ করে মৎস্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন;
- দারিদ্র্য এবং বাণিজ্যিক কারণে শৈবাল/কোরাল, ঝিনুক, কচ্ছপসহ অন্যান্য সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য উজার।

এছাড়াও কারিগরী দুর্বলতা, দক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য জনশক্তির অভাব, কারিগরী জ্ঞানের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রশাসনিক দুর্বলতা, আর্থিক সীমাবদ্ধতা সর্বোপরি মূল্যবোধের অভাব জীববৈচিত্র্য বিনাশের অন্যতম কারণ।

উপর্যুক্ত সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো নিরসনকল্পে জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ প্রণয়ন করা হয় যার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য (অনুচ্ছেদ ২) প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণে অধিক পরিমাণ মৎস্য সম্পদ উৎপাদন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮ (অনুচ্ছেদ ৫)-এ বিগত কয়েক বৎসরে বিভিন্ন উৎস থেকে মাছের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ প্রধানত প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্টি। এ জন্যে প্রয়োজন সময়োপযোগী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ (অনুচ্ছেদ ৫)। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ (অনুচ্ছেদ ৫)। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা (অনুচ্ছেদ ৬)। উপকূলীয় চিংড়ি ও মৎস্য চাষ (অনুচ্ছেদ ৭)। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণ (অনুচ্ছেদ ৮)। এ নীতিমালায় মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা (অনুচ্ছেদ ৯.৫) ও মৎস্য সংক্রান্ত পরিবেশ (অনুচ্ছেদ ৮)। এ নীতিমালায় মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা (অনুচ্ছেদ ৯.৫) ও মৎস্য সংক্রান্ত পরিবেশ (অনুচ্ছেদ ৯.১০) বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। নতুন নীতিমালার আলোকে নতুন নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এগুলোর বাস্তবায়ন ও সুফল প্রাপ্তি করণের জন্য মৎস্য আইন ২০০২ (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব আইন প্রয়োগের সাথে বিরাট আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের বিরাট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সমাধান অধিকাংশ আইন প্রয়োগের মাধ্যমে করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হতে পারে।

গত ২০০২ সালে মৎস্য পক্ষের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, দেশে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বেড়েছে তাতে খুব উৎফুল্ল বোধ করার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। এ পরিসংখ্যানে একটি শুভংকরের ফাঁকি রয়েছে যা বেশ মারাত্মক। এখানে উৎপাদন অর্থ হলো আহরণ-যার প্রকৃত তাৎপর্য এ দেশের আর্থ সামাজিক

প্রেক্ষাপটে নির্বিচারে মৎস্য সম্পদ নিধন। এ আহরণ-তথ্যে কোন্ প্রজাতির মাছ কি পরিমাণ ধরা হয়েছে, তার অবস্থা (Status) এবং দেশে তার মজুদ ও সংখ্যার পরিমাণের কথা বলা হয়নি। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির মাছের জন্মহারও (Growth rate) ভিন্ন। এ ক্ষেত্রে টেকসই ব্যবস্থাপনা নীতি অনুসারে জন্মহার (Growth rate) আহরণ হার (Extraction) সমান হওয়া অত্যাবশ্যক, যা এ উৎপাদন পরিসংখ্যানে বিবেচিত হয়নি।

উপর্যুক্ত অবস্থার প্রেক্ষাপটে মৎস্য সম্পর্কীয় শিক্ষা (৯.৫) এবং মৎস্য সংরক্ষণ পরিবেশ সংক্রান্ত (৯.১০) অনুচ্ছেদ অর্ত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান নীতিমালা অনুসারে সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় মৎস্য বিভাগ ও জীব বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি প্রাণী ও জীবজন্তুর প্রতি কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং সম্পদ সংরক্ষণে ধর্মীয় মূল্যবোধের ও প্রশিক্ষণের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। কারণ সরকারি নীতি ও আইন প্রতিপালনের বিষয়ে কেউ ব্যক্তিগত দায়িত্বে এগিয়ে আসে না। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধটি ব্যক্তি জীবনে প্রতিপালনের তাৎপর্য অনেক বেশী। কেননা এ ক্ষেত্রে তার আচরণটিকে পাপ-পুণ্যের বিষয় হিসেবে বিচেনা করে। তাই রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও আইন প্রয়োগের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধর্মীয় মূল্যেবোধকে জাগিয়ে তুলতে পারলে সরকারি নীতি ও আইনের প্রতি এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। ফলে অনেক স্বল্প খরচে এ দেশের এ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণও ব্যবস্থাপনা সম্ভব হবে। তাতে সমাজের সাধারণ মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও ব্যয় সংকোচন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ বিষয়ে Wildlife Preservation Act ১৯৭৩ এর অনুচ্ছেদ ১৯ এর আওতায় কতিপয় লোক ও কর্মচারীকে বন্যপ্রাণী নিধনের তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ১৬-তে ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বন্যপ্রাণী নিধনের তল্লাশির ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩০ ধারায় ভ্রাম্যমান আদালত গঠনের কথা বলা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ২(৩) এ বন কর্মকর্তাকে ১৯২৭ সনের বন আইনের বিধানমতে কার্যক্রম গ্রহণ করার বিধান রয়েছে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন সময়োপযোগীকরণ

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করার পর ইতোমধ্যে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। পরিপর্তিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন পরিবর্তন ও সংশোধন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। যেমন এর সংজ্ঞাতে "Migratory and marine, wild vertebrates" এ সবের স্থলে "Marine/reserves/ migratory routes, corridor"

শব্দগুলো ও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। দুইটি সিডিউলের স্থলে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণীর (threatened animals) এর বিষয় একটি সিডিউল করা যেতে পারে। জীববৈচিত্র্য আবাসস্থল, ভূমি, জলাধার এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার নীতি ও এসব সম্পত্তির মালিকানা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। Breeding ground সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব, কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের অংশগ্রহণ পদ্ধতি অবিভাসনকারী প্রজাতি (Migratory species)– ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ উপদেষ্টা কমিটি (Advisory committee) সদস্যগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠন করা যেতে পারে। এ সব আইন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ও দায়বদ্ধতা সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকতে হবে। উক্ত আইনে কর্মকর্তা বলতে শুধু বন কর্মকর্তাকে বুঝায় (বন আইন ১৯২৭) তা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে (যেমন পুলিশ কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, পশুসম্পদ ও মৎস্য কমর্কতা এমনকি জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাতে হবে। বন্যপ্রাণী নিধনে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিচার পদ্ধতিও সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে।

সমাজের বিভিন্ন প্রকার প্রভাব এবং নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের জন্য তথ্যের ধারাবাহিকতা অভিযোগ গঠনের সময় যথাযথভাবে আদলতের দৃষ্টিগোচরে আনা সম্ভব হয় না। যার ফলে প্রকৃত অপরাধী সহজে খালাস পেয়ে যায়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ যেহেতু সরকারি মালিকানাধীন কিছু ছোট খাটো অপরাধী বিচারামলে আসলেও বড় বড় রাঘব বোয়াল উপর মহলের যোগসাজশে পার পেয়ে যায়।

তাছাড়া আইনের অনেক দুর্বলতাও রয়েছে, যা খুবই স্বাভাবিক কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এবং বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। যেমন বন আইনের ২৬ (১ক) ধারামতে মামলার অপরাধ বিবরণীতে কোথাও উল্লেখ নেই যে, ঘটনাস্থল সংরক্ষিত বন কিনা। অপর একটি পুকুর থেকে অবৈধভাবে জমাকৃত কাঠ উদ্ধার করা হলো এবং 'ক' এর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হলো। কিন্তু পুকুরের মালিক 'ক' কিনা বা 'ক' যে ঐ পুকুরে কাঠ লুকিয়ে রেখেছে এমন কোন তথ্যও মামলার বিবরণীতে উল্লেখ নেই। এরূপ ক্ষেত্রে চার্জ গঠনে বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এভাবে নানা অজুহাতে দোষী ব্যক্তিদের আইনামলে আনা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমতাবস্থায় প্রচলিত আইনের সময়োপযোগী সংশোধন ও এর যথাযথ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। আইনগত বিষয়গুলো প্রচলিত অন্যান্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে সংশোধনের বিষয়টি আলাদাভাবে আলোচনা করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে এর প্রয়োগের দুর্বলতার দিকটিই বিবেচ্য। প্রতিটি

মানুষের একটি দুষ্ট মন থাকে। তার আদর্শ চরিত্র ও স্বভাব গঠনের মাধ্যমেই সে তার দুষ্ট রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর এজন্যে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিকের মূল্যবোধকে উন্নত করা যেতে পারে। তাহলে তারা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নৈতিকতার তাগিদে অথবা ধর্মীয় বিবেচনায় পাপ/পুণ্যের তাগিদে তাদের নিজেদের সকল কর্মকাণ্ডে দায়িত্বশীল হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হতে পারে।

৫.০ সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় নৈতিকতার প্রভাব

জৈব সম্পদ সংরক্ষণে সামাজিক সম্প্রদায়কে সম্পৃক্তকরণ

সামাজিক সম্প্রদায়কে জৈব সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বজনীন বিশেষ কোন প্যাকেজ নেই। কারণ, যে জনগোষ্ঠী বনাঞ্চলের কাছাকাছি এলাকায় থাকে, বৃক্ষ এবং প্রাণী তাদের খাদ্য, ঔষধ, আশ্রয় নির্মাণ সামগ্রী এবং আয়ের উৎসের সন্ধান দিয়ে থাকে। নদী তাদেরকে যোগাযোগের সুযোগ সৃষ্টি করে, মাছ, পানি ইত্যাদি সরবরাহ করে। ভূমি জনগণকে কোরাল-রীফ এবং উপকূলীয় বন ইত্যাদি সরবরাহ করে থাকে। এ সব সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণ তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রত্যক্ষ সুবিধা নিয়ে থাকে। তাই রাজধানী বা বড় শহরে বসে যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের কাছে জৈব সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব সীমিত না রেখে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে জৈব সম্পদ সংরক্ষণে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রামীণ যে লোকটি প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করত তার আয় বৃদ্ধি করা যেতে পারে এবং তাতে বর্তমান সংরক্ষণ ব্যয়ও হ্রাস করা যাবে। যেমন স্থানীয় জনগণ মুনাফা অংশীদারীর ভিত্তিতে নিয়োজিত থাকলে অফিসিয়াল ব্যবস্থাপকের জন্য সরকারি খরচে বাসস্থানের প্রয়োজন হবে না। তাদের যাতায়াত খরচের প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া বহুবিধ সম্পদ অপচয় ও ধ্বংস থেকে রক্ষা পাবে। উল্লেখ্য বনাঞ্চলের নিকটবর্তী এলাকায় বেশীর ভাগই অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বাসস্থান অথচ তাদের চতুষ্পার্শে রয়েছে অতি সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য। দারিদ্র্যপীড়িত জনগণ জীবিকা নির্বাহে বন ধ্বংস করে কৃষি কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। তাই পরিবর্তনশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকারের সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি এবং নীতি পুনঃ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং জবরদখলকারী এবং অনুপ্রবেশকারী গ্রামীণ জনগণকে সম্পদ সংরক্ষণে কিভাবে উদ্বুদ্ধ করা যায় সে জন্যে নতুনভাবে সময়োপযোগী নীতি/বিধি তৈরী এবং বাস্তবায়ন করতে হবে যেন অবৈধ সম্পদ আহরণকারী সংরক্ষণকারীতে পরিণত হয়।

তাই প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ নীতি প্রণয়নে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদির অন্তর্ভুক্তি বাঞ্ছনীয়–

(ক) জৈব্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ, অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান যেমন, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব স্থানীয় সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রদান করা যেতে পারে।

(খ) স্থানীয় সম্প্রদায়/সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি গড়ে তোলা যেতে পারে।

(গ) প্রাকৃতিক (জৈব) সম্পদের মূল্য র্নিধারণের নীতি আলোচিত বিষয়াদির আলোকে পুনর্নির্ধারণ করা যেতে পারে।

(ঘ) জৈব সম্পদ সংরক্ষণে কর সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

(ঙ) জৈব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্নভাবে সম্পদের মালিকানা প্রদানের পদ্ধতি প্রদান করা যেতে পারে। যেমন বাংলাদেশ সামাজিক বনায়নের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের জন্য উপকারভোগীরা ৬৫ শতাংশ মালিকানা অথবা মুনাফা লাভ করবে। সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করলে জমির ভোগদখলের ও মালিকানা পাবে। এভাবে গতানুগতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতিকে আধুনিকরণ করে সময়োপযোগী করে তোলা যেতে পারে। তাই শুধু সরকার বা সরকারি কর্মকর্তা নয় বরং যে জনগোষ্ঠী বনাঞ্চল, জলাভূমি, উপকূলীয় অঞ্চলের চতুষ্পার্শ্বে থাকে তাদের জৈব সম্পদ ব্যবহারের এবং ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তাদের উৎসাহিত করতে হবে, প্রলোভন দেখাতে হবে যেন নিজেদের স্বার্থে নিজেদের খরচে এ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় এগিয়ে আসে, জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখে এবং এর সুফল ভোগের অংশীদার হয়।

৬.০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নৈতিকতা ও ধর্মীয় প্রভাব

জাতিসংঘের এজেন্ডা ২১-এ ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, দেশীয় প্রথা, ধর্ম এবং সংস্কৃতিক সাথে যা সমন্বয় করার সুপারিশ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে উন্নত বিশ্বে সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও প্রথা (Custom & conventions) তুলে ধরাসহ Environmental Negotiation এর উপর ব্যাপক গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের অনুভূতিকে পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তুলে ধরা যেতে পারে।

প্রচলিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নৈতিকতা বিবর্জিত হয়ে অনেকেই একচেটিয়া মুনাফা অর্জন ও কালোবাজারি করে টাকার পাহাড় গড়ে তুলে, তাতে সমাজে অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, আইন-শৃঙ্খলার অবনতিসহ দেশের প্রশাসনিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এ

ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা সম্প্রসারণ ও দেশে প্রচলিত যাকাত ব্যবস্থাকে বাধ্যতামূলক করে আয়কর আদায় করে আরো কার্যকর ভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গরীবদের ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন কর্মসংস্থানের কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। এভাবে সম্পদের সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারলে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টা সফল হতে পারে।

আল্লাহ পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসকে যথাযথ আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করেছেন তার গুণগত ও পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে। যেমন পবিত্র কোরান শরীফে উল্লেখ রয়েছে- "আমরা প্রত্যেকটি জিনিস আনুপাতিক হারে সৃষ্টি করেছি" (সুরা কমর ৫৪ঃ ৪৯) অর্থাৎ প্রত্যেকটি জিনিসে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পরিমাপ রয়েছে। অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য তার নিকট একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট রয়েছে" (সুরা রা'দ ১৩ঃ৮) এই আনুপাতিক হার বিনষ্ট হলে জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় যা এ ধরণীর ও মানব কল্যাণের জন্য হুমকির সৃষ্টি করে।

আল্লাহ পৃথিবীর কোন জিনিসই বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই। মানুষকে আল্লাহর খলিফা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, আর তার কল্যাণে সকল কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ ছাড়াও আল্লাহর প্রতিটি সৃষ্টি তার তসবীহ করে। কল্যাণ হতে পারে এমন ছাড়া অন্য কোন কারণে প্রাণী বা উদ্ভিদ আহরণ বা ধ্বংস করা যাবে না। তাই মানুষও জীববৈচিত্র্য সম্পর্ক হবে অবিচ্ছেদ্য। প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই (Sustainable) ব্যবহার, উন্নয়ন এবং একমাত্র মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে এমন কাজের জন্যই শুধু ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক প্রতিটি প্রাণীর প্রতি যত্নশীল হওয়া মানুষের একান্ত কর্তব্য। কোন জিনিসের ব্যবহার মানুষের কল্যাণের জন্য, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির সকল কিছু তার বিধানমত পরিচালিত হওয়া। কেননা, আল্লাহ মানুষকে তার খলিফা (প্রতিনিধি) হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে তার প্রকৃতির ব্যবহার ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ও প্রদান করেছেন। তাই মহানবী (সঃ) ঘোষণা দিয়েছে "এ ধরণী অতীব সুন্দর ও সবুজ, তিনি তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছেন। তিনি দেখতে চান কত সুন্দরভাবে তোমরা এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে পার" (মুসলীম শরীফ)।

জীববৈচিত্র্য খাদ্যচক্র হিসেবে এর গুরুত্ব মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে "মানুষ তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক। আমরা পানি বর্ষণ করেছি। এ দিকে মাটিকে বিস্ময়করভাবে দীর্ণ করেছি। অতঃপর উৎপাদিত করেছি শস্য, আঙ্গুর, তরকারী, জয়তুন, খেজুর, ঘন-সন্নিবেশিত বাগিচা আর রকম বেরকম ফল ও উদ্ভিদ তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ জন্তুর জন্য জীবিকা হিসেবে (সুরা আকসা ৮০ ঃ ২৪-৩২)। এছাড়াও জীববৈচিত্র্য

মানুষের জন্য ঔষধ তেল, সুগন্ধি মধু, আঁশ টিম্বার, জ্বালানী ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদির সম্বন্ধে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে। "তোমরা কি কখনো চিন্তা করেছো যে, আগুন জ্বালাও? এসব গাছ তোমরা বানিয়েছো না এসবের সৃষ্টিকারী আমরা। আমরা এসব স্মরণের মাধ্যমে এবং প্রয়োজনশীলদের জন্য জীবন-উপকরণ বানিয়েছি" (সুরা ওয়াকেয়া ৫৬ ঃ ৭১-৭৩)।

প্রাণী ও উদ্ভিদ একে অন্যের জন্য পারস্পরিক খাদ্য সরবরাহ করে যেমন, প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাটি এবং সমুদ্র উর্বর করে যা উদ্ভিদের জন্য খাবার। অন্যদিকে প্রাণীর মাংস মানুষের জন্য প্রোটিন যোগায় মাংস ও দুধ সরবরাহ করে। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে। "জমিনের উপর বিচরণশীল কোন জন্তু এবং বাতাসে ডানার সাহায্যে উড়ন্ত কোন পাখিই দেখ, ইহারা তোমাদের মতই বিচিত্র প্রজাতি" (সুরা আন আম ৬ঃ ৩৮)। এ খাদ্যচক্রে টেকসই ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও মানুষের। কোন অবস্থাতেই বিনা প্রয়োজনে এদের ধ্বংস/আহরণ করার অর্থ হল আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়মে ফাসাদ সৃষ্টি করা। তাই পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে "তোমরা কি দেখনা আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে রয়েছে সে সব যারা আসমানে রয়েছে আর যারা জমিনে রয়েছে। চন্দ্র, সূর্য তারকা, গাছপালা, জন্তু জানোয়ার বহু সংখ্যক মানুষ" (সুরা হজ্জ ২২ঃ১৮)। মহানবী (সঃ) কে সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল করে প্রেরণ করা হয়েছে, এ প্রসংগে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে– "হে নবী (সঃ) তোমাকে দুনিয়াবাসীদের জন্য দয়াশীল করে প্রেরণ করা হয়েছে" (সুরা আনবিয়া ২১ঃ ১০৭)। তিনি মানুষ জাতিকে প্রাণীদের প্রতিদয়াশীল হবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন" আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়াশীল হও। তাহলে স্বর্গবাসীও তোমাদের প্রতি দয়াশীল হবেন" (আবু দাউদ ও তিরমিজি শরীফ)।

এ ছাড়া আরো অনেক হাদিস রয়েছে প্রাণীদের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করা প্রসঙ্গে; যেমন, কোনো ব্যক্তির কারণে যদি কোন প্রাণী না খেয়ে অথবা তৃষ্ণায় মারা যায় আল্লাহ তাকে দোজখে প্রেরণ করবেন। অন্য এক হাদিসে উল্লেখ রয়েছে যে এক ব্যক্তি মহানবী (সঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিলেন প্রাণীদের প্রতি আচরণের কি প্রতিদান রয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন, "প্রতিটি জীবিত প্রাণীর প্রতিই সুন্দর আচরণের জন্য পুরস্কার রয়েছে। বিনা প্রয়োজনে একটি মৌমাছি বা যে কোন প্রকার জন্তুকে অথবা উদ্ভিদকেও নষ্ট না করার জন্য ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। এ প্রসংগে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে "যখন সে ক্ষমতা লাভ করে, তখন পৃথিবীতে তার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করে কি করে এ পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্ট করা যাবে, শস্য ক্ষেত ধ্বংস করে। অথচ আল্লাহ অশান্তি ও বিপর্যয় মোটেই পছন্দ করেন না" (সুরা বাকারা ২ঃ২০৫)।

পবিত্র কোরআনে পাখির উড্ডয়ন সম্পর্কে তার কুদরত এর কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে পাখিও এবাদতে মশগুল। উড়ন্ত পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই তার যোগ্য এবাদত এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে (সুরা নূর আয়াত-৪১)। অন্য এক আয়াতে রয়েছে- মুসলমান যদি কোন গাছ রোপণ করে বা ক্ষেত্রে কোন শস্য আবাদ করে আর তা থেকে উৎপন্ন শস্য কোন পাখি, মানুষ বা পশু ভক্ষণ করে তবে তা সাদকা করার সওয়াব পাবে (আল হাদিস)।

মহানবী পাখি সংরক্ষণের উপরও গুরুত্বারোপ করেছেন। একদা এক সাহাবী পাখির বাসা থেকে বাচ্চা নিয়ে আসে, এতে পাখির মা তার বাচ্চার দিকে ছুটে আসে। এ ঘটনায় মহানবী মর্মাহত হন, তিনি তাৎক্ষণিক বলেন, পাখির বাচ্চা বাসায় রেখে আস। অর্থাৎ পাখির নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা উচিত। ইসলামের বিধানে মানুষের প্রতি প্রাণীদের অধিকার রয়েছে যা আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগযোগ্য। নবীর (সঃ) শিক্ষার উপর ভিত্তি করে শত শত বৎসর পূর্বে প্রাণীদের প্রতি অধিকার সংক্রান্ত বিধান তৈরী হয়েছে। মানুষের দায়িত্ব হল প্রাণীদের প্রতি দয়াশীল হওয়া, যদিও সে বয়স্ক, অথবা অসুস্থ এবং তার থেকে কোন আর্থিক সুবিধা না আসে। তাকে তার সাধ্যাতীত বোঝা দেয়া যাবে না। তাদেরকে এমনভাবে রাখা যাবে না, যেন তারা আহত হয় অথবা তাদের হাড় ভেঙ্গে যায়। যদি তাদেরকে জবেহ করতে হয়, দয়ার সাথে সে কাজ সম্পাদন করতে হবে। তারা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত তাদের চামড়া খোলা যাবে না অথবা কোন হাড় ভাঙ্গা যাবে না। তাদের বাচ্চাদেরকে জবেহ করা যাবে না। তাদের বিশ্রামের জায়গা আরামদায়ক হতে হবে। তাদের প্রজননের সময় একসাথে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাণী শিকার করার সময় হাড় ভাঙ্গা বা এমনভাবে মারা যাবে না যেন তাদের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায় (ইজাজুদ্দীন)।

এ বিষয়ে পবিত্র কোরানে উল্লেখ রয়েছে, "এবং তিনি আসমান হতে পানি বর্ষণ করান, এর সাহায্যে সকল প্রকার উদ্ভিদ সাজিয়েছেন এবং এর দ্বারা শস্য, শ্যামল, ক্ষেত খামার ও গাছপালা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে বিভিন্ন কোষ সম্পন্ন দানা বের করেছি, খেজুরের ফলের থোকা বানিয়েছি যা ভারের চাপে নুয়ে পড়ে। আর আঙ্গুর, জয়তুন ও আনারের বাগান সাজিয়ে দিয়েছি, সেখানে ফলসমূহ পরস্পেরের সদৃশ, অথচ প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য আবার ভিন্ন ভিন্ন। এ গাছগুলি যখন ফল ধারণ করে, তখন এদের ফল বের হওয়া এবং পেকে যাবার অবস্থাটা একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখবে" (সুরা আন-আম ৬ঃ৯৯)। পবিত্র কোরানে জীববৈচিত্র্য এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে "আমরা এতে খেজুর আঙ্গুর বাগান বানিয়েছি, এর মধ্যে ঝরণা প্রবাহিত করেছি যেন তারা এর ফল খেতে পারে" (সুরা ইয়াসিন ৩৬

ঃ ৩৪)। আবার উপজাতীয় (Tribal) লোকজন তাদের শত্রুর মালিকানাধীন খেজুর গাছ বিশেষ করে পুরুষ গাছগুলো কেটে ফেলতে চায়। এ ধরনের খারাপ আচরণে মুসলমানের নিরুৎসাহিত করা হতো। এ ধরনের বৃক্ষ নিধনকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচনা করা হতো। এমন কি যুদ্ধের সময়ও মুসলিম যোদ্ধাদের নির্দেশ দেয়া থাকতো নিরপরাধী মানুষের ক্ষতি করা এবং সবুজ গাছপালা কাটা থেকে বিরত থাকতে (ফারুকী, ১৯৮৯)। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্মীয় বিধানগুলো প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে সকল ধর্মের জনগোষ্ঠীর মূল্যবোধকে উন্নত ও সমন্বিত করা যেতে পারে।

৭.০ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কতিপয় সুপারিশ

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের সুপারিশ ও উদ্যোগগুলোর মধ্যে রুয়েছে সুন্দরবন ও টাংগুয়ার হাওরকে World Heritage হিসেবে ঘোষণা দেয়া। তবে এসব এলাকায় কি ধরনের সংরক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে এ বিষয়ে সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারের আরো দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি প্রয়োজন রয়েছে। দেশের উদ্ভিদ ও প্রাণীবৈচিত্র্যের ভবিষ্যতে বিলুপ্তি রোধ করা যায়। বিশেষ করে দুস্প্রাপ্য প্রজাতিগুলিকে নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা যায় সেজন্য অবিলম্বে নিম্নোক্ত কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ক) নীতি নির্ধারণী মহলে দেশের প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদের বিলুপ্তির হারকে চিহ্নিত করতে হবে। অবিলম্বে জৈব-সম্পদের বিলুপ্তির হারকে রোধের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে।

(খ) সমাজের সকল স্তরের জনগণকে জীব সম্পদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্যে লিফলেট, প্যাম্পলেট, পোষ্টার এবং সকল প্রকার গণমাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এবং শ্লোগান প্রচার করতে হবে।

(গ) অবৈধভাবে প্রাণী হত্যা, উদ্ভিদের বিনষ্টকারীদেরকে আইন প্রণয়ন ও এর কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে হবে। পাশাপাশি মূল্যবান সম্পদের সংরক্ষণ বৃদ্ধির সহায়ক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঘ) সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ সংরক্ষণে সংগঠিত করতে হবে। এ সম্পদ সংরক্ষণে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জনগণকে অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে ছাত্র, সমাজ, স্কুল, মাদ্রাসা ও সমাজসেবামূলক সকল প্রতিষ্ঠান এবং সকল প্রকার সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

(ঙ) উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ শুধু বাংলাদেশের সম্পদ নয়। এ পৃথিবীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সম্পদ। তাই এ সম্পদ আন্তর্জাতিক সকল সংস্থার এবং প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রশিক্ষণ এবং উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

(চ) প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলার জন্য সকল প্রকার ধর্মীয় চেতনা এবং এর তাৎপর্য তুলে ধরে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

আনোয়ার হোসেন কাজল	ঃ	৫ই জুলাই, ০৩ নভেম্বর, ২০০০
শামছুর রহমান	ঃ	দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩শে জুন, ২০০০
মজিদ মাহমুদ	ঃ	দৈনিক যুগান্তর, ০৫ই মে, ২০০০
আবুল কাশেম ভূঁইয়া	ঃ	০৫ই জুলাই, ১৯৯৯
ইলিয়াস খান	ঃ	দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫শে জুন, ২০০০
এম এ খালেক	ঃ	দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ই জুলাই, ১৯৯৯
লায়লা দোলন	ঃ	দৈনিক যুগান্তর, ৩০শে জুন, ২০০০
অলিউল্লাহ নোমান	ঃ	দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ই জুন, ২০০০
ড. মোস্তাইন বিল্লাহ	ঃ	দৈনিক যুগান্তর, ১৭ই নভেম্বর ২০০০

(ইত্তেফাক ২৮ নভেম্বর/২০০০)।

এ, জেড, এম শামছুল আলম (১৯৯২) ইসলামে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

Towards Sustainable Development: The National Conservation Strategy of Bangladesh (1999), National Conservation Strategy (NCS) Implementation Project-1, Ministry of Forest and Environment, Government of Bangladesh.

Management plan for Tanguar Haor (1997), National Conservation Strategy (NCS) Implementation Project-1, Ministry of Forest and Environment, Government of Bangladesh.

Miller, G T (1992), An introduction to Environmental Science: Living in the Environment.

Dr. Ali Sukri (1995) Al Bi'ya Min Manzure Islam, Egypt.

Dr. Anwarul Kabir (1998) Quda Al-Bi'ya Min Manjure-Islami, Unpublished Manuscript, Darul Ehsan University, Bangladesh.

A.R. Agwan (1997). Islam and the Environment Synergy Book International, Kua-La-Lumpur, Malaysia.

Seyed Hossein Nasr (1978). An Introduction to Islamic cosmological Doctrines, Thames and Hudson Ltd. 1978. U.K. Great Britain.

UNEP. Global Assessment: Summary for Policy Makers, Cambridge, 1995, p6.

দেবনাথ, রণজিৎ কুমার (রনো), ১৯৯৯ ঃ সুন্দরবন ঃ সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষায় করণীয়। সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্পঃ এডিবি, রূপান্তর সুন্দরবন স্টাডি গ্রুপ।

পরিশিষ্ট ক

উল্লিখিত গেজেটসমূহের অধীনে নিম্নলিখিত এলাকাভিত্তিক বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃনং	এলাকার নাম	গৃহীত/গ্রহীতব্য কার্যক্রম	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
১.	সুন্দরবন	বন বিভাগ কর্তৃক দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্প দু'টি হচ্ছে ঃ Sundarbans Biodiversity Conservation Project (SBCP). Two/ Country Approach for Conservation of World Heritage Site	o সুন্দরবনের পরিবেশগত অবস্থা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।
২.	কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত	কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে GEF এর আওতায় প্রস্তাবিত এলাকাটি অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের নাম ঃ "Coastal Biodiversity" ($ 5 Million). GQvov IUCN, Bangladesh, Ford Foundation এর অনুদানে IUCN বাংলাদেশের "Wetland Policy and Rules" এর খসড়া তৈরী প্রক্রিয়াধীন।	o সুনির্দিষ্টভাবে এলাকা চিহ্নিতকরণ। o সৈকত এলাকায় অবৈধ স্থাপনাদি উচ্ছেদ। o সৈকত এলাকায় শামুক-ঝিনুকসহ জীববৈচিত্র ধ্বংসকারী যে কোন কিছুর কেনা-বেচা বন্ধ করা। o জীববৈচিত্র্যসহ অন্যান্য প্রকৃতিক সম্পদের তালিকা প্রণয়ন (Inventory) ও পরিমাণ নির্ধারণ। o সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি/ দপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান। o সম্ভাব্য প্রতিবেশগত হুমকি নিরুপন ও প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ।
৩.	সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপ	প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং বস্তু বায়নাধীন আছে। প্রকল্পের নাম ঃ "সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ম্যারিন পার্ক প্রতিষ্ঠা ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	o জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ o স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা o ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন o প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ (Inventory) প্রণয়ন/ অর্থনৈতিক মূল্যমান নির্ধারণ করা।
৪.	সোনাদিয়া দ্বীপ	কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে GEF এর আওতায় প্রস্তাবিত এলাকাটি অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের নাম ঃ "Coastal Biodiversity" ($ 5 Million). GQvov IUCN, Bangladesh, Ford Foundation এর অনুদানে IUCN বাংলাদেশের "Wetland Policy and Rule" খসড়া তৈরী করেছে।	o জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ o স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা o ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন o প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ (Inventory) প্রণয়ন/ অর্থনৈতিক মূল্যমান নির্ধারণ করা।
৫.	হাকালুকি হাওড় (বড়লেখা, কুলাউড়া, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট ও মৌলভীবাজার)	কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। তবে GEF এর আওতায় প্রস্তাবিত এলাকাটি অন্তর্ভুক্ত আছে। প্রকল্পের নাম ঃ Coastal Biodiversity" ($ 5 Million). এছাড়া IUCN, Bangladesh, Ford Foundation এর অনুদানে IUCN বাংলাদেশের "Wetland Policy and Rule" এর খসড়া তৈরী করেছে।	o স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনা o জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ o প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন o সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ (Inventory) ও অর্থনৈতিক মূল্যমান নির্ধারণ করা।
৬.	টাংগুয়ার হাওড় (তাহিরপুর, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ)	ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং একটি প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। এনসিএস প্রকল্পের আওতায় জীববৈচিত্র্যসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকা প্রণয়ন ও জরীপ সম্পন্ন হয়েছে।	o স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ ব্যবস্থাপনা o জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ o প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন
৭.	মারজাত বাঁওড় (কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ)	কোন তথ্য নেই।	o ফলোআপ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৮.	ঢাকার গুলশান-বারিধারা লেক (ঢাকা মেট্রোপলিটন)	কোন তথ্য নেই।	o সুনির্দিষ্টভাবে এলাকা চিহ্নিতকরণ। o অবৈধ স্থাপনাদি উচ্ছেদ। o জীববৈচিত্র্যসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ এর তালিকা ও পরিমাণ নির্ধারণ। o সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি/ দপ্তরকে দায়িত্ব প্রদান। সম্ভাব্য প্রতিবেশগত হুমকি নিরূপণ ও প্রতিকারের উদ্যোগ গ্রহণ।

সর্বোপরি পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকাগুলির ব্যবস্থাপনার জন্য নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১. ECA ব্যবস্থাপনার জন্য একটি গাইড লাইন প্রণয়ন।

২. ECA ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা প্রস্তুতকরণ।

৩. যে সকল ECA এর প্রতিবেশগত কোন তথ্য নেই সে বিষয়ে দ্রুত তথ্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশের শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের*

Abstract: Urban Local Govt has vital role in the local Govt. arena of Bangladesh. Generally the rural local govt. bodies are the focal point of our discussion, so the Urban Local Govt. is often ignored, though it plays a vital role in the local gov. bodies. Historically, "Panchayet" system existed in ancient India. During Mughal period Urban Local Govt. system was introduced for the first time. The British ruler introduced modern form of Urban Local Govt. by enactment of several laws. During that period the Urban Local Govt bodies were more active than the rural one. At the time of independence of Pakistan we got 52 municipal boards in East Bengal part and another 04 municipal boards from Sylhet part. Under ther Powroshava Ordinance–1977 the Municipal bodies had been formed and flourshed. Now, the Pouroshava has been formed under this ordinance. The municipal bodies have been given power to perform functions at a large scale. There are 6 city coporations in our country which are being guided by separate law/ordiance. In this article an attempt has been made to analyse the development of Urban Local Govt. bodies from ancient to modern time and clarify its vital functions in the society.

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে কোন কথা বলার বা লেখার চিন্তার সাথে সাথেই আমাদের মনে প্রায়শই গ্রামীণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে ধারণা ফুটে উঠে। এজন্য শহুরে স্থানীয় সরকার সম্বন্ধে আলোচনার আগে প্রচলিত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। স্থানীয় সরকার হলো স্থায়ীভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা যা কিনা স্থীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গঠিত হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকারের কোন সার্বভৌম শক্তি না থাকায় স্থানীয় সরকারের কর্ম পরিধি, গঠন ও আর্থিক ক্ষমতা জাতীয় সরকার বিভিন্ন আইন বিধি ও সার্কুলারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্থানীয় সরকারের ধারণাটিকে সংজ্ঞায়িত করার লক্ষ্যে তাত্ত্বিকগণ আকার, কাঠামো, সীমাবদ্ধতা কিম্বা ক্ষমতার উপর ভিত্তি করেছেন। জি. মন্টাগো মরিস চল্লিশের দশকে স্থানীয় সরকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে স্থানীয় সরকারের ধারণাকে দু'ভাগে বিভক্ত করে স্থানীয় সরকারের ধারণা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। প্রথমতঃ স্থানীয় সরকার হলো কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত সংস্থাসমূহ, যারা সরকারের এজেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং তাঁদের দায়িত্বাবলীর জন্য জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ থাকে। দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় সরকার

---

*অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ

কোন এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত সরকার। স্থানীয় সরকারসমূহ জাতীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে ক্রিয়াশীল থাকে। সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার হতে স্থানীয় সরকারগুলিকে কিছু কিছু দায়িত্বাবলী পালনের জন্য বলা হয়; যা কিনা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে এসব প্রতিষ্ঠান কার্যকরী করতে পারে। জি, মন্টাগো মরিসের মতে যদিও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের এখতিয়ার ও দায়িত্বাবলীর মধ্যে তারতম্য আছে তবুও পদ্ধতি দুটি মোটামুটি পাশাপাশিভাবে চালু আছে।

উপরের আলোচনার আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকারসমূহের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ঃ

১) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যা বৈধ কর্তৃত্বের অধীন।

২) স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হলো স্থানীয় জনগণ দ্বারা নির্বাচিত কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার জন্য গঠিত একটি সংস্থা।

৩) স্থানীয় এ সরকার ব্যবস্থা হলো কর ধার্যকরণ ও প্রশাসন পরিচালনার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত একটি সংগঠন যার নিজস্ব কার্যাবলী ব্যবস্থাপনা করার অধিকার থাকে।

৪) এ সরকার প্রকৃতভাবে জাতীয় সরকারের নিকট দায়বদ্ধ এবং অধীনস্থ থেকে কাজ করে যায়।

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা মূলত দু'ভাগে বিকশিত হয়েছে।

(ক) গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (অর্থাৎ যেসব স্থানীয় সরকার গ্রামীণ পর্যায়ে কার্যাবলী সম্পাদন করে।)

(খ) শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা (অর্থাৎ পৌরসভা এবং সিটি কর্পোরেশনসমূহ)

গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা হিসাবে যেসব স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব এদেশে পাওয়া যায় সেগুলো সময়ের বিবর্তন ধারায় বিকশিত হয়ে আজকের রূপ লাভ করেছে। এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হল ঃ

(ক) গ্রাম সরকার (খ) ইউনিয়ন পরিষদ (গ) উপজেলা পরিষদ ও (ঘ) জেলা পরিষদ।

(১) অপরদিকে শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে সব স্থানীয় সরকার অস্তিত্বশীল সেগুলো হলোঃ (ক) পৌরসভা ও (খ) সিটি কর্পোরেশন। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে জেলা পরিষদ পৌর কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকাশের পটভূমি

ঐতিহাসিকগণ দেখিয়েছেন যে এ উপমহাদেশে গোত্রভিত্তিক বা বর্ণভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীতে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হওয়ার প্রবনতা ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণে দেখা যায়-গ্রামীণ ভূস্বামীর সাথে কর্তৃপক্ষের গোলমাল বা মতবিরোধ মিটানোর জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হয়।

পরবর্তীকালে সময়ের বিবর্তন ধারায় গ্রাম পঞ্চায়েত ব্যবস্থা বিকশিত হয়। এই ধরনের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পূর্বভারতে বর্ণপ্রথা শিথিল থাকায় সেই অঞ্চলে ততটা বিকশিত হয়নি এবং উলটাভাবে এ অঞ্চলে দুর্বল ধরনের গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল।

উপমহাদেশে মুঘল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে অনেকাংশে সুসংবদ্ধ শাসন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটা শুরু হয়। মুঘলরা সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ভারতবর্ষকে মৌলিক কয়েকটি সুবায় বিভক্ত করেন যা মূলত প্রদেশ হিসাবে পরিচিতি অর্জন করে। মুঘলদের প্রশাসনিক বিভাজন প্রক্রিয়ায় এ অঞ্চল বাংলা হিসাবে অভিহিত হয় এবং বাংলা প্রদেশ হিসাবে পরিচিতি অর্জন করে। এরূপ প্রদেশ বা সুবার পরিচালকগণ সুবাদার নামে অভিহিত হতেন। এই সুবা অর্থাৎ প্রদেশগুলি আবার কয়েকটি সরকারে বিভক্ত হতো। আর সরকারসমূহ আবার ফৌজদারদের দ্বারা পরিচালিত হত। প্রতিটি সরকার আবার কতিপয় পরগনায় বিভক্ত হয়েছিল। এসব পরগনা মূলত শিকদারদের দ্বারা পরিচালিত হত। একইভাবে প্রতিটি পরগনা আবার কতিপয় থানায় বিভক্ত করা হয়েছিল প্রশাসন ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে। আর এসময় থানাগুলি পরিচালনা করতেন থানাদার উপাধিধারীগণ। প্রতিটি থানাকে আবার কতিপয় মৌজায় বিভক্ত করা হয়েছিল। আর এসব মৌজার দেখাশোনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন চৌকিদার উপধীধারী ব্যক্তিগণ। মৌজার আওতাভুক্ত এলাকাগুলি কতিপয় মহল্লায় বিভক্ত করা হত। এসব মহল্লা মোহাল্লীকগণ দ্বারা পরিচালিত হত। এ মোহাল্লিকগণ কালের বিবর্তনে 'মল্লিক' উপাধী দ্বারা ভূষিত হয়েছিলেন।

মুঘল শাসকগণের দূরদর্শি পদক্ষেপের ফলে এ উপমহাদেশের মানুষ সর্বপ্রথম পৌর (অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল) প্রশাসন ব্যবস্থার সাথে পরিচিতি লাভের সুযোগ পায়। তাদের এরূপ শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিকাশ প্রক্রিয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ স্থানীয়

সরকার ব্যবস্থার বিকাশে সহায়তার ছাপ পাওয়া যায়। মুঘলরা যেহেতু প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং সময়ের তুলনায় আধুনিক শাসন ব্যবস্থায় পারাদর্শী ছিলেন সেহেতু তারা শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রামীণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্বকীয় ধারায় বিকশিত করার সুযোগ প্রদান করেছিলেন যথাযথভাবেই। গ্রাম প্রধান (হেড ম্যান) দের তত্ত্বাবধানে পাল এবং সেন বংশীয় শাসনামলে যেভাসে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকশিত হচ্ছিল সেভাবেই পঞ্চায়েত বা গ্রামীণ সভাসমূহকে মুঘলরা বিকশিত হওয়ার সুযোগ প্রদান করেন। প্রকৃত অর্থে সে সময় গ্রামগুলি মৌলিক প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে বিকশিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মুঘল আমলে সর্বপ্রথম শহুরে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল। মুঘল শাসনামলে গ্রামীণ প্রশাসনের পাশাপাশি কতোয়াল নিয়োগ করে মিউনিসিপ্যাল কার্যাদি ও পৌরসভার কার্যাদি যৌথভাবে সম্পান্ন করা হত। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন করে মীর মহল্লাহ নিযুক্ত হতেন। সে সময়ে প্রতিটি শহরে সরকারি খরচে খাদ্য ও আশ্রয়ের ব্যবস্থাসহ একটা করে খানকাহ স্থাপন করা হয়েছিল। বিচার কার্য পরিচালনার জন্য কাজী নিয়োজিত হতেন।

এতদঞ্চলে আধুনিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোগত বিকাশ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল মূলত ব্রিটিশ আমলে। অষ্টাদশ শতকে প্রবর্তিত আইনসমূহ আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ১৮৪২ সালের বেঙ্গল এ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে পৌর প্রতিষ্ঠান গঠনের পথ প্রশস্ত হয়। তবে এরও প্রায় পাঁচ দশক পূর্বে ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশকৃত একটি চার্টারের মাধ্যমে কলকাতা, মাদ্রাজ, মুম্বাই (তৎকালীন বোম্বাই) শহরে পৌর প্রশাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটানো হয়েছিল। এই চার্টারের বলে জাষ্টিস অব পিস নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় এবং শহর এলাকার বাসিন্দাদের ঘর বাড়ীর উপর কর আরোপের ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

সে সাথে চৌকিদার এবং ঝাড়ুদার নিয়োগের জন্য তখন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। কোন শহরে বসবাসকারীর বাড়ির (খানা) প্রধানের মধ্য হতে দুই তৃতীয়াংশ বাড়ীর প্রধানদের আয়োজনের মাধ্যমে টাউন কমিটি গঠন করা হত। কিন্তু এই বিধানটি তৎকালীন জনসাধারণের মধ্যে তেমন উৎসাহ জাগ্রত করতে পারেনি। ফলে ১৮৫০ সালে যে আইন পাশ হয় তাতে জনসাধারণের আবেদনের উপর ভিত্তি করে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা গঠনের উদ্যোগ ছেড়ে দেয়া হয়। ব্রিটিশ আমলে প্রণীত অন্যান্য আইনের ন্যায় এ আইনটি জনগণের কাছে তেমন গ্রহণযোগ্যতা আনতে পারেনি। এ আইন বলে গুটিকতক শহরে মিউনিসিপ্যালিটি কার্যকর হয়েছিল। এই উপমহাদেশে প্রথম যে পৌরসভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম হল নাসিরাবাদ।

এদিকে ১৮৫৬ সালে টাউন পুলিশ এ্যাক্ট পাশ হয়। এ আইনে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে শহুরে পঞ্চায়েতের উপর বাড়ী ঘরের উপর সর্বোচ্চ ৫% হারে কর আরোপের ক্ষমতা দেয়া হয়। এ করের মাধ্যমে যে টাকা আদায় হত তা প্রথমে শহুরে চৌকিদারদের প্রতিপালনের জন্য ব্যয় করা হত এবং অবশিষ্ট অংশ কনজারভেন্সি, শহর উন্নয়ন, রাস্তার বাতি প্রদান ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা যেত।

১৮৬৪ সালে বেঙ্গল কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাক্ট পাশ করে। এই আইনটি অপেক্ষাকৃত বড় শহরের জন্য প্রযোজ্য ছিল। এই আইনের অধীনে সরকার কমপক্ষে সাত জন মনোনীত নগরবাসীকে নিয়ে একটি টাউন কমিটি গঠন করতে পারতেন। এই সাতজনের মধ্যে ডিভিশনাল কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থাকতেন। পরে পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকেও অর্ন্তভুক্ত করে নেয়া হয়। আয়ের প্রধান উৎস বাড়ীঘরের উপর কর ধার্য করা ছিল যা বাড়ীঘরের মোট মূল্যের শতকরা সাড়ে পাঁচ ভাগ পর্যন্ত হতে পারত। এ ছাড়া যানবাহনের উপরও কর আরোপের ক্ষমতা ছিল। নগর চৌকিদার প্রতিপালন ছিল প্রধান দায়িত্ব। অবশিষ্ট অর্থ রাস্তা, কনজারভেন্সী, বিপজ্জনক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ, টীকাদান, হাসপাতাল প্রভৃতি খাতে সাধারণত ব্যয় হতো।

ডিস্ট্রিক্ট টাউন এ্যাক্ট, ১৮৮৬ এর অধীনে আরও অধিক সংখ্যক শহরকে পৌর প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনা সম্ভব হয়। এই আইনে কমপক্ষে পাঁচ জনকে নিয়ে একটি টাউন কমিটি গঠনের ব্যবস্থা ছিল যার এক তৃতীয়াংশ সরকারি কর্মকর্তা হতেন। কমিটি প্রতি বছর একজন চেয়ারম্যান নিয়োগ করতেন। আয়ের প্রধান উৎস ছিল হোল্ডিং ট্যাক্স, এই ট্যাক্স মাসে সাত টাকার বেশী হতে পারত না। এর দায়িত্ব ১৮৬৪ সালের আইনের অনুরূপ ছিল। সে সময়ে অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহরে মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। পুলিশের পিছনেই মিউনিসিপ্যাল তহবিলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ব্যয় হয়ে যেত। ফলে জনকল্যাণ বা পৌর সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি তেমন ভূমিকা পালন করতে পারতো না।

১৯৭৩ সালের একটি আইনের মাধ্যমে ১৮৬৪ সালের আইনের আওতাভুক্ত শহরগুলিতে সর্বপ্রথম দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। বেতনভোগী একজন নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যানের ব্যবস্থা করে প্রতিনিধিত্বশীল স্থানীয় সরকার শহর পর্যায়ে বিকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়।

১৮৭৬ সালের আইন প্রণয়নের ফল উপরোক্ত চারটি আইন বাতিল হয়ে যায় এবং কনসোলিডেটেড আইন প্রণীত হয়। (এ্যাক্ট IV, ১৮৭৬) এই আইন দ্বারা পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে চার ধরনের কাঠামোর আওতায় আনা হয়। সেগুলি হলো ঃ

(১) ১৮৬৪ সালের আইনের অধীনে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রথম শ্রেণী বলা হয়।

(২) ১৮৫৮ সালের আইনের অধীনে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি কে দ্বিতীয় শ্রেণী বলা হয়।

(৩) ১৮৫৬ সালের আইনের অধীনে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইউনিয়ন বলা হয়।

(৪) ১৮৫০ সালের আইনের অধীনে গঠিত পৌর প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্টেশন বলা হয়।

কমিশনার তখন সরকার কর্তৃক মনোনীত হতেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা অফিসার, মেডিকেল অফিসার পদাধিকার বলে সদস্য থাকতেন। চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ করদাতারা লিখিতভাবে আবেদন করলে কমিশনারদের নির্বাচিত করা যেত।

১৯৭৮ সালে প্রণীত এক আইনের মাধ্যমে সকল প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটিকে সেনিটেশন বা লেট্রিন পরিষ্কারের দায়িত্ব দেয়া হয় এবং এজন্য কর আরোপের ক্ষমতা দেয়া হয়। ১৮৮০ সালে প্রণীত এক আইনের মাধ্যমে টিকা প্রদান মিউনিসিপ্যালিটির জন্য একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব করে দেয়া হয়। অর্থাৎ সেনিটেশন এবং জনস্বাস্থ্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।

লর্ড রিপন স্থানীয় সরকারের বিকাশের ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন ও জনগণকে স্থানীয় সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট করার পক্ষপাতি ছিলেন। তার আমলে পূর্বের সকল আইনকে একত্রিত করে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৮৮৪ পাস হয়। এই আইনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির পার্থক্য তুলে দেয়া হয় এবং ইউনিয়ন ও স্টেশনসমূহকে মিউনিসিপ্যালিটির মর্যাদা থেকে বাদ দেয়া হয়। নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান এবং দুই তৃতীয়াংশ নির্বাচিত সদস্যদের ব্যবস্থা রাখা হয়। মিউনিসিপ্যালিটির জন্য বেশ কয়েকটি আয়ের উৎস নির্ধারিত হয়। যেমন, হোল্ডিং ট্যাক্স, গাড়ী ঘোড়া ও পশুর উপর কর, গাড়ী রেজিস্ট্রেশন ফি, ফেরী, ব্রীজ ও পাকা রাস্তার জন্য টোল, ওয়াটার রেট, লাইটিং রেট এবং ল্যাট্রিন পরিস্কারের জন্য ফি। এর পরবর্তী বছরগুলিতে কিছু কিছু সংশোধনী আইন পাশ হয়। ১৮৯৬ সালের এ্যাক্ট এর মাধ্যমে মিউনিসিপ্যালিটির সেবামূলক দায়িত্ব আরও বাড়ানো হয়। যেমন, উদ্যান, লাইব্রেরী ও মাতৃকেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি। অর্থাৎ আধুনিক কল্যাণধর্মী পৌর প্রশাসন বিকাশের ব্যবস্থা লর্ড রিপন এর সময়ে করা হয়।

লর্ড রিপন কর্তৃক প্রণীত ১৮৮৪ সালের আইন ও পরবর্তী সংশোধনীসমূহকে একত্র করে বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৯৩২ পাশ হয়। এটি একটি উন্নত ধরনের আইন ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, ভারত বিভাগ ইত্যাদির কারণে মিউনিসিপ্যালিটির প্রশাসন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার তেমন কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বা উন্নয়ন বৃটিশ আমলের শেষদিকে ঘটানো যায়নি।

ভারত বিভাগের সময় পূর্ববাংলায় ৫২টি ও সিলেট জেলায় চারটি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড অবস্থিত ছিল। এই সকল বোর্ডে তিন চতুর্থাংশ নির্বাচিত ও এক চতুর্থাংশ মনোনীত সদস্য থাকতেন। সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সংশোধনী আনা হয় যে, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড সম্পূর্ণ নির্বাচিত সংস্থা হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার আগেই দেশে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়।

বেসিক ডেমোক্রেসী অর্ডার, ১৯৫৯ অধিনে গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থা ছাড়াও ইউনিয়ন ও টাউন কমিটি গঠন করা হয়। ৫৬টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের মধ্যে ২৮টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে (যার জনসংখ্যা ১৯৫৯ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী ১৫০০ অথবা তার নীচে ছিল) টাউন কমিটি গঠন করা হয়। অবশিষ্ট ২৮টি মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে মিউনিসিপ্যাল এ্যার্ডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্সের অধীনে মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করা হয়। বড় শহর এলাকায় ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্যদের মত ইউনিয়ন কমিটি ও টাউন কমিটির সদস্যরাও ইলেক্টোরাল কলেজের সদস্য ছিলেন। ইউনিয়ন ও টাউন কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন। ভাইস চেয়ারম্যানের পদ ছিল না। মিউনিসিপ্যাল কমিটি ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও সমান সংখ্যক সরকারি ও মনোনীত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হত। অধিকাংশ মিউনিসিপ্যাল কমিটিতে পার্ট চেয়ারম্যান থাকতেন। তারা এসডিও অথবা এডিসি হতেন। মিউনিসিপ্যাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স এর মধ্যে মিউনিসিপ্যাল কমিটির দীর্ঘ তালিকা দেয়া আছে। কর আরোপের জন্য ২৬টি উৎস নির্ধারিত করা হয়।

বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্ট অর্ডার নং ৭-এর মাধ্যমে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বাতিল করা হয় এবং তার পরিবর্তে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। পৌর সংস্থাগুলির নাম নিম্নরূপভাবে পরিবর্তন করা হয়।

ইউনিয়ন কমিটি	-	নগর পঞ্চায়েত
টাউন কমিটি	-	শহর কমিটি
মিউনিসিপ্যাল কমিটি	-	পৌরসভা

১৯৭৭ সালে পৌরসভা অর্ডিন্যান্স জারী হয়। এ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কোন ভাইস চেয়ারম্যানের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কমিশনারের সংখ্যা নির্বাচনী এলাকার উপর নির্ভরশীল। তবে ন্যূনতম নয়জন কমিশনার একটি পৌরসভাতে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিটি পৌরসভার জন্য তিনজন মহিলা সদস্য নির্ধারিত করা হয়েছে। বর্তমানে পৌরসভার সংখ্যা হল ২৮৯। সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশ মোট ৬টি বড় শহরে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেটে মোট ৬টি সিটি কর্পোরেশন আছে।

পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭

বাংলাদেশে বর্তমানে যে সব পৌরসভা বিদ্যমান রয়েছে তাদের গঠন মূলত এ অধ্যাদেশ দ্বারা হয়েছে। এ অধ্যাদেশ বলে পৌরসভা এবং শহুরে সুবিধা প্রদান সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিধান ও নীতিমালার সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তাছাড়া পৌরসভার কর্মচারীদের নিয়োগ, বেতন ইত্যাদি নীতিমালার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। পৌরসভা গঠনের প্রাক্কালে সরকার কর্তৃক একটি শহর এলাকা গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যম ঘোষণা করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর একটি শহর এলাকাকে পৌরসভা ঘোষণা করার প্রক্রিয়া এ আইনের আওতায় বর্ণিত হয়েছে।

পৌরসভা গঠন

একটি পৌরসভা সাধারণত গঠিত হবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ঃ

ক) একজন চেয়ারম্যান

খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সংখ্যক কমিশনারবৃন্দ

গ) ৩ জন মনোনীত মহিলা কমিশনার

এই প্রতিনিধিবৃন্দ পৌরসভা অর্ডিন্যান্সে বর্ণিত প্রক্রিয়া মোতাবেক সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে পৌরসভা পরিচালনা করবেন।

পৌরসভার মেয়াদ

পৌরসভা গঠিত হওয়ার পরে এবং চেয়ারম্যান ও কমিশনারের নাম গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার ৩০ দিনে মধ্যে প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ৫ বৎসর মেয়াদের হবে।

চেয়ারম্যান ও কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা

ক) বাংলাদেশের নাগরিকত্ব

খ) ন্যূনপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক

গ) ভোটার তালিকায় নাম থাকা

চেয়ারম্যান অথবা কমিশনার হওয়ার অযোগ্যতা

ক) কোন যোগ্য আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হলে

খ) দেউলিয়া হিসেবে ঘোষিত হলে

গ) কোন ফৌজদারী আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে

ঘ) প্রজাতন্ত্রে কোন নিয়মিত চাকরি করলে বা কোন প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্বকারী পদে নিয়োজিত থাকলে।

ঙ) কোন লাভজনক ব্যবসা বা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থাকলে যা কিনা পৌরসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

চেয়ারম্যান বা কমিশনারের অপসারণ

ক) পরপর ৩টি পরিষদ সভায় যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া অনুপস্থিত থাকলে

খ) কোন দুর্নীতি বা নৈতিক স্খলন বা ফৌজদারী অপরাধের কারণে সাজাপ্রাপ্ত হলে

গ) তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হলে বা দায়িত্ব পালন করতে না চাইলে

ঘ) পৌরসভার সম্পত্তি আত্মসাত অথবা অর্থ সম্পদের ক্ষতিসাধন অথবা সম্পত্তির অপব্যবহার করলে।

এ বিধিতে পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং কমিশনারের অফিস কিভাবে শূন্য হবে এবং সাময়িক শূন্যতা ইত্যাদি কারণে চেয়ারম্যান নির্বাচন প্রক্রিয়া অতঃপর বিশেষ অবস্থায় অর্থাৎ পৌরসভা ভেঙ্গে দিলে অথবা পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব না হলে সরকার সাধারণত প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে পৌরসভার প্রশাসক নিয়োগ করতে পারবেন বলে বিধিতে উল্লেখ রয়েছে।

এই অধ্যাদেশ বলে কোন পল্লী এলাকাকে শহর এলাকা ঘোষণার মাধ্যমে পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে ঐ এলাকার ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্য পৌরসভার কমিশনার হিসাবে গণ্য হবেন।

পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদন

পৌরসভার সকল কাজ নির্ধারিত পদ্ধতিতে সভায় অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক, বা সদস্য বা কর্মকর্তা/কর্মচারী দ্বারা নির্বাহ হবে। পৌরসভার সকল সভায় চেয়ারম্যান বা তার অনুপস্থিতিতে কমিশনারদের দ্বারা নির্বাচিত প্যানেল চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করবেন। পৌরসভার প্রতিটি সভার কার্যবিবরণী একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে। পৌরসভার অধ্যাদেশে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য এর কমিশনারদের এবং প্রয়োজন বোধে কো-অফট্ সদস্যদের সমন্বয়ে কমিটি বা উপ-কমিটি গঠন করা যাবে।

পৌরসভার কর্মকর্তা এবং কর্মচারী

কর্তৃপক্ষ একটি পৌরসভার জন্য নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে একজন সচিব এবং এক বা একাধিক মুখ্য কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন। তাছাড়া প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারবেন। সরকার প্রয়োজনমত যে সব পৌরসভার জন্য বিবেচনা করবেন সে সব পৌরসভার জন্য একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারবেন। কোন পৌরসভার জন্য ১জন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তার অধস্তন হিসাবে বিবেচিত হবেন। উক্ত নির্বাহী কর্মকর্তা পৌরসভার সমস্ত সভায় উপস্থিত থেকে সভায় মতামত প্রদান করতে পারবেন এবং কোন বিবরণ পেশ করতে পারবেন কিন্তু কোন ভোটদান করতে পারবেন না। পৌরসভার কর্মচারীদের চাকরির শর্তাবলী নির্ধারণের জন্য সরকার পৃথক বিধিমালা প্রণয়ন করবেন এবং তাদের ভবিষ্যত তহবিল গঠন এবং পরিচালনার জন্য বিধান প্রণয়ন করবেন।

পৌরসভার তহবিল এবং সম্পত্তি

প্রতিটি পৌরসভার তহবিল গঠিত হবে নিম্নোক্তভাবে ঃ

ক) পৌরসভা গঠিত হওয়ার তারিখ পর্যন্ত পূর্ববর্তী পৌরসভার সম্পত্তির উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্তি

খ) অত্র অধ্যাদেশের অধীন সকল কর, রেটস, টোলস, ফিস, এবং অন্যান্য চার্য

গ) পৌরসভার উপর ন্যস্ত অথবা তার দ্বারা পরিচালিত সম্পত্তির সকল ভাড়ার মুনাফা

ঘ) এই অধ্যাদেশে অথবা প্রচলিত দেশের অন্য যে কোন আইনের অধীনে সম্পাদিত কাজের দরুন প্রাপ্ত অর্থ

ঙ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান বা চাঁদা

চ) পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় ন্যস্ত সকল অছি হতে প্রাপ্ত অর্থ

ছ) সরকার ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত সকল অনুদান

জ) বিনিয়োগ হতে অর্জিত সকল মুনাফা

ঝ) সরকার কর্তৃক পৌরসভার এখতিয়ারে ন্যস্ত অন্যান্য স্থানে উপার্জিত অর্থ।

উপরোক্তভাবে গঠিত সমস্ত তহবিলসহ সমুদয় আয় নিয়ে গঠিত তহবিলের সকল অর্থ কোন সরকারি ট্রেজারীর কার্যসম্পাদনকারী ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। নির্ধারিত পন্থায় পৌরসভা বিনিয়োগ করতে পারবে। পৌরসভা স্বীয় পরিকল্পনা মোতাবেক কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে একটি পৃথক তহবিল গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

পৌর তহবিল ব্যয়ের খাতসমূহ

প্রথমত ঃ পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি পরিশোধ;

দ্বিতীয়ত ঃ অত্র অধ্যাদেশের আওতায় পৌরসভার উপর ধার্যকৃত ব্যয় নির্বাহ;

তৃতীয়ত ঃ অত্র অধ্যাদেশের অধীন কিংবা সমকালে প্রচলিত দেশের আইনের অধীনে পৌরসভার উপর আরোপিত অন্য কোন দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যয় নির্বাহ;

চতুর্থত ঃ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন স্বাপেক্ষে পৌরসভা ঘোষিত ব্যয় যা কিনা পৌরসভা তহবিলের উপর আরোপিত ব্যয় বলে গণ্য হবে; এবং

পঞ্চমত ঃ সরকার কর্তৃক পৌরসভার উপর আরোপিত ব্যয় নির্বাহ।

বাজেট

প্রতিটি পৌরসভা প্রতি অর্থ বছর শুরুর প্রাক্কালে পূর্ব নির্ধারিত পন্থায় উক্ত বছরের জন্য তার আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত হিসাবের বিবরণ প্রণয়ন করবে; যা বাজেট নামে অভিহিত হবে। এ বাজেট প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করলে তা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে অনুমোদিত বাজেট হিসাবে গণ্য হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ বাজেট প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সংশোধন করতে পারবেন। এই বাজেট প্রণয়ন কাজটি নির্ধারিত ফরমে সম্পাদন করতে হয়।

পৌরসভার করারোপ

সরকারের পূর্ব অনুমোদন নিয়ে প্রথম তপসীল নির্ধারিত ও বর্ণিত কর রেট ও ফিসমূহের যে কোন একটি অথবা সবগুলো আরোপ করা যায়। তবে এজন্য নতুন করারোপের তারিখ সম্বন্ধে পূর্বেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কর আদায় কার্য অধ্যাদেশ বর্ণিত নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির জন্য যে হারে কর, রেট বা ফি ধার্য বা মূল্যায়ন করা হবে বা কর ইত্যাদির দায় দেনা নিরূপণ করা হবে তা বিধি মোতাবেক এসেসমেন্ট প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন করতে হবে। পৌরসভা কর্তৃক ধার্যকৃত সকল কর, রেট ও অন্যান্য চার্জ নির্দিষ্ট বিধি বা বিধিসমূহে বর্ণিত ব্যবস্থা অনুযায়ী আরোপিত, নিরূপিত বা পরিচালিত হবে।

পৌরসভার কার্যাবলী

এই অধ্যাদেশের বিরাট অংশ জুড়ে পৌরসভার কার্যাবলী আলোচিত হয়েছে। পৌরসভার কার্যাবলী নামক অংশটি মোট ১২টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে পৌরসভার কার্যাবলীকে মোট ১২টি মৌলিক বিভাগ হিসাবে বিভক্ত করা হয়েছে। এগুলি হলো ঃ-

১. জনস্বাস্থ্য

সমস্ত পৌর এলাকার স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা পৌরসভার অন্যতম প্রধান কাজ। এজন্য পৌরসভা (ক) বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে কোন ইমারত বা জমির মালিককে তা সঠিক অবস্থায় রাখতে, স্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখতে ও যথাযথভাবে চুনকাম/রং করে পরিচ্ছন্ন করে রাখতে নির্দেশ দিতে পারবে। পৌরসভা সকল পথ, গণ শৌচাগার, ড্রেন ও পৌরসভার উপরে ন্যস্ত সকল ইমারত ও জমি হতে আবর্জনাদি অপসারণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিবে। পৌরসভা প্রয়োজনানুযায়ী এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে মহিলা ও পুরুষদের জন্য পৃথক পৃথক পায়খানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে এবং যথাযথভাবে ব্যবহার উপাযোগী রাখবে ও নিয়মিতভাবে পরিস্কারের ব্যবস্থা নিবে। তাছাড়া কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন পায়খানা শৌচাগার ইত্যাদি যথাস্থানে রাখার জন্য, নির্মাণের জন্য, আপত্তিকর বা ক্ষতিকর পায়খানা বা শৌচাগার অপসারণের জন্য নোটিশ প্রদান করবে এবং এরূপ জন্ম-মৃত্যু ও বিবাহের খতিয়ান পৌরসভা সংরক্ষণ করবে এবং জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট পৌর কর্তৃপক্ষকে সরবরাহ করবে। পৌরসভা বিধি এবং উপ-বিধি বা কর্তৃপক্ষ প্রণীত আইন অনুযায়ী সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেবে এবং সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ থেকে রক্ষা করবে। এজন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা করবে এবং প্রকল্প বাস্তাবায়ন করবে। সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক পৌরসভা প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাতৃসদন, শিশুকল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করবে ও পরিচালনা করবে। ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। তাছাড়া পৌরসভা জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রদান ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের চেষ্টা করবে। পৌরসভা সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে। পৌরসভা এসব হাসপাতালের সুনির্দিষ্ট পরিমাণ ও মান সম্পন্ন ভেষজ, ঔষধ, যন্ত্রপাতি, এপারেটাস, আনুসংগিক মেশিন ও আসবাবপত্র সরবরাহ করবে। তাছাড়াও ফাস্ট এইড কেন্দ্রও ভ্রাম্যমান মেডিকেল এইড ইউনিট এর ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা শিক্ষা উন্নয়ন, চিকিৎসা সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান প্রদান ও বিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েদের স্বাস্থ্য পরিদর্শন করার ব্যবস্থা পৌরসভা করবে।

২. পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

পৌরসভা সর্বসাধারণের জন্য ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পানির সংরক্ষণাগার নির্মাণ করতঃ পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা নিবে। পৌরসভার মধ্যে সকল ব্যক্তিগত পানি সরবরাহের উৎস পৌরসভা কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ এবং বিধিসম্মতভাবে পরিদর্শন ব্যতিরেকে অর্থাৎ পৌরসভার মঞ্জুরী ছাড়া কোন নতুন কুপ, পানির পাম্প বা

অন্য কোনরূপ পানির উৎস খনন বা নির্মাণ করা যাবে না। তাছাড়াও পৌরসভা পানীয়জলের ব্যক্তিগত অভাব অথবা পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উৎস সর্বদা খনন অথবা আবর্জনামুক্ত এবং সংক্রামকমুক্ত রাখার ব্যবস্থার জন্য নির্দেশনা প্রদান করবে। জনগণের সুবিধার্থে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে জীবনযাপন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৌরসভায় প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত মাত্রায় গণড্রেনেজ এর ব্যবস্থা করবে এবং সময়ে সময়ে ড্রেনেজগুলোকে পরিদর্শন করতঃ পরিষ্কারকরণ ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বন্ধকরণের নির্দেশ প্রদান করবে। এজন্য পৌরসভা ড্রেনেজ স্কীমের মাধ্যমে কোন ইমারত এবং ভূমির মালিককে ইমারত সংলগ্ন বা ভূমি সংলগ্ন সড়কে ড্রেন নির্মাণের জন্য অপসারণের জন্য অথবা স্থান পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে পারবে। জনগণের গোসল, কাপড় ধৌতকরণ অথবা স্থান শুকানোর জন্য উপযুক্ত স্থানে পৌরসভা এপার্ট স্থাপন করবে এবং উক্ত স্থানসমূহ কোন এলাকার লোক কোন সময়ে ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করে দেবে। পৌরসভা এলাকার মধ্যে অবস্থিত পানির উৎস যেমন ঝর্ণা, নদী, পুকুর দিঘী ইত্যাদি অথবা এগুলির কোন অংশ পৌরসভা সরকারি জলাধার (পাবলিক ওয়াটার সোর্স) হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে। এই ধরনের পাবলিক ওয়াটার সোর্সের জলাধারের ক্ষেত্রে জীবন রক্ষা কাজে ব্যবহৃত প্রযোজ্য সুবিধা প্রদান এবং সেরূপ আয়োজন করে জলাধারসমূহকে দূষণমুক্ত রাখার দায়িত্ব পৌরসভার। এসব জলাধারে নিয়ন্ত্রিতভাবে জনসাধারণের জন্য খেয়াপারের উদ্দেশ্যে নৌকা ও অন্যান্য নৌযানের লাইসেন্স প্রদান পৌরসভা করবে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ফি ধার্য করবে। এরূপ জলাধারকে মৎস্য চাষের জন্য ঘোষণা করা এবং মৎস্য চাষপূর্বক মৎস্য আহরণের অধিকার পৌরসভার উপর ন্যস্ত।

৩. খাদ্য এবং পানীয় বিষয়ক কার্যাবলী

পৌরসভার প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কোন প্রাসাদ বা আঙ্গিনায় নির্ধারিত খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য উৎপাদন, বিক্রি, প্রস্তুতকরণ অথবা বিক্রির জন্য প্রদর্শন নিষিদ্ধ। সমস্ত ধরনের খাদ্য এবং পানীয় পৌরসভার মধ্যে ফেরী করে বিক্রি করা, খাদ্য হিসাবে কোন পশু, হাঁস-মুরগী অথবা মাছ বিক্রির জন্য আনার পর তা রোগাক্রান্ত এবং পানীয় দ্রব্য বিষাক্ত বা রোগাক্রান্ত হিসাবে বিবেচিত হলে তা জব্দ করা এবং অপসারণের ব্যবস্থা করা পৌরসভার অন্যতম দায়িত্ব। দুগ্ধ বিক্রির জন্য বা সরবরাহের জন্য গাভী পালন আমদানী বা রপ্তানী দুধ বিক্রি অথবা মাখন, ঘি অথবা অন্য কোন দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরীর জন্য আঙ্গিনায় ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণ পৌরসভা করবে। তাছাড়া জনসাধারণের জন্য বিশুদ্ধ দুগ্ধ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য পৌরসভা গোয়ালাদের জন্য কলোনী প্রতিষ্ঠা বা পর্যাপ্ত গাভী পালনের ব্যবস্থার লক্ষ্যে দুগ্ধ সরবরাহ স্কীম গ্রহণ করবে। পৌরসভার বাজার প্রতিষ্ঠা অথবা সরকারি বাজার

প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা বরাদ্দ দিতে পারবে যাতে খাদ্য, পানীয় ও পশু বিক্রি ও বিপণের ব্যবস্থাও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা সংরক্ষিত থাকবে। এধরনের পণ্য প্রদর্শন, পরিবহন ও বিক্রির জন্য পৌরসভা বিভিন্ন রকম কর বা ফি ধার্য করতে পারবে। তাছাড়া পৌরসভা বেসরকারি পণ্য দ্রব্য বিক্রি বিপণন ও পরিবহনের জন্য লাইসেন্স প্রদানের মাধ্যমে বেসরকারি বিপণন ও নিয়ন্ত্রণ করবে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত উপায়ে গোস্ত বিক্রির জন্য কসাইখানার স্থান বা স্থানসমূহ নির্দিষ্ট করে কসাইখানা পরিচালনা করবে।

৪. পশু সম্পদ বিষয়ক কার্যাবলী

গবাদিপশু পালন যথাযথভাবে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৌরসভা পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী স্থাপন ও পরিচালনা করবে। পৌরসভা পশু সংক্রামক রোগের সংজ্ঞা প্রদান করতঃ তা প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এজন্য বাধ্যতামূলক টিকা প্রদান এবং রোগদমন কর্মসূচি পালন করবে। জনবহুল এলাকায় বেওয়ারিশভাবে পশুর ঘুরে বেড়ানো নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গবাদি পশু আটক করে রাখার জন্য খোয়াড় প্রতিষ্ঠা করবে। পৌরসভা নির্দেশিত কোন সড়কে অথবা স্থানে কোন পশুকে খুঁটি দিয়ে বেঁধে রাখলে তা জব্দ করবে। পৌরসভা নিজে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে গবাদি পশুর ফার্ম, হাঁস-মুরগীর খামার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিতে পারবে। কোন পশু বিক্রি বা বিক্রি রেজিস্ট্রেশন এবং পশু সম্পদ উন্নয়সহ কোন ধরনের পশু এবং কোন অবস্থাতেই কোন পশু বিপজ্জনক তা নির্ধারণ করে দেয়া এবং বিপজ্জনক পশু ধ্বংস ও অপসারণের কাজ পৌরসভা করবে। পৌরসভা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চিড়িয়াখানা প্রতিষ্ঠা এবং গবাদি পশু ইত্যাদি প্রদর্শনের লক্ষ্যে মেলার ব্যবস্থা করতে পারবে। কোন পশু মারা গেলে মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তা অপসারণের ব্যবস্থা পৌরসভা গ্রহণ করবে।

৫. নগর পরিকল্পনা

পৌরসভার জন্য একটি মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে, যাতে পৌরসভার একটি জরীপ থাকবে। এতে তার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, এলাকার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও নির্ধারিত স্থান উন্নয়ন সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ ইত্যাদি বর্ণিত হবে। কোন একটি এলাকা উন্নয়নের জন্য পৌরসভার বিশেষ স্কীম নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানকে প্লটে বিভক্ত করে রাস্তা, ড্রেন, খোলা জায়গা, ইত্যাদির বিধান করে প্লটের মূল্য নির্ধারণপূর্বক তার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রচেষ্টা করতে পারবে।

৬. ইমারত নিয়ন্ত্রণ

কোন ব্যক্তির ইমারতের অংশ অনুমোদন এবং ইমারতের নকশা মঞ্জুর করার দায়িত্ব এককভাবে পৌরসভা পালন করে থাকে। তাছাড়া কোন ইমারত পুনর্নির্মাণ, ভবন নির্মাণ পৌরসভার অনুমোদনক্রমে করতে হয়। কোন ভবন নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করার পরে পৌরসভা উক্ত ভবন নির্মাণের বা পুনর্নির্মাণের সমাপ্তির প্রতিবেদন পৌরসভায় দাখিল করতে হবে। এসব ইমারত পরিদর্শনপূর্বক পৌরসভা ইমারতটি যথাযথ পরিকল্পনা বা বাই-ল অনুযায়ী তৈরী হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করবে। পৌরসভার আওতাধীন কোন ইমারত যদি কোনভাবে ক্ষতিকর বিবেচিত হয় অথবা তাতে বসবাসকারীদের ক্ষতির আশংকা থাকে অথবা ভবনটি সামগ্রিকভাবে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত হয় তাহলে উক্ত ইমারত ব্যবহার পৌরসভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে।

৭. সর্বসাধারণের রাস্তা

পৌরসভা বা পৌরবাসীর জন্য স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণভাবে বসবাস ও চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা নির্মাণ এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত এবং অনুমোদনের নির্দেশনা ব্যতীত কোন নতুন রাস্তা নির্মাণ বা সম্প্রসারণ করা যাবে না। পৌরসভা কোন রাস্তা বা সড়কের নামকরণ করতে পারবে। এজন্য ফলক নির্মাণ করবে। পৌরসভা বিভিন্ন ইমারত সারির সঙ্গে সংগতি বিধান করে সড়ক নির্মাণ করবে। রাস্তাসমূহ এবং সড়কের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণপূর্বক সড়কের ফুটপাত নিয়ন্ত্রণ করবে। সাধারণ রাস্তাসমূহ এবং গণস্থানসমূহে পৌরসভা তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ বা অন্য কোন আলোক বিচ্ছুরণকারী বস্তু দ্বারা বাতির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার জন্য রাস্তা সর্বদা পরিষ্কার করার জন্য কর্মী বাহিনী নিয়োগ ও উপকরণাদী সংরক্ষণ করতে পারবে। পৌরসভা যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করবে। মটরচালিত যান ব্যতীত অন্য সবধরনের যানবাহন পৌর এলাকায় চালনা করার অথবা ভাড়ায় দেয়ার জন্য পৌরসভা থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে। পৌর এলাকার মধ্যে ঘোড়া বা অন্য কোন পশুচালিত যানবাহন ব্যবহার করতে হলে নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।

৮. জননিরাপত্তা

জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী সমন্বয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার ব্রিগেড পৌরসভা পরিচালনা করবে। কোন স্থানে আগুন লাগলে তা নিভানোর জন্য কোন স্থাপনা অপসারণ, জোরে পানি সঞ্চালন বা অনুরূপ কোন কাজ পৌরসভা

কর্তৃপক্ষ সম্পাদনের মাধ্যমে আগুন নিভাতে পারবে। পৌরসভা সিভিল কার্যক্রম সম্পাদন করবে। বন্যা সংগঠিত হলে, বন্যা প্লাবিত জনগণকে অথবা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্যার্থে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করবে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে বিভিন্ন রকম সহায়তা কর্মসূচি পৌর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। পৌরসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ছাড়া এবং উক্ত সহায়তা কর্মসূচি পৌর কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে। পৌরসভা কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্স ছাড়া এবং উক্ত লাইসেন্সের শর্তাবলী ব্যতীত কোন জায়গায় ক্ষতিকর বা হানিকর কোন পণ্য কেউ গুদামজাত করতে পারবে না অথবা কোন মারাত্মক পণ্যের ব্যবসা করতে পারবে না। পৌরসভা কবরস্থান ও শশ্মানের জন্য নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করে তার পরিচালনার ব্যবস্থা করবে। গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এরূপ কবরস্থান বা দাহন স্থান পৌরসভার নিকট ন্যস্ত হবে। পৌরসভার অনুমোদন ব্যতীত কোন স্থান কবরস্থান বা দাহন স্থান হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

৯. বৃক্ষরাজি, ফার্মসমূহ, বাগানসমূহ ও বনরাজী

পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সড়ক ও অন্যান্য স্থানে বৃক্ষ রোপণ ও সংরক্ষণের সব ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা পৌরসভা নেবে। প্রয়োজনবোধে পৌরসভা জনগণের চিত্ত বিনোদনের লক্ষ্যে উদ্যান, উদ্যানের নকশা প্রণয়ন, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। জনগণের সুবিধার্থে পৌরসভার মধ্যে প্রয়োজনীয় খোলা জায়গা রাখা এবং এসব জায়গায় ঘাসাচ্ছাদিত করে এবং সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য বৃক্ষরোপণ করবে। পৌরসভা নির্ধারিত উপায়ে এবং পরিকল্পিত পদ্ধতিতে রকমারী সৌন্দর্যবর্ধক গাছ লাগানোর মাধ্যমে বনরাজি সৃষ্টি এবং নিম্ন ডোবা অঞ্চল প্রয়োজনবোধে সংস্কার সাধন করবে।

১০. শিক্ষা এবং সংস্কৃতি

পৌরসভা প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে এবং বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক অনুদান প্রদান করবে। স্কুলে যাওয়ার উপযোগী শিশুরা যাতে নিয়মিতভাবে স্কুলে যায় সেজন্য পৌরসভা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। একটি পৌরসভা ছাত্রাবাস নির্মাণ, ছাত্রবৃত্তি প্রদান, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, দরিদ্র ছাত্রদের পুস্তক প্রদান, বয়স্ক শিক্ষা প্রবর্তন, শিক্ষা জরীপ কাজ চালনা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিচালনা করবে। পৌরসভা তথ্য কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, জনসাধাণের ব্যবহার্য স্থানে বেতারযন্ত্র ও টিভি স্থাপন, পাবলিক হল ও কমিউনিটি সেন্টর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন, বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন শরীর চর্চা এবং বিভিন্ন খেলাধুলাকে উৎসাহিত

করা এবং টুর্নামেন্টের আয়োজন করা, বিভিন্ন দেশজ ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্যাবলী সংরক্ষণ, কৃষ্টির অগ্রগতি সাধনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে। তাছাড়া গ্রন্থাগার এবং পাঠ-কক্ষ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবে।

১১. সমাজ কল্যাণ

পৌরসভা এতিম, কিংবা বিধবা ও দুস্থদের জন্য কল্যাণ কেন্দ্র বা আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে। বেওয়ারিশ লাশের দাফন/সৎকার করবে। ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি মাদকাসক্তি ইত্যাদি সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিবে। পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, মহিলা ও শিশুদের জন্য বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করবে।

১২. উন্নয়ন পরিকল্পনা

পৌরসভা, পরিবেশ দূষণ রোধ বিভিন্ন উন্নয়নমুখী কার্যাবলী সম্পাদন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। পৌরসভা বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষক বা উদ্যোক্তা হিসাবে নির্ধারিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে। পৌরসভা যে কোন বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

পৌরসভার যাবতীয় তৎপরতা যাতে এ অধ্যাদেশের উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৌরসভাগুলিকে সরকার তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। এজন্য সরকার জনস্বার্থ বিরোধী হয়েছে বলে মনে করলে কোন কাজ বাতিল করতে পারবেন। উক্ত কাজ বা প্রস্তাব মূলতবী করতে পারবেন। তাছাড়া পৌরসভাগুলিকে বিভিন্ন আদেশ দিতে পারবেন।

উপরে বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করা ছাড়াও পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসমূহ আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। এসব কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ-

সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ

পৌর এলাকায় বসবাসকারী নাগরিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহ বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট ইস্যু করে থাকে। এসব সার্টিফিকেটের মধ্যে চরিত্রগত সনদপত্র, জাতীয়তার সনদপত্র, জন্ম ও মৃত্যুর সনদপত্র, উত্তরাধিকার সনদপত্র উল্লেখযোগ্য। এসব সনদপত্র জনসাধারণের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বিচার বিষয়ক কার্যাবলী

বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ (পৌর এলাকাসমূহের) অধ্যাদেশ-১৯৭৯ অনুযায়ী পৌরসভাসমূহ/ সিটি কর্পোরেশনসমূহ বিচারিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। "কনসিলিয়েশন বোর্ড" গঠনের মাধ্যমে বিচারিক কার্যাবলী পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসমূহ নিষ্পন্ন করে থাকে। সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে "কনসিলিয়েশন বোর্ড" গঠন করা হয় আবেদনে বর্ণিত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে। একজন চেয়ারম্যান এবং বিরোধীয় দু'পক্ষের দু'জন করে সদস্যের সমন্বয়ে "কনসিলিয়েশন বোর্ড" গঠিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য মোট ৪ জন সদস্য এবং একজন চেয়ারম্যান সমন্বয়ে মোট ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি "কনসিলিয়েশন বোর্ড" গঠিত হয়ে থাকে। বিরোধীয় প্রতিটি পক্ষের যে দু'জন করে সদস্য উক্ত বোর্ডে নিযুক্ত হবেন তাদের মধ্যে ১ (এক) জন অবশ্যই পৌরসভা/ সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার হবেন। আর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান অথবা মেয়র এই "কনসিলিয়েশন বোর্ড"-এর চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। এরূপভাবে "কনসিলিয়েশন বোর্ড"-এর প্রাথমিক দায়িত্ব হলো সুনির্দিষ্ট বিরোধের নিষ্পত্তি করা। বিভিন্ন ধরনের চুক্তি (বিবাহের চুক্তিসহ), সম্পত্তি গ্রহণের রশিদ, স্থাবন সম্পত্তির দখল পুনরুদ্ধার এবং অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ, গবাদি পশুর অবৈধ অনুপ্রবেশজনিত ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির সালিশমূলক বিচার কার্য পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের "কনসিলিয়েশন বোর্ড" সমূহ সম্পাদন করে থাকে। তবে এসব বিরোধের ক্ষতির মাত্রা অবশ্যই ৫,০০০/- টাকার মধ্যে হতে হবে। কারণ সালিশীমূলক আদালত বা "কনসিলিয়েশন বোর্ড"-এর সালিশ বিচার করার ক্ষমতা আবশ্যিকভাবে ৫,০০০/- টাকার সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

আবার ফৌজদারী এখতিয়ার সম্পন্ন বিরোধের ক্ষেত্রে "কনসিলিয়েশন বোর্ড" ছোট ছোট এবং তুচ্ছ প্রকৃতির চুরি, প্রবঞ্চনা, অবৈধ বাধা, প্রতারণা ও লাঞ্ছনার বিচার করতে পারে। গরু চুরির মামলা তা যেকোন মূল্যমানেরই হোক না কেন, এই বোর্ড বিচার করতে পারে। এই "কনসিলিয়েশন বোর্ড" কোন জরিমানা বা জেল দণ্ড প্রদান করতে পারে না। তবে এ বোর্ড কোন পক্ষকে তার বক্তব্য প্রমাণের পক্ষে সাক্ষী হাজির করার জন্য সমন জারী করতে পারে। তাছাড়া, ৫,০০০/- টাকার সীমার মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য "কনসিলিয়েশন বোর্ড" আদেশ জারী করতে পারে। এ বোর্ড বিবাদী পক্ষকে তার পক্ষ সমর্থনে বক্তব্য প্রমাণের জন্য সাক্ষ্য এবং আলামত হাজির করার জন্য সমন জারী করতে পারে।

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনসমূহের কমিটি ব্যবস্থা

সিটি কর্পোরেশনসমূহ অর্থ, সংস্থাপন, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন, পূর্তকাজ, পানি ও বিদ্যুৎ এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, হিসাব ও নিরীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিচারে স্ট্যান্ডিং

কমিটি গঠন করে কাজ সম্পন্ন করে থাকে। তাছাড়াও সরকারের পূর্বানুমোদন নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সিটি কর্পোরেশনসমূহ বিভিন্ন কমিটি গঠন করতে পারে। এসব কমিটি অনধিক ৬ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে। সিটি কর্পোরেশনগুলির কমিশনারবৃন্দের মধ্য হতে কমিশনারবৃন্দের ভোটে এসব কমিটি গঠিত হয়ে থাকে। কোন কমিশনার একনাগারে দুটি কমিটির বেশী সদস্য হতে পারেন না। তবে সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সব কমিটির সসস্য হয়ে থাকেন। স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যগণ তাদের মধ্য হতে একজনকে চেয়ারম্যান এবং অপর একজনকে ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে কাজ পরিচালনা করে থাকে। সিটি কর্পোরেশন বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিটি স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যক্রম নিরূপণ করতে পারে। স্ট্যান্ডিং কমিটির কার্যবিবরণীসমূহ আবশ্যিকভাবে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

পৌরসভার কমিটিসমূহ

পৌরসভার প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটি এবং সাব-কমিটি গঠন এবং এসব কিমিটিতে কতজন কমিশনার ও কো-অপ্টকৃত সদস্য থাকবেন তা পৌরসভা কর্তৃক নির্ধারিত হবে। তাছাড়া এসব কমিটির কার্যাবলী পৌরসভা বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করে থাকে। পৌরসভার উল্লেখযোগ্য কতিপয় কমিটির গঠন এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) **আর্থ বিষয়ক কমিটি ঃ** বাজেট প্রণয়ন, কর আদায়, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয়, হিসাব ও নিরীক্ষা কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াবলী আর্থ বিষয়ক কমিটির আওতাভুক্ত।

খ) **স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটি ঃ** স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির মূল দায়িত্বাবলীর মধ্যে মহামারী নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রতিষেধকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় টিকা সরবরাহ, খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আওতাভুক্ত থাকবে।

গ) **টেন্ডার কমিটি ঃ** বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য দাখিলকৃত দরপত্রসমূহ বাছাই ও সেগুলির তালিকা তৈরী করা ও তার মধ্য হতে যোগ্য দরপত্র বাছাইয়ের জন্য সুপারিশ করা হলো এ কমিটির অন্যতম কাজ। চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকী করা, কাজের মান সম্বন্ধে প্রত্যয়ন প্রদানসহ ঠিকাদারের বিল প্রদানের জন্য সুপারিশ করা এ কমিটির কাজ। এ কমিটি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সুপারিশও করে থাকে।

ঘ) **বাজার কমিটি ঃ** পৌর বাজারসমূহের দোকানগুলির লীজের অর্থ এবং ভাড়া ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এ কমিটি কাজ করে। পৌর বাজারগুলির সেবার মান এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দায়িত্ব এ কমিটি পালন করে থাকে।

ঙ) **রিভিউ কমিটি ঃ** প্রতি ৫ বছর পর পর পৌরসভার খাজনার হার নুতনভাবে ধার্য করতঃ জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করতে হয়। যদি কোন পৌরবাসী কর দাতার কোন আপত্তি থাকে তবে তিনি এ কমিটির নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে তার আপত্তি দাখিল করতে পারবেন। আপত্তির বিষয়টি অতি যত্নসহকারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্তভাবে বিবেচিত তালিকানুযায়ী একটি নতুন কর ধার্যকরণ তালিকা উক্ত কমিটি সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করবেন। যদি কেহ উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় অসন্তুষ্ট হন তবে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে আপত্তি জানাতে পারবেন।

পৌরসভা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ এর জোরালো দিক ও সীমাবদ্ধতাসমূহ

পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ একটি পূর্ণাঙ্গ আইন হিসাবে প্রণীত হয়েছিল। এ অধ্যাদেশ আইনের মর্যাদা নিয়ে এখনও সক্রিয়ভাবে কার্যকরী রয়েছে সময়ে সময়ে সংশোধনী আনয়নের মাধ্যমে। ১৯৭৭ সালের পূর্বে পৌর প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রণীত আইনসমূহ অনেকটা খণ্ডিত ধরনের ছিল। এই আইনটিই প্রথম বারের মতো পৌর প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকাশের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কাঠামো দানের সুযোগ এনে দেয়।

এই আইনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পৌরসভার গঠন, কার্যাবলী, মেয়াদকাল, চেয়ারম্যান ও কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, চেয়ারম্যান ও কমিশনারের অপসারণ প্রক্রিয়া, পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদন, পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া, পৌরসভার তহবিল ও সম্পত্তির গঠন বা বিকাশ, পৌর তহবিল ব্যয়ের খাতসমূহ, বাজেট প্রণয়ন ও করারোপ ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় বর্ণনা বিধৃত হয়েছে।

পৌরসভা অধ্যাদেশ ১৯৭৭ অত্যন্ত যুগোপযোগী আইন হিসাবে প্রতিভাত। এ অধ্যাদেশ প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের পৌরসভাসমূহ অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুসংবদ্ধ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। এ আইন প্রণীত হওয়ার পরে এদেশে অনেক ইউনিয়ন পরিষদই পৌরসভায় উন্নীত হয়েছে।

পৌরসভা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ এর কার্যকরী বাস্তবায়ন বা প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশে ৬টি সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। আসলে সিটি কর্পোরেশনসমূহের গঠনের ক্ষেত্রে পৌরসভা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ ভিত্তি আইন হিসাবে কাজ করেছে। এ অধ্যাদেশটি পূর্ণাঙ্গ আইন হলেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ আইন নয়। এজন্য ঐ আইনটি কালোত্তীর্ণ আইনে পরিণত হতে পারেনি। এই আইনটিতেও কিছু সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান।

এই আইন যখন প্রণীত হয় তখন চেয়ারম্যান ও কমিশনার নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধান স্পষ্ট না থাকায় পরবর্তীকালে পৌরসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন করতে হয়। পৌরসভা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ অত্যন্ত বিস্তারিত কলেবরে প্রকাশিত হয়েছে। এই আইনে অনেক বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা থাকলেও অন্যান্য অধ্যাদেশের ন্যায় এ অধ্যাদেশটিও দ্রুততার সাথে প্রণীত হওয়ায় এ অধ্যাদেশটিতে ২৬ বার সংশোধনী এনে এটাকে সচল রাখতে হয়েছে।

এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী পৌরসভাসমূহ প্রকৃত অর্থে বিকেন্দ্রীভূত ও স্বশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিকশিত হতে পারেনি। কারণ পৌরসভাসমূহ আজও সরকারি অনুদানের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। পৌরসভাসমূহ প্রায়শই বড় ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সরকারের উপর নির্ভর করে থাকে।

দেশে স্থিতিশীল ও উন্নততর রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে এ অধ্যাদেশ তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। অর্থাৎ রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রভূমি হিসাবে উন্নত রাজনৈতিক সংস্কৃতিসম্পন্ন দেশগুলির মতো এই আইন-বলে সৃষ্ট পৌরসভাগুলি বিকশিত হতে পারেনি।

পৌর করের বিভিন্ন ধাপ নিরূপণ ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আইনে যে বর্ণনা রয়েছে তা অনেকটা সনাতন পদ্ধতির হওয়ায় বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। কর ধার্যকরণ ও আদায় প্রক্রিয়াটি আরও গতিশীল, কার্যকরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক হিসাবে আইনটির মধ্যে উল্লেখ থাকলে ভাল হতো।

সবচেয়ে বড় কথা এই আইন প্রণয়নের ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তত্ত্ব ও বাস্তবতার যে ব্যবধান তা যেন এই অধ্যাদেশ প্রণয়নের ফলে আরও বেড়ে গেছে বলে সমালোচকরা বলে থাকেন।

সবশেষে একথা বলা যায় যে, পৌরসভা অধ্যাদেশ-১৯৭৭ হলো এমন একটি আইন যা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রণীত আইনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও উন্নত। আর এজন্যই আইনটি আজ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে ও ফলপ্রসূভাবে টিকে আছে।

উপসংহার ঃ

সবশেষে বলা যায় যে, উপরে বর্ণিত দায়িত্বাবলী সম্পাদনের পাশাপাশি শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলী পালন করে থাকে। বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রসমূহের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের জন্য যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়ে তাকে সেখানে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে টেকসই উন্নয়নের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য উন্নত ও মজবুত ভিত্তি সম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশের জন্য যোগ্য শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিকাশ

অপরিহার্য। সকল বাধা-বিপত্তি এবং সীমবদ্ধতা সত্বেও আমাদের শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে যদি আরও ক্ষমতা এবং স্বায়ত্বশাসন দেয়া হয় তবে এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের শহুরে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে দায়িত্বশীল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং নিয়োগপ্রাপ্ত ও প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দায়িত্বশীলতা এবং কর্মপরিধি সম্বন্ধে যদি আরও সক্রিয় ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া যায় তবে এসব প্রতিষ্ঠান আরও অনেক বেশী কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে। সমগ্র জাতির জন্য অন্ততপক্ষে শহর এলাকায় বসবাসকারী সচেতন নাগরিকদের জন্য সেবার মান আরও বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. Siddiqui, Kamal (ed.), 1994. *Local Government in Bangladesh*, Dhaka, University Press Limited.

২. আনিসুজ্জামান, মোহাম্মদ (সম্পাদিত)। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮২।

৩. ভূইয়া মোহাম্মদ আবুল অদুদ। লোক-প্রশাসনের রূপরেখা, ঢাকা হাউজ, ১৯৭৯।

৪. হক, আবুল ফজল। বাংলাদেশ শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১০৭৪।

৫. Ali AMM, Showkat, Field Administration & Rural Development in Bangladesh, Dhaka, CSS-1982.

৬. Ali Shaik Maqqsood et al. Decentralization and People's Participation in Bangladesh, Dhaka, NIPA, 1983.

৭. Islam Shamsul, Local Government and National Development Quarterly. Vol-6, No. 3, 1977.

৮. Conyers, Diana, 1984. "Decentralization and Development. A Review of the Literature." *Public Administration and Develoopment. Vol. 4.*

৯. Mouzelis, Nicos P. 1996. `Modernity. Late Development and Civil Society", in Democratisation in the Third World. Concrete Cases in Comparative and Theoretical Perspective. Lars Rudebevk and Olle Tornquist, eds. Uppsala: Uppsala Universty.

১০. Rahman, M. A., 1984. "Bangladesh in 1983: Beginnings of the Second Decade". *Asian Survey,* Vol. 24.

১১. Montugu Harris, Comparative Local government. London: Hutchinson's University Library, 1984.

১২. Dvane, Lockward. *"Local government"* in Encyclopedia of Social Sciences (New York: Ma cmillan-Free Press, 1967).

১৩. Hugh Tinker, *Foundation of Local Self-Government in India, Pakistan and Burma* (London: Athcenon Press, 1954).

১৪. Dr. Ali Ahmed. *Adminsitration of Local Self Government for Rural Areas in Bangladesh-* (Dhaka: Local Government Institute, 1979).

১৫. Chowdhury, Lutful Huq. *Local Self Government and its Reorganisation in Bangladesh* (Dhaka: National Institute of Local Government, 1987).

১৬. Rondinelli, Dennis, and G. Shabbir Cheema, 1983. "Implementing Decentralization Policies: An Introduction". In G. Shabbir Cheema and

Dennis A. Rondinelli, eds., *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries.* Saga Publications, London.

১৭. Smith, B. C. 1985. *Decentralization. The Territorial Dimension of the State.* London: George Allen.

১৮. Sobhan, Rehman, 1986. *Basic Democracies. Works Programme and Rural Development in East Pakistan.* Dhaka.

১৯. UNRIS Popular Participation Programme. 1979. *Inquiry into Participation-A research Approach* (by Andrew Pearse and Matthias Stiefel).

২০. Westergaard, Kirsten, 1985. *State and Rural Society in Bangladesh. A study in Relationship.* London: Curzon Press.

২১. Westergaard, Kirsten, 1992."Local Government in Bengal. Steps Towards Democracy?" in *Shen Democracy Makes Sense. Studies in the Democratic Potential of Third World Popular Movements,* Lars Rudebeck, ed., Uppsala University.

২২. World Bank, 1999. *Entering the 21st Century. World Development Report 1999/2000.* The World Bank.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষি খাতের ভূমিকাঃ শাকসবজি উপখাতের উপর একটি ঘটনা সমীক্ষা

সৈয়দ আবু রায়হান*

Abstract: The farmers of Bangladesh are traditionally concerned with the production of paddy–the principal foodstuff of the country, ingnoring one of the most vital sub-sectors of agriculture, i.e., vegetable production. Though the required consumption rate of vegetable is 250 grams per capita per day, the roduction rate of vegtable is only 53 grams per capita per day in Bangladesh.

Sufficient production and consumption of vegetable can on one side be a substitute of rice to a great extent, thereby reducing pressure on cereals and on the other, it can supply required vitamins and other potentials to the people. Besides, vegetable production is much more profitable than that of cereals.

As such the aim of preparing this article is to disseminate the idea that vegetable production is highly profit oriented one that can help alleviate poverty to a great extent, which is the need of the hour.

ভূমিকা ঃ

পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের দৈনিক ২৫০ গ্রাম করে শাকসবজি গ্রহণ করা উচিত। শাকসবজিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ- যা প্রত্যেক মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সহজপ্রাপ্য ও পুষ্টিদায়ক হলেও আমাদের খাদ্য তালিকায় শাকসবজিকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। উন্নত ও কতিপয় উন্নয়নকামী দেশগুলোতে মানুষের খাদ্য তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি গ্রহণ করে থাকে। যেমন- জাপানে মাথাপিছু দৈনিক গড়ে শাকসবজি গ্রহণের পরিমাণ ৩৪৮ গ্রাম; ভারতে ১৬৮ গ্রাম; দক্ষিণ কোরিয়ায় ৫৪৯ গ্রাম। অথচ বাংলাদেশে মাথাপিছু দৈনিক শাকসবজি গ্রহণের পরিমাণ মাত্র ৫৩ গ্রাম। অর্থাৎ মাথাপিছু দৈনিক শাকসবজি গ্রহণের স্বীকৃত পরিমাণ যেখানে ২৫০ গ্রাম–সেখানে বাংলাদেশে মাত্র ৫৩ গ্রাম–স্বীকৃত পরিমাণের মাত্র পাঁচের এক ভাগ। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব এবং সুষম খাদ্য তালিকা বিষয়ে সচেতনতার অভাবই এর মূল কারণ।

পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মাথাপিছু বার্ষিক চাল গ্রহণের পরিমাণ ১৮৩ কেজি; ইন্দোনেশিয়াতে ১১০ কেজি এবং চীনে মাত্র ৯০ কেজি। সে হিসেবে

---

* উপ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাংলাদেশে মাথাপিছু দৈনিক চাল গ্রহণের পরিমাণ ৫০১ গ্রাম; ইন্দোনেশিয়ায় ৩১০ গ্রাম, চীনে ২৪৬ গ্রাম এবং জাপানে মাত্র ২১৯ গ্রাম।

বাংলাদেশ দারিদ্র্যক্লিষ্ট একটি দেশ। চাল এদেশের একমাত্র প্রধান খাদ্য। আমরা যদি অন্যান্য অনেক দেশের মতো দৈনন্দিন খাবার তালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণ শাকসবজি গ্রহণ করি- তবে আমরা একাধিক ক্ষেত্রে লাভবান হতে পারি। যেমন একদিকে বেশী পরিমাণ শাকসবজি খেলে মূল খাদ্য চালের উপর চাপ কমবে অন্যদিকে আমরা দেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকারের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ লাভ করে আরও কর্মক্ষম ও সুস্থ থাকতে পারি।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ব্যাপকতা ঃ

বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে ৮৩৪ জন লোক বাস করে। এদের মাথাপিছু আয় বাৎসরিক মাত্র ৪০৭ ডলার। তদুপরি এ দেশের শিক্ষিতের হার মাত্র ৫৪ জন। এ দেশের একটা বিশাল অংশ নিজেদের সার্বিক কল্যাণের বিষয়ে অসচেতন। তারা বসবাস করছে দারিদ্র্য-সীমার নীচে। দারিদ্র্য পরিমাপের কতিপয় পদ্ধতির মধ্যে একটি হচ্ছে স্বীকৃত পরিমাণ ক্যালোরী গ্রহণের চেয়ে কম পরিমাণ ক্যালোরী গ্রহণ। দারিদ্র্যকে দুটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-২১২২ ক্যালোরী (জনপ্রতি প্রতিদিন) এর নীচে যারা ক্যালোরী গ্রহণ করে থাকে তারা ১ নং দারিদ্র্য লাইনে এবং যারা জনপ্রতি প্রতিদিন ১৮০৫ ক্যালোরীর নীচে ক্যালোরী গ্রহণ করে থাকে তারা ২ নং দারিদ্র্য লাইনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ২ নং দারিদ্র্য লাইনের অন্তর্ভুক্ত দরিদ্রদের বলা হয়ে থাকে নিরেট দরিদ্র (Hard core poor)।

টেবিল - ১

সুপারিশকৃত ক্যালোরীর নীচে ক্যালোরী গ্রহণকারী জনসংখ্যা এবং নিরেট দরিদ্র জনসংখ্যার বিবরণী

বৎসর	১নং দারিদ্র্য লাইন		২ নং দারিদ্র্য লাইন	
	শহরে	গ্রামে	শহরে	গ্রামে
দরিদ্র জনসংখ্যার প্রকৃত সংখ্যা (মিলিয়নে)				
১৯৮১-৮২	৬.৪	৬০.৯	৩.০	৪৩.১
১৯৮৩-৮৪	৭.১	৪৭.০	৩.৮	৩১.৩
১৯৮৫-৮৬	৭.০	৪৪.২	২.৪	১৯.১
১৯৮৮-৮৯	৬.৩	৪৩.৪	৩.৫	২৬.০
১৯৯১-৯২	৬.৮	৪৪.৮	৩.৮	২৬.৫
১৯৯৫-৯৬	৯.৬	৪৫.৭	৫.২	২৩.৯
২০০০ (সাময়িক)	১৩.২	৪২.৬	৬.০	১৮.৮

দরিদ্র (শতকরা হার)				
১৯৮১-৮২	৬৬.০	৭৩.৮	৩০.৭	৫২.২
১৯৮৩-৮৪	৬৬.০	৫৭.০	৩৫.০	৩৮.০
১৯৮৫-৮৬	৫৬.০	৫১.০	১৯.০	২২.০
১৯৮৮-৮৯	৪৭.৬	৪৮.০	২৬.৪	২৮.৬
১৯৯১-৯২	৪৬.৭	৪৭.৮	২৬.২	২৮.৩
১৯৯৫-৯৬	৪৯.৭	৪৭.১	২৭.৩	২৪.৬
২০০০ (সাময়িক)	৫২.৫	৪৪.৩	২৫.০	১৮.৭

টীকা ঃ ক) ১ নং দারিদ্র্য-লাইন, জনপ্রতি প্রতিদিন সুপারিশকৃত ২১২২ ক্যালোরীর নীচে।
খ) ২ নং দারিদ্র্য-লাইন, নিরেট দরিদ্র্য, জনপ্রতি প্রতিদিন ৮৮০৫ ক্যালোরীর নীচে।

উৎস ঃ *বাংলাদেশের পরিবারভিত্তিক ব্যয় জরীপ প্রতিবেদন, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯৫-৯৬ এর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।*

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫২.৫% শহুরে এবং ৪৩.৩% গ্রাম এলাকার লোক ১ নং দারিদ্র্য লাইনের অন্তর্ভুক্ত–যারা মাথাপিছু প্রতিদিন সুপারিশকৃত বা স্বীকৃত ২১২২ ক্যালোরীর চেয়ে কম ক্যালোরী গ্রহণ করে। আরও দেখা যায় যে, ২৫% শহুরে এবং ১৮.৭% গ্রাম এলাকার লোক নিরেট দারিদ্র্য চক্রের শিকার যারা মাথাপিছু প্রতিদিন ১৮০৫ ক্যালোরীর চেয়ে কম পরিমাণ ক্যালোরী গ্রহণ করে।

এছাড়াও বাংলাদেশে প্রকৃত দরিদ্রদের সংখ্যা শহর এলাকায় ১৩.২ মিলিয়ন এবং গ্রাম এলাকায় ৪২.৬ মিলিয়ন যারা ১ নং দারিদ্র্য লাইনের অন্তর্ভুক্ত। ২ নং দারিদ্র লাইনের অন্তর্ভুক্ত লোকসংখ্যার মধ্যে শহর এলাকার ৬.০০ মিলিয়ন এবং গ্রাম এলাকার ১৮.৮ মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী জনসংখ্যা দরিদ্র। এতেই বুঝা যায় বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ব্যাপকতা কত বিশাল।

টেবিল - ২

কৃষি উৎপাদনের সূচক (ভিত্তি ঃ ১৯৯১-৯২ = ১০০)

পণ্য	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯-৯৯	১৯৯৯-২০০০
ধান (বিভিন্ন জাতের)	৯২	৯৫	১০৪	১০৩	১০৩	১০৫
গম	১১৭	১৩২	১৩৯	১৬৯	১৫৭	১৬৪
ডাল (বিভিন্ন জাতের)	১০৪	১০৫	১০৭	১০০	১০৩	১০৭
মসলা	৯৯	১০০	১০৪	৯৮	৯৯	১০২
ফলমূল	১০১	১০৬	১০৮	১০৩	১০০	১০৫
শাকসবজি	১০৭	১০৫	১০৮	১০৬	১০৭	১০৯

উৎস ঃ মূল্য এবং মজুরী শাখা, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

১৯৯৪-৯৫ হতে ১৯৯৯-২০০০ সময়ের মধ্যে শাকসবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি। যদিও ১৯৯৪-৯৫ হতে ১৯৯৯-২০০০ পর্যন্ত শাকসবজি উৎপাদন ৭% থেকে ৯% বেড়েছে, তবু এতে তুষ্টির কোন কারণ নেই এ জন্য যে, এ সময়ে জনসংখ্যারও বৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং এটা বলা যেতে পারে যে শাকসবজি উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন উন্নয়ন হয়নি। সামাজিক সচেতনতাসহ সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করলে এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল আশা করা যেতে পারে।

বাংলাদেশে শাকসবজি উৎপাদন এতই নগণ্য ও হতাশাব্যঞ্জক যে, উৎপাদিত শাকসবজির পরিমাণ জাতীয় চাহিদার মাত্র পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

টেবিল-৩

বাংলাদেশে কতিপয় আবশ্যকীয় কৃষি পণ্যের বাৎসরিক চাহিদা ও উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টনে)

পণ্যের নাম	২০০০-২০০১			২০০১-২০০০		
	চাহিদা	কর্ষিত ভূমি	উৎপাদন	চাহিদা	কর্ষিত ভূমি	উৎপাদন
চাল	২৩৭.০৫	১০৭.৯৭	২৫০.৯৬	২৪১.৪৭	১০৬.৬০	২৪৩.০০
গম	২৬.৩৪	৭.৭৩	১৬.৭৩	২৬.৮৩	৭.৪২	১৬.০৬
ডাল	১৮.৭৭	৪.৬৮	৩.৬৩	১৯.১২	৪.৪৬	৩.৪৯
পেয়াজ	১১.০১	০.৩৪	১০০	১১.১২	০.৩৭	১.৫০
রসুন	৩.৬৯	০.১৩	০.৩৯	৩.৬৯	০.১৩	০.৩৯
মরিচ	৪.০২	১.৭৫	১.৪১	৪.০২	১.৭৫	১.৪১
শাকসবজি	১৪৩.৬৬	২.৬৭	৩০.১০	১৪৬.৩৫	২.৫৮	৩১.২০

উৎস ঃ *কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, খামারবাড়ী, ঢাকা।*

এখানে লক্ষণীয় যে, শাকসবজির চহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে তারতম্য এত বিশাল যে, শাকসবজি উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করার মতো কোন কর্তৃপক্ষই যেন নেই। হতাশাব্যঞ্জক এ সত্যটিও প্রমাণিত যে, জনগণের মধ্যে শাকসবজির গুণাগুন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে এবং সরকারি কোন উদ্যোগও নেই। যেখানে বাংলাদেশে শাকসবজির বার্ষিক চাহিদা ১৪৬.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন, (২০০১-২০০২), সেখানে উৎপাদন মাত্র ৩১.২০ লক্ষ মেট্রিক টন। পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজির উৎপাদন করলে তা একদিকে যেমন অপুষ্টির ব্যাপকতা দূর করবে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের প্রধান খাদ্য চাল এর উপরও চাপ কমতে শুরু করবে।

টেবিল-৪

কতিপয় প্রয়োজনীয় শাকসবজির বীজ বপন/রোপণ ও আহরণের বিবরণী

শাকসবজির নাম	বীজ বপন বা চারা রোপণের সময় (বাংলা সন)	মন্তব্য
মূলা	ভাদ্র-আশ্বিন	৪৫-৫০ দিনের মধ্যেই আহরণযোগ্য
লালশাক	সারা বছর	৩০-৪০ দিনের মধ্যেই আহরণযোগ্য
পালংশাক	আশ্বিন-কার্তিক	৪০-৫০ দিনের মধ্যেই আহরণযোগ্য
বাটিশাক	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	৪৫-৫০ দিনের মধ্যেই আহরণযোগ্য
বেগুন	ভাদ্র-আশ্বিন	৩৫-৪০ দিনের চারা রোপণ করতে হয়। ১২০-১৪০ দিনের মধ্যে বেগুন আহরণযোগ্য হয়।
ফুলকপি	ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বীজ বপন ও কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে চারা রোপণ করা হয়।	৩০-৩৫ দিনের চারা রোপণ করতে হয়। ৬০-৭০ দিনের মধ্যে ফুলকপি আহরণযোগ্য হয়।
বাঁধা কপি	ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বীজ বপন ও কার্তিক-অগ্রহায়ন মাসে চারা রোপণ করা হয়।	চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে আহরণযোগ্য হয়।
টমেটো	কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে (২৫-৩০) দিনের চারা রোপণ করতে হয়।	চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে আহরণযোগ্য হয়।
লাউ	শ্রাবণ-ভাদ্র	৬০-৭০ দিনের মধ্যে লাউ আহরণ করা যেতে পারে।
শিম	আষাঢ় থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত	বীজ বপনের ১৮০-২০০ দিনের মধ্যে আহরণযোগ্য।
গাজর	ভাদ্র-আশ্বিন	চারা বপনের ৭০-৮৫ দিনের মধ্যে পরিপক্কতা অর্জন করে।
শালগম	কার্তিক-অগ্রহায়ণ	চারা বপনের ৭০-৮৫ দিনের মধ্যে পরিপক্কতা অর্জন করে।
ওলকপি	ভাদ্র-আশ্বিন	চারা রোপণের পর হতে ৪৫-৫০ দিনের মধ্যে পরিপক্কতা অর্জন করে।

উৎস ঃ কৃষি পরিসংখ্যান উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

উক্ত সারণীতে দেখা যায় যে, মূলা, লালশাক, পালংশাক, বটিশাক, শালগম ও ওলকপি পরিপক্কতা অর্জন করে ৫০ দিনের মধ্যেই। ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, লাউ, গাঁজর ইত্যাদি সবজি চারা লাগানোর পর সর্বোচ্চ আশি দিনের মধ্যে

আহরণযোগ্য হয়। এ সবের মধ্যে আবার কতিপয় শাকসবজি রয়েছে যেগুলো সারা বছরই উৎপাদন করা যায়। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে শাকসবজির উৎপাদন ব্যবসায়িক দিক থেকে অন্যান্য লাভজনক ফসলের শীর্ষে অবস্থান করছে। এ ক্ষেত্রে যত্নবান হলে শাকসবজির উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন পারিবারিক স্বচ্ছলতা অর্জন করা সম্ভব, তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাও সম্ভব।

টেবিল-৫
শাকসবজি উৎপাদন

(হাজার টনে)

সবজির নাম	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৯৯৯-২০০০
গোলআলু	১৪৯২	১৫০৮	১৫৫৩	২৫৬২	২৯৩৩
খরীফ কুমড়া	৩৪	৩৬	৩৭	৩৭	৪১
রবি কুমড়া	৬৬	৬৮	৬৭	৪৬	৬৬
খরীফ বেগুন	৬০	৬১	৬২	১১১	১১৪
রবি বেগুন	১২৯	১৩১	১৩০	২৯৩	২৭৯
পটল	২৩	২৫	২৭	৪৩	৪০
ঢেঁড়শ	১৬	১৭	১৭	১৭	১৮
ঝিঙ্গা	২৪	২৬	২৬	২৬	২৭
করল্লা	২১	২১	২১	২০	২০
কচু	১০৫	১০৫	১০৮	১০৯	১৩৫
পুঁইশাক	১৬	১৭	১৭	১৭	১৭
চিচিঙ্গা	১০	১১	১১	১১	১২
শসা	১৭	১৮	১৮	১৯	২০
বাঁধাকপি	৯৭	১০৭	১১৩	১১৫	১১২
ফুলকপি	৪৭	৭৬	৭৯	৯০	৮০
লাউ	৭৯	৮১	৮৩	৮৪	৯১
টমেটো	৮৯	৯৩	৯৪	৯৮	১০০
মূলা	১৯৩	১৯৯	১৯৭	১৯৭	২০১
শিম	৪৬	৪৮	৪৯	৪৯	৪৯
অন্যান্য রবি সবজি	৫০	৫১	৫১	৫২	৫৩

উৎস ঃ কৃষি পরিসংখ্যান উইং, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

দেখা যাচ্ছে যে, কুড়ি ধরনের শাকসবজির মধ্যে শুধুমাত্র গোল-আলু, খরীপ ও রবি বেগুন, পটল, কচু এসব সবজির উৎপাদন বেশ বেড়েছে ১৯৯৫ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বাকী পনেরটি বিভিন্ন শাকসবজির উৎপাদন আগের মতোই অর্থাৎ ১৯৯৫ সালে যেমন ছিল তেমনই রয়েছে। সকল ধরনের শাকসবজির উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে আরও জমি ব্যবহারোপযোগী করতে হবে।

একটি সমীক্ষা

উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে ঢাকার অদূরে রাতুটি নামক এক গ্রামে শাকসবজি উৎপাদনের উপর এক সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। ঢাকা জেলার উত্তরখান ইউনিয়ন পরিষদের অন্তর্ভুক্ত একটি ছোট গ্রাম রাতুটি। ঢাকা শহরের কেন্দ্র হতে মাত্র ৩৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। উত্তরখান ইউনিয়ন পরিষদ উত্তরা থানার অন্তর্ভুক্ত-যা একটি পুলিশ থানা; রাতুটি একটি ছোট গ্রাম- যার লোকসংখ্যা মাত্র ৬৮৫ জন। এ গ্রামে বাড়ীর সংখ্যা মাত্র ১১২ টি।

টেবিল-৬

রাতুটি গ্রামের বাড়ির সংখ্যা, জীবিকা/পেশা, ভূমির ব্যবহার ও অন্যান্য কতিপয় বিষয়ের উপাত্ত

বাড়ির সংখ্যা	প্রধান পেশা	বাড়ি প্রতি মাসিক আয় (টাকায়)	বাড়ি ঘরের অবস্থা	ভূমির ব্যবহার (একরে)	স্যানিটেশন কাভারেজ	শিক্ষার হার
১১২	কৃষি	(০-২,৫০০) = ১৮	পাকা-৩৬	ভূমিহীন = ০০	৬৪%	৪৮%
		২৫০-১-৫,০০০=৪২	সেমিপাকা-৩৮ টিনসেড-২৭ কুঁড়েঘর-১১	০.০০-০.০৫=১২		
		৫,০০-১-১০,০০০=৩৫		০.০৬-০.৫০-২২		
		১০,০০১- তদোর্ধ্ব = ১৭		০.৫১-১.৫০=৫৯		
				১.৫১ তদোর্ধ্ব-১৯		

উৎস ঃ সরেজমিনে জরিপ।

রাতুটি গ্রামটি ঢাকা শহরের নিকটবর্তী হলেও, জরীপে দেখা যায় যে, এ গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ কোন বেসরকারি (এনজিও) এর নিকট হতে ঋণ পায়নি।

টেবিল-৭

রাতুটি গ্রামের কতিপয় কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে শাকসবজি উৎপাদনে ব্যয় ও আয়ের হিসাব সংক্রান্ত বিবরণী

কৃষকের নাম	ভূমির ব্যবহার		ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ			মন্তব্য
	মোট যে পরিমাণ ভূমির মালিক (একরে)	শাকসবজি উৎপাদনে ব্যবহৃত ভূমির পরিমাণ (একরে)	শাকসবজি উৎপাদন খরচ (টাকায়)	শাকসবজি হতে মোট আয় (টাকায়)	নিট আয় (টাকায়)	
মোশারফ হোসেন	২.৩১	১.০০	১২২৫০	৩০৮০০	১৮৫৫০	সাময়িক/মৌসুমী
সালাউদ্দিন আহমেদ	১.৩২	.৩৫	৫৬০০	২১৫০০	১৫৯০০	সারা বছর
মুসলিম উদ্দিন	১.৩৫	.৩৫	৪০০০	১০৭০০	৬৭০০	সাময়িক/মৌসুমী
সিরাজ উদ্দিন	.৫৭	.৫০	৭০০০	১২৫০০	৫০০০	সাময়িক/মৌসুমী
আব্দুল করিম	১.৩২	.৩৩	৪১০০	১০০০০	৫৯০০	সাময়িক/মৌসুমী
নাজমুল	৩.৪০	.৬৬	৭৫০০	১৭৫০০	১০০০০	সাময়িক/মৌসুমী
মোঃ আলতাজউদ্দিন	৩.৬৩	১.৩২	২০৮০০	৬১০০০	৪০২০০	সাময়িক/মৌসুমী
আব্দুল হক	১.৩৮	.৪০	৬৫০০	১৮০০০	১১৫০০	সাময়িক/মৌসুমী
মোট	১৫.২৮	৪.৬১	৬৭৭৫০	১৮২০০০	১১৪২৫০	সাময়িক/মৌসুমী

উৎস ঃ সরেজমিনে জরিপ।

উপর্যুক্ত চিত্রে দেখা যায় যে, রাতুটি গ্রামের যে সকল কৃষক ঐতিহ্যগতভাবে দীর্ঘদিন ধরে শাকসবজি উৎপাদন করে আসছে, তাদের মধ্যে মাত্র ৮ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হয়েছে। এ ৮ জন কৃষকও দীর্ঘদিন ধরেই শাকসবজি উৎপাদন করে আসছে। দেখা যায় যে, ঐ ৮ জন কৃষক সর্বমোট ৪.৯১ একর জমিতে শাকসবজির চাষ করে থাকেন। এতে নিজেরাই খরচ বহন করেন এবং এক বছরে তাদের উল্লিখিত পরিমাণ জমিতে গড়ে ৬৭৭৫০/- টাকা খরচ হয়। এ থেকে তাদের মোট আয় হয় ১,৮২,০০০/- টাকা মাত্র। তাদের নিট আয় দাঁড়ায় ১,১৪,২৫০/- টাকা মাত্র। আরও দেখা যায় যে, যদি উল্লিখিত ৪.৯১ একর জমিতে তারা শাকসবজি উৎপাদন না করে ধানের চাষ করতেন, তবে তা থেকে মোট চাল পাওয়া যেতো (ধানকে চালে রূপান্তরিত করে) মোট ৪,২৭৭ কেজি যা থেকে তাদের আয় হতে পারতো (একর প্রতি ৮৭১ কেজি × ৪.৯১ × ১৬) = ৬৮,৪২৫ টাকা হতে উৎপাদন খরচ বাদ দিলে খুব অল্প পরিমাণ টাকা সাশ্রয় হয়। অথচ রাতুটি গ্রামের উল্লিখিত ৮ জন কৃষক ৪.৯১ একর জমিতে বিভিন্ন ধরনের শাকসবজির চাষ করে খরচ বাদে আয় করেন লক্ষাধিক টাকা। সুতরাং শাকসবজির আবাদ সবদিক হতেই কৃষকের জন্য অধিকতর লাভজনক।

এছাড়াও উপর্যুক্ত টেবিলে আরও দেখা যায় যে, ৮ জন কৃষকের মধ্যে মাত্র ২ জন কৃষক সারা বছর শাকসবজির আবাদ করে থাকেন, তাদের আয়, যারা সাময়িকভাবে শাকসবজির আবাদ করে থাকেন, তাদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশী। উল্লিখিত ৮ জন কৃষকের সবাই যদি সারা বছর ধরে শাকসবজির উৎপাদন করতেন, তবে তাদের আয় বেড়ে যেতো অনেক।

শাকসবজি উৎপাদনকে কেন প্রাধান্য দেয়া হবে?

ক) দৈনিক পুষ্টি-চাহিদা পূরণকল্পে প্রতি বয়স্ক ব্যক্তিকে প্রতিদিন ২৫০ গ্রাম শাকসবজি খাওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে যে পরিমাণ শাকসবজি উৎপন্ন হয়, তাতে জনপ্রতি দৈনিক গড়ে ৫৩ গ্রামের বেশী পাওয়া যাচ্ছে না। সামান্য পরিমাণ শাকসবজি গ্রহণের কারণে একজন ব্যক্তি অপুষ্টির শিকার হয়ে অন্ধত্ব বরণ করছে। শাকসবজিতে প্রাপ্য দেহের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাবে শিশুসহ বয়স্করাও বহুবিধ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। সুপারিশকৃত পরিমাণ শাকসবজি নিয়মিত গ্রহণ করে একজন ব্যক্তি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন।

খ) পর্যাপ্ত পরিমাণ শাকসবজি গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের প্রধান খাদ্য চালের উপর চাপ কমানো সম্ভব। অর্থাৎ আমরা যদি দৈনিক খাদ্য তালিকায় ৫৩ গ্রামের অতিরিক্ত আরও ২০০ গ্রাম শাকসবজি ভক্ষণ করি তবে প্রতিদিন আমরা ৫০১ গ্রাম চাল থেকে ২০০ গ্রাম চাল সাশ্রয় করতে পারি। এভাবে যদি সুদূরপ্রসারী কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় তবে আমরা বছরে ৫০ লক্ষ মেট্রিক টনেরও বেশী চাল রপ্তানী করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি।

পৃথিবীতে অনেক দেশ রয়েছে- যেখানে আলু, ভুট্টা ইত্যাদি প্রধান খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে পৃথিবীর চল্লিশটি দেশের প্রধান খাদ্য আলু। এ ছাড়াও মেক্সিকোসহ মধ্য আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ভুট্টা। চাল ও আলুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ স্টার্চ, অর্থাৎ চালের বিকল্প হিসেবে আলু গ্রহণ করলে খাদ্রপ্রাণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানের কোন ঘাটতি থাকবে না। দেখা যায় যে, প্রতি একরে ধানের ফলন গড়ে ১১৩৩ কেজি যার বাজার মূল্য সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা পর্যন্ত হতে পারে। অথচ প্রতি একরে গোল আলুর ফলন গড়ে ৬.৫ মেট্রিক টনেরও বেশী যা থেকে আয় হতে পারে কমপক্ষে ৩৯,০০০/- টাকা। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, ধানের বদলে আলু চাষে তিন-চার গুণ বেশী আয় হয়ে থাকে। এ সুযোগটা যদি আমরা কাজে লাগিয়ে চালের সঙ্গে সবজি হিসেবে আলু খাবার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারি- কিংবা আলু খাবার

পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারি তবে চালের উপর চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।

গ) বেকার জনগোষ্ঠী বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শাকসবজি উৎপাদন করতে পারে এবং তা বাজারে বিক্রি করে পারিবারিক ও সামাজিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করতে পারে।

ঘ) শাকসবজি উৎপাদনে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ঃ

১। সামান্য জমিতে এমনকি এক শতাংশ বা তারও কম জমিতে শাকসবজি উৎপাদন করা যেতে পারে।

২। অন্যান্য ফসলের তুলনায় স্বল্পতর সময়ের মধ্যে শাকসবজির ফলন পাওয়া যায়।

৩। অন্যান্য ফসলের তুলনায় শাকসবজি চাষে উৎপাদন খরচ অনেক কম।

৪। ঘর বা বাড়ি সংলগ্ন অব্যবহৃত জমিতে, উঠোনের পার্শ্ববর্তী বা চতুষ্পার্শের খালি জমিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতিত জমিতে, টবে, ছাদে, রাস্তার পার্শ্বে শাকসবজির চাষ করা যেতে পারে।

৫। এমনকি গৃহকর্ত্রীরাও বাড়ির অভ্যন্তরে পতিত সামান্য জমিতে শাকসবজির চাষ করতে পারেন।

৬। শাকসবজি সংসারের ঘাটতি পূরণ করে পারিবারিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করতে পারে।

৭। বাংলাদেশের জলমগ্ন জমিতেও সার্জন পদ্ধতিতে (যে পদ্ধতিতে জলমগ্ন জমির পার্শ্বস্থ মাটি কেটে উঁচু করে শাকসবজির চাষ করা যায়) শাকসবজির চাষ করা যেতে পারে।

কর্মপরিকল্পনা ঃ

পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদন ও খাওয়ার বিষয়ে কৃষক ও জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

ক) কর্মশালার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধকরণ ঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ে দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা যেতে পারে। উক্ত কর্মশালায় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত সকল ওয়ার্ডের সদস্যমণ্ডলী, মহিলা সদস্যবৃন্দ, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দ, মাদ্রাসাসমূহের প্রধানগণ, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, কৃষকদের পক্ষে কমপক্ষে দশজন প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের প্রত্যেক ওয়ার্ড হতে একজন করে সমাজকর্মী অংশগ্রহণ

করতে পারেন। এরূপ দিনব্যাপী কর্মশালায় থানা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাবৃন্দ, বিষয়বস্তু কর্মকর্তাবৃন্দ, সমন্বয়কারী এবং সম্পদ-ব্যক্তি (রিসোর্স পার্সন) হিসেবে কাজ করতে পারেন। তদুপরি শাকসবজিতে নিহিত পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোকপাত করার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, আবাসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এবং অনান্য ডাক্তারবৃন্দকে সম্পদ-ব্যক্তি হিসেবে এরূপ কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে। কর্মশালায় নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা যেতে পারে ঃ

১। পুষ্টির আধার হিসেবে শাকসবজি চাষের উপর গুরুত্বারোপ;

২। মাথাপিছু দৈনিক প্রয়োজনীয় ২৫০ গ্রাম শাকসবজি খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা;

৩। অন্যান্য ফসলের উৎপাদনের চেয়ে শাকসবজি উৎপাদন অধিকতর লাভজনক;

৪। বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে শাকসবজি উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণ জমি ব্যবহার;

৫। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কৃষকদের করণীয়;

৬। সার, কীটনাশক ও উন্নতমানের বীজ ব্যবহারের নিয়মাবলী; এবং

৭। উন্নত কৃষি পদ্ধতি ইত্যাদি।

খ) কর্মশালা থেকে লব্ধ ধারণাসমূহ যাতে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ সাধারণ কৃষক ও জনগণের নিকট পৌঁছে দেয় তা নিশ্চিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ বাড়ি বা পাড়ায় বা ওয়ার্ড ভিত্তিতে আলোচনা সভার আয়োজন করে ধারণাসমূহ ছড়িয়ে দিতে পারেন।

গ) প্রান্তিক ও দরিদ্র চাষীদের মধ্যে যারা শাকসবজি উৎপাদনে আগ্রহী তাদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও বি আর ডি বি কর্তৃপক্ষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ঘ) উল্লিখিত বিষয়াবলীর উপর সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য উপজেলা সদরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যান করে এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাকে সদস্য-সচিব করে একটি মনিটরিং কোষ গঠন করা যেতে পারে। উক্ত কোসের সদস্য হিসেবে সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। প্রয়োজনবোধে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন স্তর থেকে আরও কতিপয় সদস্যকে এ কোষের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে

পারে। সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্বও এ মনিটরিং কোষের উপর অর্পণ করা যেতে পারে।

শাকসবজি উৎপাদনে সাফল্যের দু'টি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঃ

১। বিগত ১৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ খ্রীঃ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত *"আবতাব আলীর সবুজ বিপ্লব'* শিরোনামের খবরটি শাকসবজি উৎপাদনে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে বলা হয়েছে যে, মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার তালিমপুর গ্রামের জনৈক কৃষক আবতাব আলী বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি যেমন, আলু, বেগুন, পেঁয়াজ, ইত্যাদি ব্যাপকভাবে উৎপাদন করে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। আমন ধান কর্তনের পর পতিত জমিতে তিনি এসব শাকসবজির চাষ করছেন। বর্তমানে তার প্রকল্পের আওতায় দেড়শত একর জমি রয়েছে। এর মধ্যে তিনি ষাট একর জমিতে আলু, দশ একর জমিতে পেঁয়াজ, পাঁচ একরে বেগুন এবং অবশিষ্ট জমিতে ধানের চাষ করছেন। তার প্রকল্পে বর্তমানে দেড়শত কর্মী কর্মরত আছে। ইতোমধ্যেই বিভিন্ন দপ্তর থেকে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ জনপ্রতিনিধিরাও তাঁর খামার পরিদর্শন করেছেন। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ যে, ১৯৯৮ খ্রীঃ আবতাব আলী কুড়ি বিঘা জমিতে আলু উৎপাদন করে একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় করেছেন। তিনি বিঘা প্রতি ৬০ মন আলু উৎপাদন করে থাকেন। আগামী মওশুমে তিনি পাঁচশত একর জমিতে আরও ব্যাপক ভিত্তিতে চাষাবাদ করবেন বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এতে একদিকে যেমন প্রচুর শাকসবজি উৎপাদনের মাধ্যমে নিজে লাভবান হবেন, অন্যদিকে প্রায় এক হাজার লোকের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা হবে।

২। বিগত ০১ মে, ২০০৪ খ্রীঃ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত *"উপকূলীয় কৃষিতে সবজি বিপ্লব–একটি বালিশ বেগুনের ওজন ১ কেজি ৭০০ গ্রাম"*- শিরোনামের খবরটি শাকসবজি উৎপাদনে আরও একটি উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। খবরটি এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

"১০ বছর আগেও এখানে শাকসবজির আবাদ হতো না। পটুয়াখালী তথা উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যাপক এলাকার মানুষ কয়েক বছর আগেও সবজির জন্য তাকিয়ে থাকতেন যশোর-ফরিদপুর থেকে আসা সবজির ট্রাকের দিকে। এখন অবস্থা বদলেছে। বদলে দিয়েছেন জেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের কৃষকরা। মাছে-ভাতে বাঙ্গালিরা অনেকেই এখন সবজি খাওয়ার দিকে ঝুঁকছেন।

"জেলার চাষবাসের চিত্রটা পাল্টাতে শুরু করে কৃষকদের কারণে। ১৫ বছর আগে এসব এলাকার স্থানীয় বাজারগুলোতে সবজি বলতে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচা কলা আর পেঁপে ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাওয়াই মুশকিল হতো। সেখানে শুধু

কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নেই এ বছর কৃষকরা উৎপাদন করেছেন কয়েক শ'মণ শাকসবজি।

"এই সাফল্য শুধু স্থানীয় মানুষকেই অবাক করেনি, কৃষি বিশেষজ্ঞ ও কর্মীরাও এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন উপকূলীয় এলাকার পরিবর্তীত চাষাবাদ নিয়ে। নলীগঞ্জের পাখিমারা, গামইরতলা, এলেমপুর, কুমিরমারা, মোস্তফাপুর ইত্যাদি গ্রামে সবজি চাষের যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে, তা দেখতে এখন অনেকেই যাচ্ছেন সেখানে। যাচ্ছেন সেখানকার কৃষকদের ক্ষেতের বেগুন দেখতে। এত দিন গফরগাঁওয়ের একটি বেগুনের জাতই সারা দেশে বিখ্যাত ছিল, যেমন আকার তেমন স্বাদ। কিন্তু সে রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছেন গামইরতলা গ্রামের বেগুন চাষীরা। তারা ফলিয়েছেন বেগুনি রঙের ঢাউস বেগুন, যার সবচেয়ে বড়টির ওজন ১ কেজি ৭০০ গ্রাম। আকারে বড় বলে স্থানীয় কৃষকরা এর নাম দিয়েছেন বালিশ বেগুন। তবে অনেকের কাছে তা তাল বেগুন নামেও পরিচিত।

"দেশের অনেকে তো বটেই, কিছুদিন আগে ডেনমার্ক-এর রাষ্ট্রদূত নিলস সেভেরিন মুংক ও ডানিডার উর্ধ্বতন আইপিএম বিশেষজ্ঞ ড. এম রামাস্বামীও এই বেগুন ক্ষেত দেখে বিস্মিত। স্থানীয় উপজেলা কৃষি বিভাগ এখন এই সবজি চাষকে ঘিরে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। উপজেলা কৃষি অফিসার মোঃ শাহজাহান জানান, শুরুটা দু-চারজন কৃষকই করেছিলেন। তাদের সাফল্য দেখে কৃষি বিভাগ অন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করে। এখন কৃষকরা যাতে ফলন বাড়িয়ে এবং উৎপাদন খরচ কমিয়ে আরো বেশি লাভ করতে পারেন, সে ব্যাপারে সবজি চাষীর মধ্য থেকে এবার ২৫ জনকে নিয়ে একটি সবজি কৃষক মাঠ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পাখিমারায়। সেখানে সপ্তাহে একদিন করে মোট ১৪ সপ্তাহ ধরে তাদের বেগুনের বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে তারা এখন প্রায় বিনা কীটনাশকেই ভালো বেগুন উৎপাদন করতে পারছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক প্রদীপ ভৌমিক জানান, তিনি এবার তার বেগুন গাছে কোনো বিষই দেননি।

"বেগুনটা সেখানে বেশি হচ্ছে ঠিকই, বিশেষ করে শীতকালে। তবে অন্যান্য সবজিও চাষ করছেন চাষীরা। এর মধ্যে আছে বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওলকপি, শিম, বরবটি, টমেটো, পালংশাক, লালশাক, ডাঁটা, কুমড়া, ঢেঁরস, লাউ, করলা ইত্যাদি।

"গামরাইতলা গ্রামের একজন সফল সবজিচাষী নূর আলম জানান, তিনি এবার বর্গা নিয়ে প্রায় আড়াই বিঘা জমিতে শাকসবজির আবাদ করেছেন। তিনি এক বিঘা জমিতে গত বছর আমন ধান করে পেয়েছিলেন ৩ হাজার টাকা আর আউশ ধান করে প্রায় ২ হাজার টাকা, সেখানে এ পর্যন্ত তিনি ১ বিঘা জমি থেকে প্রায় ৫০ হাজার টাকার বেগুন বিক্রি করেছেন। অথচ এ জমি দু'তিন বছর আগেও আমন ধান কাটার

পর ফেলে রেখে বৈশাখে গিয়ে আবার তাতে আউশ ধান লাগানো হতো। নূর আলম নিজের ভ্যানে বেগুন নিয়ে সপ্তাহে দু'দিন খেপুপাড়া ও মহীপুরে বেচতে যান।

"এখন সবজি হচ্ছে, এত বছর কেন হয়নি? বাধাটা কোথায়? এ ব্যাপারে উপজেলা কৃষি অফিসার জানালেন, মূলত উপকূলীয় এলাকায় সবজির আবাদ হয় না তিনটি কারণে। লবণাক্ততা, পানির অভাব ও বেলে মাটির কারণে। তবে সেচসমস্যা এখানে বড় বাধা। এখানকার কৃষি মূলত বৃষ্টিনির্ভর। একটু সেচসুবিধা দিতে পারলেই এসব এলাকায় যশোরের মতো সবজি ফলতে পারে বলে তিনি জানান। কৃষি বিভাগের মতে, ১০ বছর আগেও কলাপাড়া উপজেলায় কেউ সবজি চাষ করতেন না। এখন এ উপজেলায় প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমিতে শাকসবজির আবাদ হচ্ছে। তবে এই চাষ এখনো নীলগঞ্জ ও ধানখালি ইউনিয়নেই সীমাবদ্ধ। আর এটা সম্ভব হয়েছে পাখিমারা খালের কারণে। এই খালের দুই মাথা বন্ধ করে দেওয়ার পর এটি এখন প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা এক প্রাকৃতিক লেকে পরিণত হয়েছে। বর্ষাকালে এই খাল কানায় কানায় পানিতে ভরে যায়। এ সময় পানিতে কোন লবণ থাকে না। বর্ষা চলে যাওয়ার পর প্রাকৃতিক পানির এ মজুদ থেকে কৃষকরা সেচ দিয়ে খালের দুপাড়ে গড়ে তুলেছেন তাদের সবজি ক্ষেত। তবে খালের দুপাড়ে যে জমি আছে সে তুলনায় আবাদ করা হচ্ছে সামান্যই। এখানে অনেকে জমি থেকে চারপাশে মাটি তুলে পাড় উঁচু করে চিংড়ি ও ধান চাষের উদ্যোগ নিয়েছেন। ফলে সবজি চাষের বিষয়টি ধাক্কা খেতে পারে বলে সংশ্লিষ্টরা আশংকা করছেন।

"সব মিলিয়ে পটুয়াখালীর প্রত্যন্ত এ নীলগঞ্জ ইউনিয়ন এক অনন্য উদাহরণ। এখানকার বৃদ্ধ চাষী সফিজ উদ্দিন ঘরামি ১০-১২ বছর আগে সবজিচাষ শুরু করেছিলেন। তার সাফল্যে উদ্দীপ্ত হয়ে এখন মধুসূদন মিস্ত্রি, প্রদীপ ভৌমিক, শহীদুল, নূর আলমরা এগিয়ে এসে উপকূলীয় কৃষিতে নিয়ে এসেছেন পরিবর্তনের আভাস। যে এলাকায় এতদিন শুধু বৃষ্টিনির্ভর ধান হতো, এখন সেখানে আমন ধানের পর সবজি, সবজির পর ফের সবজি, কিছু জমিতে আউশেরও চাষ হচ্ছে। যারা এখন সবজি চাষ করছেন তারা চান সঠিক পরামর্শ ও ভালো জাতের বীজ। তাহলে তারা আরো বড় কিছু করতে পারবেন। কেননা ইতিমধ্যে তারা সেই সাফল্যের নজির স্থাপন করেছেন। আর তা যদি সম্ভব হয়, তাহলে পাখিমারা বাজার থেকে স্থানীয় অধিবাসীরা যেমন প্রতিদিন টাটকা সবজি কিনে খেতে পারবেন, তেমনি কলাপাড়া উপজেলার ৩ লাখ মানুষও খেপুপাড়ায় বসেই পেয়ে যাবেন তরতাজা সব সবজি"।

শাকসবজি উৎপাদনে বিভিন্ন সমস্যা ঃ

১। শাকসবজির খাদ্যমান ও পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আমাদের কৃষকরা তেমন সচেতন নয়; অধিকাংশ কৃষকই অশিক্ষিত বিধায় আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে শাকসবজির ভূমিকা সম্পর্কিত প্রকৃত ধারণা না থাকায় শাকসবজি উৎপাদনে তারা যথার্থ গুরুত্ব প্রদান করছে না।

২। কৃষকদের জন্য শাকসবজি উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই বিধায় এ বিষয়ে তাদের সম্যক জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

৩। গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে শহর এলাকা থেকে দূরের গ্রামাঞ্চলসমূহে কীটনাশক ওষুধ, সার কিংবা শাকসবজির উচ্চফলনশীল বীজ কৃষকদের নিকট সহজপ্রাপ্য নয়।

৪। শাকসবজি চাষের ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত উদ্যোগের অভাব।

৫। শাকসবজি উৎপাদনে কৃষকগণকে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়ে কোন কার্যকর পদক্ষেপ কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ কর্তৃক নেয়া হচ্ছে না।

৬। প্রবল বর্ষণ ও অনাবৃষ্টিকালীন দুর্যোগ মোকাবিলায় কৃষকদের আস্থাহীনতা ও পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব।

৭। শাকসবজি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত জমির অভাব।

৮। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণের কোন সুবিধা না থাকা।

সমস্যা সমাধানকল্পে সুপারিশ ঃ

উপর্যুক্ত সমস্যাবলী সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১। শাকসবজির উৎপাদন ও খাওয়ার বিষয়ে কৃষক ও সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরনের জন্য বিস্তারিত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

২। স্থানীয়ভাবে কৃষকদেরকে শাকসবজির উৎপাদন ও তার পুষ্টিগুণের বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৩। শাকসবজি উৎপাদনকারীদের জন্য স্থানীয়ভাবে উচ্চফলনশীল বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি সহজলভ্য করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪। কৃষকদের মধ্যে যারা শাকসবজি উৎপাদন করেন, তাদেরকে সারা বছরব্যাপী শাকসবজি উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য তাদেরকে স্বল্পসুদে ক্ষুদ্র ঋণের আকারে ঋণ প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং সার ও উচ্চফলনশীল বীজের উপর ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৫। অতিবর্ষণ ও অনাবৃষ্টি উদ্ভুত দুর্যোগ ও অন্যান্য সমস্যাবলীকে মোকাবিলা করার জন্য শাকসবজি উৎপাদনকারী কৃষকগণকে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৬। আমাদের দেশে শাকসবজি উৎপাদনের হার দৈনিক মাথাপিছু মাত্র ৫৩ গ্রাম। সুতরাং শাকসবজির উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে উপযোগী জমির পরিমাণও বাড়াতে হবে। এজন্য কৃষকদেরকে ও জমির মালিকগণকে উৎসাহিত করার জন্য নীচু জমিতে মাটি তুলে প্রয়োজনীয় পরিমাণে উঁচু বা উন্নত করতে সরকারিভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে;

৭। কৃষকদেরকে শাকসবজি উৎপাদন ও খাওয়ার বিষয়ে এবং সাধারণ জনগণকে শাকসবজি খাওয়ার বিষয়ে সচেতন ও উৎসাহিত এবং উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে জেলা ও থানা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মকর্তাগণকে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করাসহ একটি সুস্থ, সবল জাতি গড়ে তুলতে হলে শাকসবজির উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে খাদ্য গ্রহণের বিষয়ে একটি পরিবর্তন আনা এখন সময়ের দাবী। মানুষের মধ্যে এ ধারণা ছড়িয়ে দিতে হবে যে প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি উৎপাদন ও তা আহার্য হিসেবে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

আলুকে যদি চালের পাশাপাশি অন্যতম প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা যায়, তবে চালের উপর চাপ তো কমবেই বরং আমরা একটি চাল রপ্তানীকারক দেশ হিসেবে পরিচিত হতে পারি। সুতরাং বাংলাদেশে খাদ্যাভাস পরিবর্তন এ মুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু অন্যান্য ফসলাদির চেয়ে শাকসবজির উৎপাদন ব্যয় কম, এবং যেহেতু শাকসবজি উৎপাদনে শ্রম ও সময় অপেক্ষাকৃত কম, এবং যেহেতু অন্যান্য ফসলাদির তুলনায় শাকসবজির উৎপাদন অধিকতর লাভজনক, সেহেতু কৃষক ও জনগণ যতশীঘ্র শাকসবজির অফুরন্ত সম্ভাবনার বিষয়ে অবগত হতে পারবে- ততই পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হবে। শাকসবজি উৎপাদনের লক্ষ্যে অধিক পরিমাণ জমি ব্যবহারোপযোগী করে তুলতে হবে এবং তাতে স্বাভাবিকভাবেই ব্যাপক সংখ্যক বেকার ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

Bibliography

1. Report of the Brandish Household Expenditure Survey, 1985-86, 1888-89, 1991-92 and 1995-96, BBS.
2. Krishikatha, Falgoon-1410, published by Khamar Bari, Dhaka.
3. Prices and Wages Section, BBS.
4. Department of Agriculture Extension, Khamar Bari, Dhaka.
5. Agriculture Statistics Wing, BBS.
6. Krishikatha, Published by Khamar Bari, Dhaka, Magh.
7. Empirical Survey on the basis of random sampling.

Bibliography

1. Report of the Brandish Household Expenditure Survey, 1985-86, 1888-89, 1991-92 and 1995-96, BBS.
2. Krishikatha, Falgoon-1410, published by Khamar Bari, Dhaka.
3. Prices and Wages Section, BBS.
4. Department of Agriculture Extension, Khamar Bari, Dhaka.
5. Agriculture Statistics Wing, BBS.
6. Krishikatha, Published by Khamar Bari, Dhaka, Magh.
7. Empirical Survey on the basis of random sampling.

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০
ISSN-1605-7023

ভূমি ব্যবস্থাপনা ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

ব্যোমকেশ তালুকদার*

Abstract Land is still the most important surce of livelihood in Bangladesh. Land management has become one of the important issues of Bangladesh for its sustainable development and poverty alleviation. It is the oldest management system in Bangladesh. The present land management has introduced in the colonial period. Since then it remained almost same. A few initiatives have been taken for the modernization of the land management of Bangladesh except some land surveys. In this article attempt has been made to show how land is being managed at present and how does land administration work.

ভূমিকা ঃ

প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের মধ্যে ভূমিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভূমির সাথে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান জড়িত। অর্থনীতির চারটি উপাদানের অন্যতম হচ্ছে ভূমি। ১৮ শতকের আগে ভূমিকে উন্নত বিশ্বের আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে ধরা হত। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রাচীন রাজ্যসমূহের প্রধান আয়ের উৎসই ছিল ভূমি। পরবর্তী উন্নয়নের পুঁজি আসে ভূমির উদ্বৃত্ত আয় হতে। এখনো স্থাবর সম্পত্তির পুরোটাই প্রায় ভূমি এবং ভূমির সংযুক্ত সম্পদ বা সম্পত্তি। অর্থনীতির ভাষায় উন্নয়নের পুঁজি আসে ভূমির উদ্বৃত্ত আয় হতে এবং অর্থনীতির বুনিয়াদই ভূমি। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তির যে মূল্য তার বেশীর ভাগই ভূমি। আমাদের দেশে জাতীয় আয়, দেশীয় সঞ্চয়, কর্মসংস্থান সবই ভূমির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট ১৯৮৭ অনুযায়ী ভূমি বলতে যে কোন জমি বা সরকারি অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানায় অথবা দখলে অথবা ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত এবং জলমগ্ন এলাকাও এর অন্তর্ভুক্ত বুঝাবে (অধ্যাদেশ নম্বর ২৪/৭০ ধারা ২(মি)। আবার এসএ এন্ডটি এ্যাক্ট এর ২ (১৬৩) ধারা অনুযায়ী ভূমি হতে সৃষ্ট সুবিধাদি তদস্থিত বাড়িঘর দালানকোঠা, মাটির সহিত সংযুক্ত দ্রব্যাদি ও মাটির সহিত স্থানীয়ভাবে প্রোথিত যে কোন জিনিসসহ কৃষি বা কৃষি জমি এবং বৎসরের যে কোন সময় জলমগ্ন জমি ভূমি হিসাবে গণ্য। আবার যে কোন আদালতের রায়, আদেশ কিংবা প্রচলিত যে কোন আইনে যাহাই থাকুক না কেন ভৌগোলিক সীমানা দ্বারা

* মূল্যায়ন কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সীমিত বা পৃথক ভাবে অবস্থিত সকল মৎস্য ক্ষেত্র ২(২৬) উপধারায় বর্ণিত ভূমির অন্তর্ভুক্ত হবে।

সবচেয়ে প্রাচীন ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনই হচ্ছে ভূমি প্রশাসন। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। শুধু ভূমি হতে কর সংগ্রহের জন্য নয় ভূমির মালিকানায় রেকর্ড বা সত্ত্বলিপি সংরক্ষণ, প্রণয়ন ও পরিবর্তন, জমি হতে কর আদায়, উন্নযনের জন্য স্থায়ীভাবে জমি অধিগ্রহণ (Acquisition) ও অস্থায়ীভাবে (Requisition) হুকুম দখল, জমি ক্রয়-বিক্রয়, জমি হতে উদ্ভূত মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ইত্যাদি কারণে ভূমি ব্যবস্থাপনা বর্তমানেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ভোগান্তি এবং অভিজ্ঞতার আলোকেই ভূমি ব্যবস্থাপনার আইন বর্তমান পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। মূলত ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস গড়ে উঠেছে। ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করবার জন্য সম্পূর্ণ সময়কে কয়েটি আমলে ভাগ করে নেওয়া যায়। যেমন হিন্দু আমল, মুসলিম আমল, বৃটিশ আমল, বর্তমান আমল (পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল)।

হিন্দু আমল ঃ

হিন্দু শাসন আমলে এই দেশে পরিবার ভিত্তিক যৌথ সমাজব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তখন যে ব্যক্তি বা পরিবার জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষাবাদ করত তারাই ভূমির মালিক হত। তখন রাজা, রাজস্বের মালিক হিসাবে মোট ফসলের একটি অংশ কর হিসাবে গ্রহণ করত। উৎপাদিত ফসল কয়টি ভাগে ভাগ করে রাজাকে পরিশোধ করা হত তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে উৎপাদিত ফসল এবং উহার পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ হতে এক-ষষ্ঠাংশ পর্যন্ত ছিল বলে জানা যায়। সম্রাট অশোকের আমলে কৃষির আয় হতে গ্রহণ করা হত ০১ রাজস্ব। রাজার প্রতিনিধি হিসাবে রাজার অংশ সংগ্রহের জন্য রাজকর্মচারী নিয়োজিত থাকত। এই রাজকর্মচারীরা ছিল স্থানীয় গ্রাম বা সমাজের কর্তাব্যক্তি। তারাও রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজস্ব সংগ্রহ ও স্থানীয় শন্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখবার দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ পেত। এতে একটি বিষয় সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়া গেল যে, হিন্দু আমলেই মধ্যস্বত্ব ভোগীদের সৃষ্টির গোড়াপত্তন হয়। তবে প্রাচীন হিন্দু শাসন আমলে রাজা জমির মালিকানা দাবি করতেন না। মনু সংহিতায় বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী বনজঙ্গল পরিস্কার করে যিনি জমিকে চাষের উপযোগী করতেন তিনিই জমির মালিক হতেন। এই মালিককে মালিক-চাষী বলা হত। এই চাষী রাজাকে উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ প্রদান করে জমি ভোগ দখলে রাখার

অধিকারী হত। এই চাষীর উপর জমি চাষাবাদের জন্য একটা বাধ্যবাধকতা ছিল। কোন মালিক-চাষীর অবহেলার কারণে ভূমির ক্ষতিসাধিত হলে রাজদন্ড হিসাবে রাজাকে নির্ধারিত রাজস্বের দশগুন ফসল জরিমানা হিসাবে দিতে হত।

মুসলিম আমল ঃ

মধ্যযুগে মুসলিম সম্রাট ও বাদশাহগণ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করার পর প্রাথমদিকে প্রচলিত রীতিনীতি অনুসরণ করে ভূমি ব্যবস্থাপনা করতে থাকেন। ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খিলজি ১২০১ সনে লক্ষণ সেনের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর ধীরে ধীরে বাংলার শাসন ক্ষমতা মুসলমান শাসকদের হাতে চলে যায়। এ সময় বেশীর ভাগ রাজা বাদশাহই রাজ কর্মচারী দিয়ে সরাসরি খাজনা আদায় করতো।

সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি ভূমি রাজস্বকে সুশৃংখল করার ও বে-আইনী ভূমি ভোগকারী লোকদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। মুসলিম আমলেই সিকান্দার শাহ (১৩৫৭-১৩৮৯) একটা সার্ভে বা জরীপ করার চেষ্টা করেন। এটিই বাংলাদেশের প্রথম জরীপ যদিও বর্তমানের মত বিজ্ঞান সম্মত নয়। তখন গজ দিয়ে জমি মাপা হতো তাই সেই গজকে বলা হত সিকান্দারী গজ। ১৫৪০ সাল হতে ১৫৪৫ সাল পর্যন্ত শেরশাহ্ সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। শেরশাহের আমলে ৪ ভাগের ১ ভাগ ফসল দেওয়া হতো খাজনা হিসাবে। তবে শেরশাহ-এর আমলে জরিপ ব্যবস্থাপনার প্রশ্নটি উঠেছিল ভূমি রাজস্ব কিভাবে নির্ধারণ করা হবে উহার পদ্ধতি বা উপায় নির্ধারণের জন্য।

জমিদারী প্রথা মূলত মুসলিম শাসন আমলেই প্রবর্তিত হয়। তাদের আমলের জমিদারী প্রথা ছিল অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং তদানীন্তন জমিদারগণ খাজনার হার নির্ধারণ করতে পারতেন না। মুসলিম শাসন আমলে জমিদারগণ সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে খাজনা আদায় করতেন এবং এই জন্য তারা খাজনার আদায়কৃত অংশের একটি আংশিক পরিমাণ প্রাপ্য হতেন মাত্র। ভূমির মালিকগণ বংশানুক্রমিকভাবে ভূমির মালিকানা ভোগ দখল করতে পারতেন। মোঘল সম্রাট আকবরের শাসনামলে তার উজির টোডরমলের সহযোগিতায় ভূমি ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। মুসলিম শাসন আমলের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ভূমি সংস্কারক ছিলেন বাদশাহ অকবরের সভাসদ টোডরমল। এই সময়ে ভূমির সর্বজনীন মানসম্মত মাপ ও জরিপ প্রচলন করা হয়। এই সময়ে জমি দশ বৎসরের জন্য কৃষকের নিকট বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়।

ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনের সুবিধার্থে এ সময় সুবে-বাংলাকে ১৯টি জেলায় বিভক্ত করা হয়। প্রতি জেলাকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করা হয়েছিল। সম্রাট

আকবরের সময়ে ভূমি রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে দেওয়ানী ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। দেওয়ান ছিল প্রদেশের বা সুবার রাজস্ব বিষয়ক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী সময়ে কালক্রমে মোঘল শাসন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। এসময় রাজস্ব প্রশাসনের ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল।

বৃটিশ আমল ঃ

এদেশে বৃটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে। সিরাজদ্দৌলার পতনের পর মীর জাফর আলী খাঁ নামেমাত্র বাংলার নবাব ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কর্তৃত্ব চলে যায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে। এদেশে বাণিজ্য করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বৃটেনের রাজকোষ হতে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ও সোনারুপা বরাদ্দ নিতে হত। এক সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে উল্লিখিত বরাদ্দ পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে এবং বাণিজ্যের প্রয়োজন মিটানোর জন্য কোম্পানীকে উচ্চহারে রাজস্ব আদায় করতে হয়। কিন্তু অনভিজ্ঞতার কারণে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার পরিচয় দিতে থাকে। সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে রাজস্ব আদায় করা অসম্ভব বুঝতে পেরে তারা রাজস্ব আদায়ের মাধ্যম হিসাবে মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদার নিয়োগ করে। ইংরেজদের রাজস্ব আদায়ের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিতে থাকে এই সকল মধ্যস্বত্বভোগীরা। অপরদিকে ১১৭৬-এ বাংলায় (ইংরেজী ১৭৬৯-৭০ সনে) এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। ফলে ভূমি রাজস্ব আদায় হ্রাস পায়। ১৭৬৯ সনে ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যেক পরগণায় একজন ইংরেজ রেভিনিউ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ভূমি রাজস্ব আদায় ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুপারভাইজারের স্থলে রেভিনিউ কালেক্টর নিয়োগ করেন এবং পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য সর্বোচ্চ নিলামকারীর অনুকূলে জমির খাজনা বৃদ্ধি করে জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থা পাঁচশালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। এই পাঁচশালা বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ প্রজাদের নিকট হতে খাজনা আদায় করতে সক্ষম হলেও তারা কোম্পানীর খাজনা পুরোপুরি পরিশোধ করে নাই। ফলে পাঁচ বছর মেয়াদী বন্দোবস্তের সময়কাল সমাপ্ত হওয়ার পর ১৭৭৭ সনে এক বছর মেয়াদে সর্বোচ্চ নিলামকারীর অনুকূলে জমিদারী বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতেও খাজনা আদায়ের ব্যর্থতা দুরীভূত না হওয়ায় ১৭৮৬ সনে লর্ড কর্নওয়ালিশ গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হওয়ার পর ১৭৯০ সালে দশ বছর মেয়াদী জমিদারী বন্দোবস্ত দেয়া হয়। এই ব্যবস্থা ডেসিনিয়াল সেটেলমেন্ট বা দশসালা বন্দোবস্ত নামে পরিচিত। দশসালা পদ্ধতিও কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ দশসালা বন্দোবস্তের পরিবর্তে চিরস্থায়ী

বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বাংলার কৃষক জমির মালিকানা হারায় এবং জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীগণ জমির মালিক হয়। এই জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণীর মাধ্যমে ইংরেজরা বাংলার কৃষকদের ১৯০ বছর শোষণ করে। এই ব্যবস্থার ফলে ইংরেজদের সহিত জমিদারদের সম্পর্কের উন্নয়ন হলেও কৃষকদের সহিত জমিদারদের সম্পর্কের দিন দিন অবনতি ঘটতে থাকে। এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর ভূমি রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করবার জন্য ইংরেজরা সূর্যাস্ত আইন প্রণয়ন করেন। কোন জমিদার ৩০শে চৈত্রের সূর্যাস্তের পূর্বে নির্ধারিত বার্ষিক রাজস্ব পরিশোধ রিতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট জমিদারী রাজস্ব দেনার দায়ে নিলামে উঠত। ফলে জমিদারগণ যে কোন প্রকারে প্রজাদের নিকট হতে খাজনা আদায় করে কোম্পানীর পাওনা পরিশোধ করে জমিদারী রক্ষা করার চেষ্টা করত। ফলে প্রজাদের উপর জমিদারদের অত্যাচার আরও বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এই সিপাহী বিদ্রোহ ও গণঅসন্তোষের কারণে ১৮৫৯ সালে রেন্ট এ্যাক্ট পাস করে প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা ও জমিদার-সরকারের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। বৃটিশ সরকার এ সময়ে ভারতের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিবর্তে নিজেদের হাতে নেয়। রেন্ট এ্যাক্টের বিধান বাস্তবায়ন না হওয়ায় ১৮৭৯ সালে রেন্ট কমিশন গঠন করে প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা ও জমিদার-সরকারের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি রচনার জন্য কমিশন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করবার সুপারিশ করে। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের স্থলে ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস করেন। এই আইনের ফলে ১২ বছরের দখলদার চাষীরা প্রজা হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং চাষীর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীগণ জমির মালিকানার অধিকার পায়, কিন্তু কয়েকবার এই আইন পরিবর্তন করেও জমিদারগণ কর্তৃক প্রজা নির্যাতন বন্ধ করা যায় নাই। ফলে ১৯৩৮ সালে স্যার ফ্রান্সিস্ ফ্লাউড-এর নেতৃত্বে ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশন ফ্লাউড কমিশন নামে পরিচিত। ফ্লাউড কমিশন জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাদের সরাসরি সরকারের অধীনে রাখার সুপারিশ করে। জমিদারগণ এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের বিরোধিতা করে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পূর্বেই প্রাদেশিক পরিষদে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে প্রজাস্বত্ব আইন পাস করবার জন্য বিল পেশ করা হয়।

বৃটিশ আমলেই সর্বপ্রথম ১৮৮৫ সালের বিটি এ্যাক্ট বা বেংগল টেনান্সি এ্যাক্ট, তার আগে ১৭৯৩ সালের বন্দোবস্ত, ১৯৫৮ সালের রেন্ট এ্যাক্ট, ১৮৯০-১৯৪০ সালের Cadastral Survey বা CS খতিয়ান তৈরী হয়। ১৯৩৮ সালের বেংগল ল্যান্ড রেভেনিউ কমিশন বা Floud Commission (Francis Floud এর নামানুসারে হয়)। এই কমিশন ১৯৪০ সালে রিপোর্ট দেয়। এই কমিটির রিপোর্ট ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য ১৯৪৪ সালে Bengal Administrative Enquiry committee গঠিত

হয়। জমিদারদের অত্যাচার, শহরের বিলাসবহুল জীবন ও উন্নত ধরনের ভোগ সম্ভোগ ও আমোদ-ফূর্তি, শিল্পের জন্য পুঁজি গঠন না করা, কৃষির উন্নয়নের জন্য কোন খরচ না করা ইত্যাদি সম্পর্কে কমিটি Floud কমিশনের সাথে একমত পোষণ করেন। টাকা হাতে আসলেই ভালো খেয়ে পরে নেচে গেয়ে আমোদ-ফূর্তি করে সব খরচ করে ফেলবে এটাই ছিল জমিদারদের সব সময়কার চিন্তাভাবনা। সুতরাং দেশও দশের উন্নয়নের ও জীবন রক্ষার স্বার্থে জমিদারী উচ্ছেদের জন্যই সুপারিশ রাখা হলো। ১৭৭২ সাল হতে বর্তমানের Collector (ADC Revenue) এর পদ তৈরী করা হলো এবং ১৮টি জেলায় ১৮ জন Collector নিয়োগ করা হলো।

Collector-রা কৃষকদের প্রতি সদয় ছিল ও রাজস্ব কম ওঠাতো বলে ১৭৭৩ সালের ২৩শে নভেম্বর আবার Collector এর পদ বিলোপ করা হয় এবং ৬টি বড় ডিভিশন তৈরী করে কমিশনার নিয়োগ করা হয়। ১৮১৯ সালে আমীর ও দেওয়ানদের দ্বারা রাজস্ব আদায় শুরু হয়। ১৭৭৩ সালে বিলোপের পর ১৭৮১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারীতে আবার Collector এর পদ তৈরী করা হয় এবং তাদের আবার আদালতের দায়িত্ব দেয়া হয়। এই সময় Pit's India Act পাশ হয়। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার Collector গণ একত্রে করতে পারতো এই আইন বলে। ১৭৮৫ সালে পুলিশের, ফৌজদারী আদালত ও দেওয়ানী আদালতের দায়িত্বে ছিল Collector গণ। ৪টি কিস্তিতে জমিদারকেও Collector এর অফিসে যেয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে খাজনা জমা দিয়ে আসতে হতো। তা না হলে জমিদারীও নিলাম হতো, প্রজারা খাজনা না দিলে জমিদার খাজনা ঠিক সময়মত দিয়ে আসতো। ১৮৫৮ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ক্ষমতায় এলে Rent Act পাশ হলো। মহারাণী ভিক্টোরিয়া রায়তদের দয়া, স্নেহমমতা ও সম্মানের চোখে দেখতেন। ফলে ঃ-

১. আদালতের রায় ব্যতীত প্রজাকে বাস্তুভিটা হতে উৎখাত করা যেতো না, প্রজা এক জায়গায় বসবাস করার অধিকার পেলো।

২. পাট্টা কবুলিয়তের শর্ত কার্যকরী হলো, জুলুম করে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা যেতো না হিসাবের বাইরে।

৩. যাতে নায়েবরা খাজনা দিলেও দেয় নাই বলতে না পারে সে জন্য খাজনার রসিদ চালু হলো। এতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কিছু সহ্যের ভিতর এলো, রাইয়তেরা জুলুম হতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো।

১৮৮০ সালে Rent Commission রিপোর্ট দেয়। ১৮৮৫ সালের ১৪ই মার্চ লন্ডনের আইন সভায় বংগীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। এর ফলে স্বত্বলিপি ও জমিদারী একত্রে চললো। তখন রাইয়তের অধিকার ও জমিদারের অধিকার বা সম্মান সমান চোখে দেখা হতো। এ আইনের ফলে জমি ১২ বছর প্রজার দখলে থাকলে প্রজাকে

উচ্ছেদ করা যেতো না, প্রজা জামিদারের মত একই পাড়ার অধিবাসী হিসাবে অধিকার ও সম্মান পেতো। এতে চাষীর ইচ্ছার ভিতর চাষও আসলো। সম্পূর্ণ মালিকানা না পেলেও কৃষকেরা জমি বেচতেও পারতো এবং ওয়ারিশ সূত্রেও মালিক হতে পারতো কিন্তু বড় বড় গাছ কাটতে পারতো না। জমির পরিমাণ, খাজনার পরিমাণ ও অন্যান্য অধিকার স্বত্বলিপিতে বা ১নং রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হত।

বর্তমান আমল ঃ

১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর প্রাদেশিক পরিষদে উত্থাপিত বিল ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গ পরিষদে বিস্তারিত আলোচনার পর পাস করে আইনে পরিণত করা হয়। ইহা ১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন যা রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ প্রজাস্বত্ব আইন নামে পরিচিত। এই আইন বাস্তবায়নের ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় মধ্যস্বত্ব প্রথার বিলোপ সাধিত হয়। এই আইনের ফলে পরিবার প্রতি ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় ৩৭৫ বিঘা। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ ৯৮ জারি করা হয়। এই আদেশ জারি হওয়ার ফলে পরিবার প্রতি ভূমিসীমা নির্ধারণ করা হয় ১০০ বিঘা এবং ১০০ বিঘার অতিরিক্ত ভূমি সরকার বরাবরে সমর্পণ করার আদেশ হয়। পরবর্তীকালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ জারি করা হয় এবং পরিবার প্রতি ভূমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয় ৬০ বিঘা। তবে যাদের ১০০ বিঘা ভূমি আছে তাদের ১০০ বিঘা রাখার অধিকার বহাল রাখা হয় কিন্তু নতুন করে কোন পরিবারকে ৬০ বিঘার অধিক জমি অর্জন করতে এই আইন বাধা হিসাবে কাজ করে। ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ ১৯৮৪ বর্তমানে বহাল আছে। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য ১-৭-৮৭ ইং তারিখে খাস জমি বণ্টন কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতিমালা জারি করা হয়। পরবর্তীকালে উক্ত নীতিমালা বাতিল করে ১৯৯৫ সালে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা জারি করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা জারি করা হয়। বর্তমানে এই নীতিমালা দুইটির বিধান মোতাবেক কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বর্তমানে ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ। পরিবার প্রতি জমি রাখার পরিমাণ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে উহা ৬০ বিঘা তবে আগের আইনে যার ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি আছে তা থাকবে এবং নতুন করে কোন পরিবার ৬০ বিঘার বেশী ক্রয়সূত্রে বা ওয়ারিশ সূত্রে জমির মালিক হতে পারবেন না। ওয়ারিশ সূত্রে মালিক হয়ে গেলে সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা নিজ দখলে নিয়ে নিবেন। কিন্তু বর্তমানে পরিবার প্রতি সিলিং ৬০ বিঘা।

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ ঃ

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দুই ধরনের ব্যবস্থাপকের সমন্বয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিরাজমান ঃ

- ০ জেলা প্রশাসকের অফিস ও
- ০ ডিজিএলআর এন্ড এস অফিস।

জেলা প্রশাসকের অফিস রাজস্ব আদায় ও ফৌজদারী রাজস্ব ও মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পৃক্ত এবং ডিজিএলআর এন্ড এস অফিস জমি রেকর্ডকরণ, নামজারীকরণ, রেকর্ড সংশোধন ও বিভিন্ন দেওয়ানী মামলা মোকদ্দমার সাথে সম্পৃক্ত। ইউনিয়ন ভূমি অফিস, থানা ভিত্তিক কানুনগো, সেটেলমেন্ট অফিসার, এডিসি (রাজস্ব), ডিজিএলআর অফিস, ভূমি আপীল বোর্ড ও ভূমি সংস্কার বোর্ড বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকে।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য সর্বনিম্নে মাঠ পর্যায়ে আছে ইউনিয়ন ভূমি অফিস। এটা আগের তহশিল অফিস বা কাছারি।

থানা ভিত্তিক কানুনগো ঃ ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর অডিট ও পরিদর্শনের জন্য আছে থানা ভিত্তিক কানুনগো। একজনের ভূমি আর একজনের নামে ভূলক্রমে বা মিছেমিছিভাবে নামজারী করানো হলে ঐ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসার ভার মাঠ পর্যায়ে কানুনগোর উপর ন্যস্ত। ৩ ধরনের কানুনগো আছে। এসি (ভূমি) ও কানুনগো একই অফিসে বসার কথা; এডিসি (রাজস্ব) এর জেলা কানুনগো বা থানা কানুনগো আছে। তবে জেলা সদরের সেটেলমেন্ট অফিসেই তাকে বসতে দেখা যায়। সেটেলমেন্ট অফিসের স্বত্বলিপি, মৌজা ম্যাপ তৈরি ও ১ নং রেজিস্টার তৈরির জন্য কানুনগো সেটেলমেন্ট অফিসে বসেন।

সেটেলমেন্ট অফিসার ঃ সেটেলমেন্ট কার্যে আছেন উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার এবং সহকারী কমিশনার ভূমি, থানা সাব-রেজিস্ট্রার (হাকিম) বা জয়েন্ট রেজিস্ট্রার (জেলা প্রশাসকের সাথে জয়েন্ট বলে)।

এডিসি (ADC) ঃ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আছেন জেলা পর্যায়ে এবং তার সহকারী হিসেবে আছেন আরডিসি (RDC) এবং তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে আছেন জেলা প্রশাসক (DC)। সরকারি জমির নামজারীর জন্য এডিসি আছেন (রাজস্বেরও সম্পর্ক সেটেলমেন্ট অফিসের সাথে)। এডিসি নাম খারিজের ভুলভ্রান্তি বা খসড়া স্বত্বলিপি বা মাঠ পর্চার উপর সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়ে কাজকর্ম করে থাকেন এবং তথ্যানুযায়ী ভূমি সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি সংশোধন করে তিনি সত্যায়িত করার দায়িত্বে ন্যস্ত থাকেন।

মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড বা ডিজিএল আর এন্ড এস অফিস ঃ এটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে। ভূমি জরীপ, নতুন স্বত্বলিপি ও মৌজা নকসা প্রণয়নের জন্য মহাপরিচালক ভূমি রেকর্ড বা ডিজিএলআর এন্ড এস অফিস কাজ করে থাকে। এখানে সেটেলমেন্ট অফিসার (উপ-সচিব পর্যায়ের) ও তার নিম্ন পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ, আমীন (সর্দার আমীন ও বদর আমীন) ও চেইন ম্যান ইত্যাদি থাকে।

ভূমি আপীল বোর্ড ঃ

ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সর্বোচ্চ আপীল ফোরাম গঠনের উদ্দেশ্যে ভূমি রেকর্ড আইন, ১৯৮৯ জারীর মাধ্যমে ভূমি আপীল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। একজন চেয়ারম্যান ও অনধিক দুইজন সদস্য নিয়ে ভূমি আপীল বোর্ড গঠিত। ভূমি আপীল বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে এসি (ভূমি), তহসীলদার, এডিসি (রাজস্ব) রয়েছে। বর্তমানে বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাহী বিভাগের লোক। বর্তমানে এই বোর্ড নিম্নোক্ত বিষয়ে আপীল বা রিভিশন আবেদন নিষ্পত্তি করতে পারবেন ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা।

(খ) নামজারী ও জমা খারিজ।

(গ) পরিত্যাক্ত, অর্পিত ও বিনিময় সম্পত্তি [আম মোক্তারনামা বা Power of attorney ১৯৫১ সাল পর্যন্ত) একটা সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল]।

(ঘ) জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, হাটবাজার ইত্যাদির ইযারা।

(ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর ও সার্টিফিকেট মামলা।

(চ) খাস জমির বন্দেবস্ত (১ টাকার ডিসিআর গ্রহণ এর মাধ্যমে ৯৯ বছরের জন্য প্রতি পরিবার প্রধান ও তার স্ত্রীর নামে সর্বোচ্চ ১ একর পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর জমি ও ২ একর পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর জমির বন্দোবস্ত)।

(ছ) রেকর্ড অব রাইট বা স্বত্বলিপি সংক্রান্ত মামলা।

আপীল ও রিভিশন ছাড়াও বোর্ড বা এর সদস্য তার বা পূর্বসূরীর প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। প্রত্যেক সদস্যের রায় বোর্ডের রায় বলে বিবেচিত হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে যদি একজন সদস্যের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যানের নিকট অবেদন করেন। ভূমি আপীল বোর্ড এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ নির্বাহী বিভাগের লোকজন। সহকারী কমিশনার (ভূমি), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নির্বাহী বিভাগের লোকজন। বোর্ডের নিজস্ব আদেশ কার্যকর ও বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা নেই এই জন্য এর

কার্যকারিতা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল তবে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর বোর্ডের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বর্তমানে বিদ্যমান আছে।

ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মাঠ পর্যায়ে মীমাংসা না হলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এতদসংক্রান্ত বিষয়ে শুনে থাকেন বা আপীল গ্রহণ করেন। এসি (ভূমি) অফিস হতে এবং তার অফিসেও মীমাংসা না হলে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট আপীল করা হয়। বিভাগীয় কমিশনারের অফিস হতে ভূমি আপীল বোর্ডে আপিল গঠন করা হয়। সেখানেও মীমাংসা না হলে দেওয়ানী আদালতে মামলা রুজু করতে হয়, যা দেওয়ানী বিচার সংক্রান্ত কার্যক্রম।

ভূমি সংস্কার বোর্ড ঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন, ১৯৮৯ জারী করে ভূমির বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা ও ভূমিতে উৎপাদন, বর্গা, মালিকানা ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ড গঠন করা হয়েছে। এর কার্যাবলী ঃ

(ক) সরকার কর্তৃক অর্পিত ভূমি সংস্কার, ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন। ও

(খ) কোন আইনের দ্বারা বা আইনের অধীনে (যেমন ১৯৫০ সনের জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন) অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন।

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৯৮৪ সালের ভূমি সংস্কার আইনের অধীনে সরকারের হয়ে বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করেছে। যেমন ঃ

(ক) পরিবার প্রতি ৬০ বিঘার উপর জমির মালিকানা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(খ) বেনামে কেনা বেচা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(গ) পল্লী এলাকায় অবস্থিত কোন ব্যক্তির বসতবাড়ী হিসেবে ব্যবহৃত জায়গা হতে তাকে কোন আদালত উচ্ছেদ করতে পারবে না তবে, সরকার প্রয়োজনবোধে কোন প্রকল্পের নিমিত্তে একোয়ার বা অধিগ্রহণ করতে পারবেন।

(ঘ) পল্লী এলাকায় বসতবাড়ী ও ভূমিহীনদের অহস্তান্তরযোগ্য হিসেবে ৫ কাঠা পর্যন্ত খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(ঙ) বর্গাচাষ, চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে করতে হবে এবং ৫ বৎসর পর্যন্ত অন্য কোন অঘটন না ঘটলে সে চুক্তি বলবৎ থাকবে।

(চ) তেভাগা পদ্ধতি, ফসল বণ্টনে কার্যকর থাকবে। এ পদ্ধতিতে একভাগ শ্রমদাতার, এক ভাগ জমির মালিকের এবং এক ভাগ চাষের জন্য যে শ্রম ব্যতীত অন্য উপাদানের খরচ জোগায় তার থাকবে।

(ছ) জমি বিক্রয়ের সময় আত্নীয় ব্যতীত অন্য কারো নিকট জমি বিক্রয় করলে বর্গাদারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(জ) একজন বর্গাদার সর্বোচ্চ ১৫ বিঘা পর্যন্ত জমি বর্গাচাষ করতে পারবে।

(ঝ) বর্গাচাষে উপর্যুক্ত আইনের বরখেলাফ হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের (গ্রাম আদালত) নিকট আবেদন ও আপীল করা যাবে।

(ঞ) অন্য কোন আদালতে এ সম্পর্কে মামলা করা যাবে না।

(ট) ভূমি সংস্কার আইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তিস্বরূপ ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা ধার্য করা যাবে। এই আইন ১৯৮৪ সালের ১৪ই এপ্রিল বা ১৯৩১ সালের ১লা বৈশাখ হতে কার্যকর করা হয়েছে।

(ঠ) কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরী নিম্নতম সাড়ে তিন সের চাউল বা তার দাম (প্রচলিত বাজার মূল্যে) দিন প্রতি ধার্য করা হয়েছে; বেশী প্রদান করা যাবে; কম প্রদান করলে বিচারে দ্বিগুণ মজুরী ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে হবে। বিচারের দায়িত্ব গ্রাম আদালতকে দেয়া হয়েছে। ১৯৮৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী হতে এই মজুরীর হার কার্যকর করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের সাথে যুক্ত revenue organogram প্রবন্ধের শেষে দেখানো হল।

ভূমি উন্নয়ন কর/খাজনা মওকুফ ঃ

ভূমি সংস্কার বোর্ড আইন,১৯৮৯ জারীর পূর্বেই ১৯৭৬ সালের ৪২ নং অধ্যাদেশ বলে খাজনার বদলে ভূমি উন্নয়ন করের বিধান চালু করা হয়। নিম্নোক্ত উপায়ের কৃষি ভূমি ও অকৃষি ভূমির উপর ভূমি উন্নয়ন করের বিধান চালু করা হয়ঃ

কৃষি ভূমির উপর ভূমি উন্নয়ন কর

কৃষি জমি	জমির পরিমাণ	করের হার
১ম	০১ একর থেকে ২.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশের ০.৩০ পয়সা হারে। সর্বনিম্ন ১ টাকা।
২য়	২.০১ একর থেকে ৫.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশের .৩০ পয়সা হারে।
৩য়	৫.০১ একর থেকে ১০.০০	প্রতি শতাংশের .৫০ পয়সা হারে।
৪র্থ	১০ একরের উর্দ্ধে	প্রতি শতাংশের ২ টাকা

অকৃষি ভূমির উপর ভূমি উন্নয়ন কর

অকৃষি ভূমির উপর ভূমি উন্নয়ন কর	প্রতি শতাংশে করের হার	
	শিল্প বাণিজ্যে ব্যবহৃত জমি	আবাসিক/অন্য কাজে ব্যবহৃত জমি
১। (ক) ঢাকা শহরের থানা	১০০/০০	২০/০০
(খ) চট্টগ্রাম শহরের থানা	১০০/০০	২০/০০
(খ) খুলনা শহরের থানা	১০০/০০	২০/০০
২। পুরাতন জেলার সদরের পৌরসভা এলাকা	২০/০০	৬/০০
৩। অন্য যে কোন এলাকা পৌরসভার বহির্ভূত	১৫/০০	৫/০০

উৎস ঃ ১৯৭৬ সালের ৪২ নং অধ্যাদেশ।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৬ মোতাবেক ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা সম্পূর্ণ মওকুফ করা হয়েছিল। এতে কৃষকদের জমির দাখিলা পাওয়ার অভাব হয়। এর কারণ সে সময় মানুষের হাতে জমির কাগজপত্র কম ছিল এবং দলিলে দখলের প্রমাণও হাতে ছিল না। তাই জমির দখল প্রমাণের জন্য ঐ সামান্যতম ভূমি উন্নয়ন কর কৃষি জমিতে আরোপ করা হয়। বর্তমানেও ভূমি উন্নয়ন কর কৃষি জমিতে আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু দাখিলা গ্রহণের জন্য প্রতি খতিয়ানে মাত্র দুই টাকার বিনিময়ে ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে প্রতি বছর ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ সংক্রান্ত একটি দাখিলা কৃষকগণ ইচ্ছা করলে আনতে পারেন। জনসাধারণের ব্যবহার্য কবরস্থান, শ্মশান ও জনসাধারণের প্রার্থনার স্থান ও ধর্মীয় উপাসনার স্থানকে ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশেও কর প্রদান হতে অবমুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের ১৫ নং আইন দ্বারা (ঋণ সালিশী আইন) কৃষকদের ঋণের বোঝা হতে পরিত্রাণ দানের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থার বিধান করা হয়েছে ঃ

আইন	বিধান
১ নং	আইনের টাইটেল
২ নং	কৃষকসহ অন্যান্যের সংজ্ঞা।
৩ নং	অন্য আইনের উপর প্রাধান্য।
৪ নং	সই/টিপসহযুক্ত স্ট্যাম্প কাগজগ্রহণ নিষিদ্ধ (ঋণ প্রদানের সময়)।
৫ নং	অগ্রিম ফসল ক্রয় নিষিদ্ধ।
৬ নং	(১) কতিপয় ক্ষেত্রে জমি বিক্রয় খায়-খালাসী, বন্ধক হিসাবে ঘোষণা কৃষক দুর্যোগগ্রস্ত হয়ে ৩০ হাজার টাকার নিচে কোন জমি বেচলে জমির পরিমাণ অনধিক ১ একর হলে সে জমির মূল্য আশেপাশের জমির গড় মূল্যের চেয়ে (সম শ্রেণীর জমির) কম হলে, সে

জমির কেনার পর পুনরায় ক্রেতা বিক্রয় করে না দিলে বা জমিতে বাড়ী ঘর নির্মাণ না করলে বা শিল্প কারখানা নির্মাণ না করলে তা ৭ বৎসর মেয়াদী খায়-খালাসী বন্ধক হিসাবে বিবেচিত হবে। (২) ঋণ-শালিসী বোর্ড কর্তৃক জমি খায়-খালাসী ঘোষিত হয়ে নির্ধারিত সময়ে জমি প্রত্যর্পণ করার জন্য ক্রেতাকে নির্দেশ দিতে হবে।

৭ নং অনধিক দুই একর জমির মালিকেরও উক্তরূপ জমির বিক্রি বাতিল হবে।

৮ নং জমি প্রত্যর্পণের নির্দেশ সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যকর করবেন।

৯ নং প্রত্যর্পিত জমি ৩ বছরের মধ্যে হস্তান্তর (বিক্রি) করা যাবে না।

১০ নং খায়-খালাসী বন্ধক ব্যতীত মহাজনী ঋণের জামানত হিসাবে কৃষকের জমি দখল করা যাবে না।

১১ নং মহাজনী ঋণ লাঘব করা যাবে।

১২ নং সই/টিপসহিযুক্ত অলিখিত স্ট্যাম্প প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

১৩ নং ঋণ শালিসী বোর্ডে থাকবেন একজন চেয়ারম্যান ও ২-৪ জন সদস্য।

১৪ নং বোর্ড, দরখাস্ত গ্রহণ করবে। শুনানী নিবে এবং কেস্ নিস্পত্তি করবে।

১৫ নং বোর্ড বিধি মোতাবেক কাজ করবে, যা ইচ্ছা তাই করবে না।

১৬ নং বোর্ডের নিকট দরখাস্ত করা হলে বোর্ড এর অনুলিপি সহকারী জজের নিকট প্রেরণ করবে।

১৭ নং বোর্ড, বোর্ডের সিদ্ধান্তের অনুলিপি সহকারী জজ/সহকারী কামিশনার (ভূমির) নিকট প্রেরণ করবেন।

১৮ নং বোর্ড সাক্ষ্য প্রমাণ ও দলিল পত্র উপস্থাপনের জন্য দেওয়ানী কার্যবিধির ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

১৯ নং বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত কালেক্টরের (এডিসি রেভেনিউ) নিকট আপীল করা যাবে।

২০ নং ক্ষমতাসীন সরকার বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করবে।

২১ নং চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ রাষ্ট্রীয় কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবে।

২২ নং বোর্ডের কার্যক্রম বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম হিসাবে গণ্য। সদস্যগণ নির্বাহী বিভাগের লোক নয় বিধায় নির্বাহী বিভাগের নিকট আপীল, করা যায় যা উপরের ১৯ নং এ বর্ণনা করা হয়েছে।

২৩ নং আইন লংঘন করলে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা ১০ হাজার টাকা জারিমানা বা উভয় দণ্ড দেয়া যাবে।

২৪ নং ক্ষমতাসীন সরকার প্রয়োজনে বিধি প্রণয়ন করবেন।

২৫ নং সরল বিশ্বাসে কাজ করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান/সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে না।

ভূমি রেকর্ড বোর্ড ঃ

ভূমি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে ভূমি রেকর্ডকরণ। চট্টগ্রামের রামুতে ১৮৮৮-১৮৮৯ সালে পরীক্ষামূলক জরীপ হয়। তারপর ১৮৯০-১৯৪০ সাল পর্যন্ত Cadastral Survey হয় এবং এর মাধ্যমে CS খতিয়ান তৈরী হয়। নানা কারণে মালিকানা পরিবর্তন ও অন্যান্য কারণে আরো দুটি সার্ভে বা জরীপ করা হয় যার একটি SA এবং অন্যটি RS। এর দুটি জরীপের মাধ্যমে যে খতিয়ান হয়েছে তা SA ও RS খতিয়ান নামে পরিচিত। জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের পরে হয় SA এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে হয় আর একটি RS খতিয়ান যা এখানো সিলেট, কুমিল্লা, নওগাঁ, দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে সম্পন্ন হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে পার্বত্য চট্টগ্রামে CS খতিয়ান হয়নি কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিরা মনে করেছিল CS খতিয়ানের মাধ্যমে সরকার তাদের জমি নিয়ে যাবে। যখন সিলেট বাংলাদেশের অংশ হয়েছে তখন সিলেটে CS খতিয়ান হয়েছে। খতিয়ান ও ম্যাপ বা নকসা একত্র হলেই স্বত্বলিপি বা ROR হয়। DS খতিয়ান এবং CS খতিয়ান একই জিনিস। একই দাগ নম্বরে আলাদা আলাদা মালিকের খতিয়ান আলাদা আলাদা করার জন্য এই বিভক্তিকরণ। আর একই মৌজার বিভিন্ন দাগের (একজন মালিকের) বিভিন্ন নম্বরে থাকে, তা এক খতিয়ান নম্বরে আনার নাম জমা একত্রি করণ, একটা দাগে অনেক খতিয়ান থতিয়ান থাকতে পারে জমা বিভক্তিকরণে আবার একটা খতিয়ানে অনেক দাগ থাকতে পারে জমা একত্রিকরণে। কোন মৌজাতে একটা দাগে কোন লোকের জমি নিয়ে বিরোধ লাগলে ঐ দাগে কার জমি কতুটুকু তা কানুনগো খতিয়ান দেখে জমি বুঝিয়ে দেয়, তখন জমি কেহ বেশী দাবী করলে তা ধরা পড়ে। ঐ দাগে খতিয়ান বা মালিকের কতটুকু জমি আছে স্বত্বলিপিতে তা স্পষ্ট লেখা থাকে। জমি বুঝিয়ে দেবার নামই নামখারিজ। নামখারিজ করার পর যে মাঠ পর্চা পাওয়া যায় তা খসড়া স্বত্বলিপি। যদি স্বত্বলিপি ছাপানো হয়ে যায় এবং কোন ব্যক্তির জমি স্বত্বলিপিতে কম বেশী হয় তবে কানুনগো তার মিমাংসা করতে পারেন। বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য সিভিল কোর্ট করে দেওয়ানী আদালতে তার মীমাংসা করতে হয় বা AC ভূমি'র অফিসে Mis Case করতে হয়। নামজারী দরখাস্ত মূলেও হয়, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস হতে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্য এসি (ভূমি) ও এডিসি (রেভিনিউ) অফিসে প্রেরণের মাধ্যমে আপনা আপনিও হয় এতে সময় লাগে বেশী। দলিলে উল্লিখিত তফসিল এসি (ভূমি) অফিসের ২ নং রেজিস্টারের তফসিলের সাথে বা ১ নং রেজিস্টারের সাথে মিলে আপনা আপনিই নামজারী হয়। নামজারী রেজিস্টার প্রসংগে দেখা যাবে যে এই রেজিস্ট্রারের দুটি অংশ ঃ

(ক) দরখাস্তমূলে এবং ওয়ারিশ সূত্রে নামজারি ও

(খ) আপনা আপনি ও দানসূত্রে জমি পেয়ে নামজারী।

বড় মৌজায় একাধিক নকসা থাকে এবং ছোট মৌজায় একটা নকসাই থাকে। ডিজিএলআর এন্ড এস অফিস বা মহা পরিচালক ভূমি রেকর্ডকরণ অফিসের সেটেলমেন্ট অফিসার ও তার অধীনস্থ অফিসার, আমীন ও চেইনম্যানগণ এটি তৈরী করে। সারা বাংলাদেশে ৫৮,৬০৮টি মৌজা আছে। মৌজা জরীপের উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, এই জরীপ থেকে নদী ও পাহাড়ী এলাকা বাদ যাবে। মৌজায় JL. নম্বর থাকে একে মৌজা নম্বরও বলে। আগে JL এর স্থলে তৌজি নম্বর ছিল। তৌজি নম্বর ছিল জমিদারীর নম্বর। এখন জমিদারীও নাই এবং নম্বরও নাই। ভূমি ব্যবস্থাপনার Mutation বা নামজারী সম্পর্কে বলা হয়েছে 1 জমি ক্রয়, ওয়ারিশ বা দান ইত্যাদি সূত্রে মালিক হবার পর নামজারী বা মিউটিশন করে দখল পেতে হয়। তখন DCR এর মাধ্যমে নাম জারীর কর দিতে হয়। তার পর ভূমি উন্নয়ন কর বা ইহা মওকুফের রসিদ এনে জমি দাখিলা পেতে হয়। জমির দলিল, দাখিলা, DCR এবং বিভিন্ন সার্ভে সময়কার মালিক হওয়ার আগের ও পরের খতিয়ানে কার নাম আছে এবং বর্তমান মালিকের হাতে কোন সূত্রে জমি এলো তা দেখে জমির সত্যিকার মালিক কে তা উদ্ধার করা যায়। অন্য কোন রকম ব্যতিক্রম দেখাতে না পারলে বা জাল জুয়াচুরি, তথ্য গোপন দেখাতে না পারলে কারো নামে একটানা বার বছরের দাখিলা থাকলে এবং জমির সত্যিকার ভোগ দখল থাকলেই তামাদি আইনে সে জমির সত্যিকার মালিক হয়ে যায়। ২৬ নং বিধিতে মৌজার খতিয়ানের মালিকের নাম, পিতার নাম ও জমির পরিমাণ থাকে। ২৭ নং বিধিতে নকসা ও খতিয়ান নং এর স্বত্বলিপি তৈরীর বিভিন্ন ধাপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

মৌজা ম্যাপ তৈরী করার জন্য জরীপ কর্মীরা থিউরেব্রাইন ম্যাশিন দিয়ে প্রথম Traverse Survey এর মাধ্যমে মৌজার পেরিফেরিটা বের করে। তারপর মৌজার পেরিফেরিটা খাকী রং-এর একটি সীট কাগজে (যাহা আকা নামে পরিচিত) উঠাবে। পেরিফেরির পয়েন্টগুলো সরলরেখা টেনে টেনে যোগ করবে। এখানে জমির পরিমাপ চেই, ফিট, গজ, লিংক ও ইঞ্চিতে বের করা হয়। জমির পেরিফেরি বের করার জন্য যে লিংক ব্যবহার করা হয় উত্তাপে সেটি একটু এদিক ওদিক হলে জমির মাপ ভুল হবে। এই জন্য চেইনটির একটি Standard মাপ সম্বলিত জমিতে ফেলে প্রতিদিন মেপে দেখতে হয় মাপ ঠিক আছে কিনা। লিংকের পরিমাণ বেশী কম হাতুরী দিয়ে পিটেয়ে ঠিক করা হয়। Traverse Station গুলোর মধ্যে ২ চেইন দূরে দূরে দাগ দিতে হয়। গোলশূন্য দাগকে বলে চান্দা। চেইন এর দূরের গোল দাগগুলো চান্দা এবং এর ভাগগুলোকে বলে মোরববা। মোরববা কেটে কম্পাস দিয়ে ধরে ফিল্ড বইয়ে উঠানো হয়। আইল দেখবে বিভিন্ন সীমানায় আইল। উহা তার পি-৭০ সীটে উঠায়। মৌজা ম্যাপ তৈরী করার সময় Divider বসিয়ে বসিয়ে আইল যেভাবে ভাগ হয়েছে, Field Book এ কম্পাস দিয়ে সেইভাবে মাপ নেয় জরীপ কর্মীরা। এভাবে কিস্তোয়ার মোরববা কাটা হয় বা ক্ষেত্র বানানো হয় এবং আইলসহ ম্যাপে উঠে যায়।

আইলের মাঝখানে মালিকের নাম বসানো। এই পদ্ধতিতে এক ইঞ্চি মাটিও হিসাব হতে বাদ যায় না। এইভাবে আইলের ভিতর বিভিন্ন দাগ পাওয়া যায় এবং দাগগুলোর ভিতরে কে কতটুকুর মালিক তা এসে যায়। জরীপ কর্মীরা গাছতলায় বসে মালিকের বাড়ী যেয়ে খতিয়ানে মালিকের নাম বসায়, তা ছাড়া বিভিন্ন গাছ, বাড়ী ইত্যাদিতে ফোটা দিয়ে দিয়ে চেইন দিয়ে মেপে ধরা হয়। মালিকের নাম পেলেই কাগজের সত্যতা যাচাই করা হয় এবং খতিয়ানের মালিকের নাম বসানো হয়। বুজারোতে চূড়ান্ত ছাপা কপি আসা পর্যন্ত পর্চাটা খসড়া পর্চা। বুজারাতে প্রিন্টের দাগ ও খতিয়ান থাকে। বুজারাতে ভুল হলে আপত্তি দিতে হবে ছাপানো পর্চার পূর্বেই। পরে হলে মিসকেস করে এসি (ভূমি)র অফিসে মামলায় যেতে হয়। বুজারাতের পরে আসে তাসদিক বা Attestation। নির্দিষ্ট তারিখে ও স্থানে Attestation করাতে হয়। উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার বা কানুনগো তাসদিকের কাগজপত্র দেখে কার জমি কার নামে এটা পরীক্ষা করে। এ খতিয়ানে ৫/৭ জন মালিক হয়ে যায়। জমা খারিজ করে বা নামজারী করে খতিয়ান আলাদা করে নেয়া যায় জমি বিক্রয় ও জমির খাজনার সুবিধা ইত্যাদির জন্য। কানুনগোর অফিসে গেলে তিনি সব দেখে এবং সব ঠিক আছে কিনা দেখে Attested করে তসদীককৃত বলে খতিয়ানে সীলমেরে সই করে দিবেন। তখন জমির মালিকানা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তসদীক বা Attestation এর ধারাটি ৩০ ধারা। ২৯ ধারায় কানুনগোর কাছে আপত্তি দাখিল করতে হয় খতিয়ানের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে। উভয় পক্ষের কাগজপত্র দেখার জন্য কানুনগো নির্দিষ্ট তারিখে তার অফিসে উপস্থিত হবার জন্য নোটিশ দিবেন। ৩১ ধারাতে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল আসে। ৩১ ধারায় আপীল সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার শুনেন। সহকারী কমিশনার (ভূমি) আপীল দেখেন। অফিসার উপর হতে নিজেও দেখেন, Zonal Settlement Officer একজন দিয়ারার সেটেলমেন্ট অফিসার আর একজন। তিনি নদী হতে জাগা পয়স্থিত জমি ও নদীতে চলে যাওয়া সিকস্তি জমির জরীপের দায়িত্বে থাকেন ও তার ভিত্তিতে কর কমে বা বাড়ে এবং নতুন জায়গা জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা হয় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মাধ্যমে। এসব কাজ দেখার জন্য ১৯ জন দিয়ারার সেটেলমেন্ট অফিসার আছেন। Miss Case এর কপি RDC এর কাছে জেলার রেকর্ড রুমেও থাকে এবং ইউনিয়নের তহশীল অফিস, সহকারী কমিশনার ভূমির (থানার) অফিসেও থাকে। ভুল নাম কেটে শুদ্ধ নাম ঐ কাগজে উঠানো হয়। এতে কার আইল কতদূর তা ঠিক করে জমির ঝগড়ার মীমাংসা হয়েছিল। বাস্তবে দেখা গেছে মিস কেস এ নাম তহশীল অফিসে শুদ্ধ হলেও সেখানে মিস কেস-এর নম্বর থাকলেও রেকর্ড রুমের (জেলা সদরের অফিসে) SA খতিয়ানে বা পরচায় ভুল নাম রয়েই গেছে। বিধি মোতাবেক ইহা কেটে ঠিক করার কথা কিন্তু বাস্তবে রেকর্ড রুমে ঠিক করা হয় না। যদিও তহশীল অফিসে রেকর্ড করা হয়। সময় দিয়ে SA খতিয়ান ছাপা হয় বলে

উহাতে কাটাকাটির আইন নাই। তহশীল অফিসে মিস কেস অনুযায়ী কেটে ঠিক করা হয়। সুতরাং SA খতিয়ান বা পাথাইলা পরচায় নাম থাকলেই জমি কিনতে নেই। তহশীল অফিসে, স্থানীয় দখল ও বিক্রয় সম্পর্কে এবং ১২ বৎসরের মালিকানা সম্পর্কে তথ্য নিয়ে Upto date দাখিল বা ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ রসিদ দেখে জমি কিনলে আর অন্য মালিকের দাবী উঠবে না।

অন্যান্য অফিসের মত স্বাভাবিক রেজিস্টারের বাইরেও বিভিন্ন ধরনের পাওনা আদায় সম্পর্কে বিভিন্ন রেজিস্টার রাখতে হয় ইউনিয়ন থানা ও জেলা অফিসে। পরিদর্শনে তা ঠিক আছে কিনা দেখতে হয়। তিন বৎসরে যে কোন স্বাভাবিক পাওনা তামাদি হয়ে যায় তাই PDR (Public Demand Recovery Act) অনুসারে সরকারি পাওনা আদায়ের জন্য ও বৎসর শেষ হবার আগেই বকেয়া সম্পর্কে দেওয়ানী আদালতে মামলা করে রাখতে হয়। নিম্নে ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত ১ নং রেজিস্টার হতে ৯ নং রেজিস্টার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ঃ

১ নং রেজিস্টার ঃ ১ রেজিস্টারের ও ১ নং খতিয়ানে একটি মৌজায় সব সময় সরকারি খাস জমি থাকে। জমি পয়স্তিত হলে বা নদীতে চর জাগলে, নদী বা সমুদ্রে জমি পয়োবৃদ্ধি হলে বা কিনারা হতে বাড়তে থাকলে, সরকার জমি নিলামে কিনলে, কেউ জমি জমা রেখে ৫ বৎসর খাজনা না দিয়ে জমি অনাবাদী রেখে পালালে সে সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাবে সরকারে যাবে। জনগণের ব্যবহৃত রাস্তা, খাল, ঘাট ইত্যাদি ১ রেজিস্টারের ও ১ নং খতিয়ানের জায়গা, ইউনিয়ন তহসিল অফিস ও ভূমি অফিস উহা ইজারা, বন্দোবস্ত ইত্যাদি দেন। জলমহাল, পাথরমহাল, বালুমহাল, হাট বাজার ইত্যাদির মালিকও সরকার। এর আয় ও একটা স্বাভাবিক রেজিস্টারে যায়। ১ রেজিস্টার জমা বন্দী রেজিস্টার বা স্বত্বলিপি (চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত) রেজিস্টার রাখার স্থান "থানা ও তহশীল অফিস"।

২ নং রেজিস্টার ঃ ২ নং রেজিস্টার তলব বাকী রেজিস্টার (কার জমির মোট কত খাজনা এবং কত বাকী আছে) এতে ১ নং খতিয়ানের বা খাস খতিয়ানে জমি থাকে না। (বসতবাড়ীর মৌজাতেই সমস্ত খাজনার হিসাব রাখার কথা) "রাখার স্থান তহশীল অফিস" (বর্তমান ইউনিয়ন ভূমি অফিস)।

৩ নং রেজিস্টার ঃ ৩ নং খাজনা আদায় রেজিস্টার (দৈনন্দিন) - "তহশিল অফিস)"

৪ নং রেজিস্টার ঃ ৪ নং ক্যাশ বহি-"থানা ও তহশিল অফিস"।

৫ নং রেজিস্টার ঃ ৫ নং পাস বহি (ব্যাংক প্রদত্ত) - "থানা ও তহশিল অফিস"।

৬ নং রেজিস্টার ঃ ৬ নং বিবিধ দাবী রেজিস্টার (সায়রাতমহাল, পাথরমহাল ইত্যাদি যা সব বছরই আসে) "তহশিল অফিস"।

৭ নং রেজিস্টার ঃ ৭ নং দৈনিক বিবিধ আদায় (উপরের দাবী আদায়) "থানা ও তহশিল অফিস"।

৮ নং রেজিস্টার ঃ ৮ নং রেজিস্টার দখলীয় ভূমি রেজিস্টার (সরকারের) "১ নং খাস খতিয়ানের ৪টি খণ্ড (থানা ও তহশীল অফিস)। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল ৩৬৮ এ ১ নং রেজিস্টারের ১ নং খাস খতিয়ানের জমিই ৮ নং রেজিস্টারে এসে ৪ ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ৮ নম্বর রেজিস্টারটি ৪ টি ভাগ আছে ঃ

(১) রাস্তা, হালট, পানীয়, জলের কূপ, বাঁধ, খালবিল, নদীনালা বা সর্বসাধারণে ব্যবহার করে এবং ৬০ বৎসরের অধিক সময় যাবৎ ব্যবহার করে আসছে;

(২) বন্দোবস্ত উপযোগী, কৃষি ও অকৃষি সরকারি জমি, আগেরগুলোও সরকারি জমি;

(৩) নিলাম খরিদা, পরিত্যক্ত বা সরকারি খাস জমি;

(৪) পয়স্থিত বা নদী জাগা খাস জমির বিবরণ। সরকারি জমি কারো দখলে থাকলে তার জন্য তাকে তা বন্দোবস্ত দিলেও অতীতের বকেয়া পাওনা আদায় করতে হবে, বাড়াবাড়ি করলে দখলে যাবার জন্য আইনানুগ শাস্তি দিতে হবে দেওয়ানী আদালতে মামলা করে।

৯ নং রেজিস্টার ঃ ৯ নং রেজিস্টার নামজারী রেজিস্টার "৯" সার্টিফিকেট মামলার রেজিস্টার। "থানা ও তহশিল অফিস"। ৯ নংরেজিস্টারটি নামজারী রেজিস্টার যার দুটি খণ্ড আছে। ইংলিশ "৯"রেজিস্টারটি সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত রেজিস্টার। ইহা এক খণ্ড। সবই রোমান সংখ্যায় লিখতে হবে।

x এর "ক" এক সনা ভুমি বন্দোবস্ত রেজিস্টার (অন্যের দখলে চলে যাবার ভয়ে এক সনা বোর জমি)।

xi রেজিস্টার - খাজনা বৃদ্ধি, মওকুফ ও হ্রাস (সিকস্তি ও পয়োস্তির কারণে) - জেলা অফিস।

xii রেজিস্টার - খাসজমির বন্দোবস্তের প্রস্তাব রেজিস্টার - জেলা অফিস।

xiii সিম (বিবিধ) কেস, রেজিস্টার - জেলা ও থানা অফিস।

xiv রেজিস্টার - লোকাল ইনকোয়ারী রেজিস্টার - জেলা ও থানা অফিস।

xvii ট্রেজারী চালান রেজিস্টার - জেলা ও থানা অফিস।

xxxii সিকিউরিটি রেজিস্টার - জেলা ও থানা অফিস।

xxxiii রেজিস্টার, স্থাবর সম্পত্তি রেজিস্টার (অফিসের) - জেলা অফিস।

xxvi পরিদর্শন বহি পর্যন্ত XXXII পর্যন্ত (ল্যাটিন) - থানা ও তহসিল অফিস এর পর সব ইংলিশ।

৪০ রেজিস্টার (তৌজির দাবী পরিবর্তন - নানা কারণে সিকস্তি ইত্যাদি) ইহা শুধু সিকস্তির কারণে, অন্যটি সিকস্তি ছাড়া ও খাস সম্পত্তি বন্দোবস্ত নিলাম খরিদ; পরিত্যক্ত ইত্যাদি কারণে হতে পারে। ৯৪ নং চেক বই রেজিস্টার (পাতাগুণে গেজেটেড অফিসারের স্বাক্ষর - থানা ও তহসিল অফিস)

রিটার্ণ ১ বাৎসরিক সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রতিবেদন (দাবী, আদায়, মিনা মওকুফ ও বকেয়া) - তহশিল অফিস

রিটার্ণ ২ দাবি ও আদায়ের পাক্ষিক প্রতিবেদন - তহশীল অফিস

রিটার্ণ ৩ অনাদায়ী তালিকা–তহশীল অফিস।

উপসংহার ঃ

বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস অনেক পুরানো। অনেক পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। যেহেতু ভূমি ব্যবস্থা জাতীয় আয় ও শান্তি শৃঙ্খলা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত তাই এ বিষয়টি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা নানা ধরনের ক্রটিতে পূর্ণ। এ বিষয়টি আমাদের বর্তমান সরকার অনুধাবন করে ভূমি ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে যে ভূমি ব্যবস্থা বিদ্যমান তাকে যুগোপযোগী করতে না পারলে ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা আমাদের দেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় ভূমির অনুপাত দিন দিন কমছে। সুতরাং অল্প জায়গায় বেশী লোকের চাহিদা মেটানোর জন্য ভূমি ব্যবস্থাকে যথোপযুক্ত করতে হবে। আমরা বর্তমানে যে ভূমি ব্যবস্থা দেখতে পাচ্ছি তা উত্তরাধিকারসূত্রে ব্রিটিশদের থেকে প্রাপ্ত। তারা তাদের সুবিধামত ভূমি ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশে যে ভূমি ব্যবস্থা পরিবর্তীত হয়েছে তাও জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটায়নি। তাছাড়া ভূমি ব্যবস্থা এত জটিল যে এটা সাধারণ মানুষের বোঝার ক্ষমতার বাইরে। তাই সরকারের উচিৎ একটা সরল ভূমি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা। যার মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের সংজ্ঞা ঃ

কৃষক ঃ কৃষকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে নিজে অথবা বর্গাদার দিয়ে চাষ করালেও সে কৃষক। লাংগল যার ভূমি তার এই ধরনের কোন কথা আইনে নাই।

কৃষিজমি ঃ ভূমি সংস্কার ম্যানুয়েলের ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সব জমিই কৃষিজমি।

কৃষক পরিবার ঃ ভূমি সংস্কার ম্যানুয়েলের ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনযায়ী গ্রামের পরিবারই কৃষক পরিবার। বর্তমানে পরিবার বলতে বুঝাবে পরিবার প্রধানের স্ত্রী/স্বামী, পুত্র, এবং অবিবাহিত কন্যা নিয়ে আলাদা পরিবার হিসাবে বিবেচিত হবেন।

কমিশনার ঃ কমিশনার বলিতে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৪৮ ধারার ১ নং উপধারায় বর্ণিত জমিদারী ক্রয়ের নিমিত্তে নিয়োজিত কমিশনারকে বুঝাইবে।

কমিশনার ঃ কমিশনার বলিতে কোন বিভাগের রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তা বুঝাইবে এবং এরূপ বিভাগের একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারও এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন (জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট-১৮৯৭)।

কমিশনার ঃ কমিশনার বলিতে বুঝায় সুরমা উপত্যকায় এবং পাহাড়ী বিভাগের কমিশনারকে। (সিলেট টিনান্সী এ্যাক্ট-১৯৩৬)

কালেক্টর ঃ জেলা কালেক্টরসহ ডেপুটি কমিশনার ও এই আইনের অধীনে কালেক্টরের উপর অর্পিত সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কোন কর্মকর্তা কালেক্টর হিসাবে গণ্য হইবেন। (রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০)।

কালেক্টর ঃ কালেক্টরসহ কালেক্টরের সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালনার্থে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত যে কোন কর্মকর্তাকে বুঝাইবে (অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৪৯)।

কালেক্টর ঃ কালেক্টর বলিতে জেলার রাজস্ব প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান কর্মকর্তাকে বুঝাইবে এবং জেলার জেলা প্রশাসকও এর অন্তর্ভুক্ত হইবেন (জেনারেল ক্লজেস এ্যাক্ট-১৮৯৭)।

কালেক্টর ঃ কালেক্টর বলিতে জেলার প্রশাসনিক কর্মকর্তা (জেলা প্রশাসক) এবং বিশেষভাবে কালেক্টর বা জেলা প্রশাসকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে (১৯৭৫ সালের সার্ভে আইন)।

কালেক্টর ঃ এই আইনের আওতায় কালেক্টর বলিতে বুঝায় প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একটি জেলার কালেক্টর অথবা কালেক্টরের দায়িত্ব পালনকারী অন্য কোন কর্মকর্তা (বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ১৮৮৫)।

ডেপুটি কমিশনার ঃ সিলেট টেনান্সী এ্যাক্ট-১৯৩৬-এর আওতায় ডেপুটি কমিশনার বলিতে সিলেট জেলার ডেপুটি কমিশনার এবং উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে স্থানীয় সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে ডেপুটি কমিশনারের দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রদত্ত রাজস্ব অফিসার, সহকারী কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার।

রাজস্ব অফিসার ঃ রাজস্ব অফিসার বলিতে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের অধীনে কিংবা এই আইনের আওতাধীন প্রণীত বিধিমালা মোতাবেক রাজস্ব অফিসারের সকল কিংবা যে কোন দায়িত্ব পালনার্থে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন অফিসারকে বুঝাইবে।

রাজস্ব অফিসার ঃ এই আইনের আওতায় রাজস্ব অফিসার বলিতে স্থানীয় সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অথবা অফিসের কারণে নিয়োজিত অফিসারকে বুঝাইবে, যিনি রাজস্ব অফিসারের কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন (সিলেট টেনান্সী ১৯৩৬)।

রাজস্ব অফিসার ঃ রাজস্ব অফিসার বলিতে বুঝাইবে এই আইনের আওতায় প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত নামে অথবা অফিসের কারণে রাজস্ব অফিসারের দয়িত্ব সম্পাদনকারী যেকোন কর্মকর্তা (বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-১৮৮৫)।

খাজনা ঃ ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় খাজনা বলিতে কোন প্রজা কর্তৃক তাহার দখলকৃত ভুমি ব্যবহার বা দখলের বিনিময়ে জমিদারকে আইনানুগভাবে পরিশোধযোগ্য নগদ অর্থে বা দ্রব্যের মাধ্যমে দেয় খাজনাকে বুঝাইবে।

হাট-বাজার ঃ হাট বা বাজার বলিতে সেই সকল স্থানকে বুঝাইবে, যেখানে প্রত্যহ বা সপ্তাহের বিশেষ কোন দিন কৃষিপণ্য, শাকসব্জি, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী, চামড়া, মাংশ, ডিম, দুধ, দুগ্ধজাত সামগ্রী অথবা খাদ্য ও পানীয় বা জীবন ধারণের অন্যসব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। তাহা ছাড়া ঐ সকল স্থানসমূহে অবস্থিত দোকানপাটও হাট-বাজারের অন্তর্ভুক্ত হইবে (রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০)।

পয়স্তি ঃ নদী বা সমুদ্রগর্ভ হইতে জাগিয়া উঠা ভূমিকে পয়স্তি ভূমি বলা হয়। প্রকৃতি অনুসারে পয়স্তি ভূমিকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি ছিল যা সিকস্তির পর আবার স্বস্থলে পয়স্তি হয়।

২. ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি সংলগ্ন জাগিয়া উঠা চর ভূমি।

৩. নদী বা সমুদ্রগর্ভ হইতে নতুনভাবে জাগিয়া উঠা চর ভূমি যাহা পূর্বে ছিল না নতুনভাবে জরিপের প্রয়োজন হইতে পারে তা। এবং

৪. সরকার বা সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন সংস্থা দ্বারা গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের দরুন কৃত্রিম বা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পয়স্তি ভূমি (এসএ এন্ড টি এ্যাক্টের-৮৬-ধারা)।

ভূমি রাজস্ব ঃ ভূমি রাজস্ব বলিতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোন ভুমির উপর নির্ধারিত রাজস্বকে বুঝাইবে (সিলেট টেনান্সি এ্যাক্ট-১৯৩৬)।

ভূমির তফসিল ঃ ভূমির তফসিল বলিতে ভূমির অবস্থানগত নির্দিস্ট ও সম্পূর্ণ বিবরণকে বুঝায়। তফসিলে ভূমির পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। এতে ভূমির মৌজার নাম, জুরিসডিকশন লিস্ট নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, ভূমির দাগভিত্তিক পরিমাণ, ভূমির শ্রেণী ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। দাগভিত্তিক ভূমির পরিমাণ যোগ করে তফসিলের মোট ভূমির পরিমাণ দেখানো হয় এবং শেষে ভূমির অবস্থানের থানা ও জেলার নাম লেখা হয়।

জে, এল, নম্বর ঃ প্রত্যেকটি থানার মৌজার অবস্থানভিত্তিক মৌজাসমূহের একটি নম্বর দেওয়া হয়। জরিপের সময় দেওয়া প্রথম নম্বরটিকে মৌজার জুরিসডিকশন লিস্ট সংক্ষেপে জে,এল, নম্বর বলা হয়।

পর্চা ঃ খতিয়ানের অনুলিপিকে পর্চা বলা হয়। নির্ধারিত ফরমে পর্চা প্রণয়ন করিয়া ভূমির মালিককে প্রদান করা হয়। ইহাতে ভূমি মালিকের নাম মৌজার নাম, জে, এল, নং, খতিয়ান নং, হিস্যা বা পরিমাণ, শ্রেণী, দাগের মোট পরিমাণ, খতিয়ানের হিস্যা বা খতিয়ানে সংশ্লিষ্ট দাগের ভূমির পরিমাণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ থাকে। তাছাড়া মন্তব্য কলামে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমির দখলকার ও অন্যান্য বিষয় উল্লেখ থাকে। পর্চা থানা রাজস্ব অফিসার/সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। জেলা রেকর্ড রুম হইতে পর্চা সংগ্রহ করা হইলে ইহাতে রেকর্ড রুম ডেপুটি কালেক্টরের বা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর স্বাক্ষর থাকে; নির্ধারিত ফি জমা দিয়া যে কহ পর্চার নকল সংগ্রহ করতে পারে।

Revenue Organorgram

A. Organisation Chart :

(For special and category – 1 District with 8 or more Upazilas)

Deputy Commissioner:

1. ADC (General)

2. ADC (Revenue). Personnel-5

ACD (Revenue)

1. GOC-Personnel-14
2. RDC-Personnel-22
3. AC (Record Room) Personnel-7
4. Asstt. Engineer-Personnel-5

B. Organization of Thana Administration:

Thana Nirbahi Officer

(Regulatory Function)

Thana Revenue Officer. (Personnel-14)

1 x TRO

1 x Kanungo (Field)

1 x Surveyor

1 x Head Asstt-cum-Accountant

1 x Nazir-cum-Cashier

1 x Mutation Clerk

1 x Certificate Clerk1 x Asstt certificate clerk

2 x MLSS/Peon

2 x Chainman

Note :

1. Existing Tahsilder and his staff will continue to function
2. In reverine Circle thee will be two posts of surveyors

B. Abbreviation used :

1. ADC-Additional Deputy Commissioner
2. ADM-Additiona District Magistrate
3. GOC-General Certificate Officer
4. RDC-Revenue Deputy Collector

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। হক সামসুল মোঃ, ১৯৯৪, ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা, বই ঘর, চট্টগ্রাম।

২। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল, ভূমি প্রশাসন বোর্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, ১৯৮৭, ঢাকা।

৩। ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০, ভূমি মন্ত্রণালয় ১৯৯১ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা।

৪। চৌধুরী ফায়েকুজ্জামান, ১৯৯৭, ভূমি প্রশাসনের দৈনন্দিন কার্যপদ্ধতি, দি পূবালী আর্ট প্রেস, ঢাকা-১২১৪।

৫। দেবনাথ, চন্দ্র নারায়ণ, ২০০০, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

৬। Abedin, Zainul, 1983 Agrarain Reforms Prospect in Bangladesh, Proshika Center for Development, Comilla, Bangladesh.

৭। Ali, A.M.M Shawkat, 1980, Politics and Land System in Bangladesh, NILG, Dhaka.

৮। Ahmed, K. U. and Baroi, A., 1994, Land Survey Methods and Technical Rules, Paera Prokasheni, Dhaka.

৯। Government of Bangladesh, 1993, Compendium of Lecture Notes: Land Administration Training Unit, Ministry of Land, Dhaka.

১০। Siddiqui Kamal, 1997, Land Management in South Asia: A comparative Study, The University Press Limited, Dhaka.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০

নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাদের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন প্রবণতাঃ গ্রাম পর্যায়ে একটি সমীক্ষা

মোহাম্মদ জুলফিকার হোসেন*

Abstract: The paper aims to examine the prevailing picture of marriage registration among women of poor family, mainly live in the remote rural areas of Bangladesh. Now a days marriage registration is considered as a compulsion irrespective to people of all religion in Bangladesh. No marriage will get legal basis in the eyes of government until and unless it is registered through government appointed marriage register office. But it is assumed that because of some socio-economic constraints, the tendency of marriage registration among rural poor women is not statisfactory. Although different NGOs and government at local level initiated diversified programmes to increase consciousness and make people understand the importance of marriage registration in rural areas. The major focus of this study is to see, how far women of lower class family is familiar with marriage registration and also how the marriage ceremony in rural areas is actually taken place. The study also attempts to understand the rule of bridegroom, that means importance of her opinion in the settlement of marriage.

ভূমিকা ঃ

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন ধারা, ধ্যান-ধারণা সমাজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা প্রভৃতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। জীবন ও জগতের এ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই দেশ ও জাতীয় জীবন দর্শন নিরূপিত হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী হওয়া সত্ত্বেও নারীরা যুগ যুগ ধরে অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কূপমণ্ডকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাদের সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। তার মেধা ও শ্রমশক্তিকে শুধুমাত্র সাংসারিক ক্ষেত্রে ব্যয় করা হয়েছে। শুধু তাই নয় তাদের অধিকার এবং সামাজিক অস্তিত্বকে কখনো কখনো চরমভাবে অবহেলা করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই চরম দরিদ্র সীমার নিচে অবস্থান করছে। এদেশের দুই-তৃতীয়াংশ বয়স্ক লোক নিরক্ষর। নিম্ন আয়ের লোকদের মাঝে নিরক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশী আর মহিলাদের অবস্থানতো বলাই বাহুল্য। এই সব

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

অভাবগ্রস্ত, অশিক্ষিত মহিলারা তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে একেবারেই অবহিত নয়। তাই কখনো কখনো এই সব মহিলাদের সামাজিক স্বীকৃতি বা স্ত্রীর অধিকার পর্যন্ত অস্বীকার করা হয়। আমাদের এই ক্ষুদ্র গবেষণা প্রতিবেদনে নিম্ন আয়ের লোকদের মাঝে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত সচেতনতার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ, আলোচনা, জরিপ এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমাধানের সুপারিশ করা হয়েছে। নিম্ন আয় ভুক্ত পরিবার বলতে যাদের পারিবারিক আয় অর্থাৎ বিবাহিত মহিলাদের পিতার আয় ৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা এবং স্বামীর আয়ও উক্ত সীমার মধ্যে তাদেরকেই মূলত এই গবেষণায় নিম্নবিত্ত পরিবার হিসাবে দেখানো হয়েছে। তবে ৩০০০ টাকার মধ্যেই যাদের আয় অন্তর্ভুক্ত তাদেরকেই এই প্রবন্ধে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উক্ত পরিবারগুলো বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান এত উন্নত নয়; পাশাপাশি কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস তাদের চিন্ত াভাবনাকে সংকুচিত করে ফেলে। পিতামাতার চিন্তাভাবনা তাদের সন্তানদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় গ্রামীণ মহিলাদের অবস্থান প্রান্তিক। প্রায় তিন দশকের পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গ্রামীণ মহিলাদের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বিবাহ নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থার কারণে নারী আজও তার অধিকার সংরক্ষণ করতে পারছে না। স্বামী বিয়ের পর ইচ্ছে করলেই স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে বা তালাক দিতে পারছে। এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় নারীরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না প্রমাণের কারণে। অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ বিয়ের সত্যতা অস্বীকার করে, ফলে নারী আরও অসহায় অবস্থার মধ্যে পতিত হয়। এই অবস্থা থেকে নারীদের সাহায্যের জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিবাহ নারী ও পুরুষের একত্রে বসবাস করার আইনগত চুক্তি; সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থা। দাম্পত্য জীবন ও সংসার-ধর্মকে সার্বিক সুরক্ষা দিতেই বিবাহ প্রথার সৃষ্টি হয়েছে।

CEDAW সনদে বিবাহ ও পারিবারিক আইন সম্পর্কে বলা আছে যে, শিশুকালে বাগদান ও শিশু বিবাহের কোন আইনগত কার্যকারিতা থাকে না এবং বিবাহের একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ ও সরকারি বিবাহ অফিসে বিবাহ রেজিস্ট্রিভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করার জন্য আইন প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিবাহের সত্যতা ও স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি বিবাহের রেজিস্ট্রেশন আবশ্যক। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা শাস্তি যোগ্য অপরাধ। বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও অনেক বিবাহের রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। The data of the government can only be obtained from the marriage that have been registered, and a large number of mar-

riages are not registered. As for those that are registered, the parties often overstate their ages according to the legal requirements of minimum age.[1]

আমাদের এই সীমিত আকারের জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে প্রায় ৬০% বিবাহের রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের দলিল ও প্রমাণপত্র। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বিয়ে বর্তমানে আইনত অপরাধ। রেজিস্ট্রেশন বিহীন বিয়ে নিয়ে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেক প্রতারক স্বামী রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বিবাহ করে ইচ্ছামত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে এবং করছে। যখন তখন তালাক দেওয়া ও বিয়ে অস্বীকার করা, ছেলে-মেয়ের ভরণ পোষণ না দেয়া, একাধিক বিয়ে করাসহ বিভিন্ন সমস্যার তৈরী করতে পারে। একবিংশ শতাব্দিতে প্রবেশ করে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বিয়ের কথা কল্পনা করা কোন নারীর পক্ষে সম্ভব নয়। রেজিস্ট্রেশন ছাড়া বিয়ের সুবিধা বলতে কিছুই নেই বরং অসুবিধা বলে শেষ করা যাবে না। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন না করলে নারী তার আইনগত কোন সাহায্য পায় না উপরন্তু স্বামী অহেতুক কোন কারণ ছাড়াই তালাক দিলে, কিংবা দ্বিতীয় বিয়ে করলে, তখন তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও আদালতে এই নারীকেই পরাজিত হতে হয়। এছাড়া ও সামাজিক অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। রেজিস্ট্রেশনবিহীন বিয়ের সমস্যা মূলত শুরু হয় যখন দম্পতিদের মধ্যে পারিবারিক কলহের সূত্রপাত হয় এবং সমস্যা চরম আকার ধারণ করে। অন্যথায় তেমন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। পারিবারিহ কলহের চরম অবস্থায় যখন এক সাথে বসবাস করা সম্ভব হয় না এবং আদালতের আশ্রয় অথবা তালাকের পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন মেয়েদের ভবিষ্যতের একটি সুরক্ষা হিসাবে রেজিস্ট্রেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় The couple who get married without any registration, but leading a happy conjugal life do not face any such problems regarding their marriage being registered or not. The problem arises with the couples having crisis in their conjugal life, living in separation, demanding for maintenance for her and children during separation and after divorce.[2]

১৯৬২ সনে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক বিবাহ ক্ষেত্রে সম্মতি, বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও বিয়ে রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত সনদ অনুমোদন হয়। ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন করার বিধান ছিল কিন্তু এটা তখন বাধ্যতামূলক করা হয়নি। ১৯৭৪ সালের ৫২ নম্বর আইন দ্বারা মুসলিম বিয়ে রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিয়ের রেজিস্ট্রেশন না করলে তার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের কারাদণ্ড হতে পারে। অধিকারবঞ্চিত নারী, তালাকপ্রাপ্ত নারীরা তাদের বিয়ের রেজিস্ট্রেশন আদালতে উপস্থাপন করে আইনগত সহযোগিতা পেয়ে থাকে। ১৯৭৪ সনে মুসলিম বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রিকরণ আইন প্রণয়ন হয়। এবং ১৯৭৫ সনে মুসলিম

বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ রেজিস্ট্রিকরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। হিন্দু আইনে বিবাহ একটি ধর্মীয় নির্দেশ এবং পবিত্র বন্ধন। শাস্ত্র মতে, হিন্দু বিবাহ বাতিল হয় না অর্থাৎ হিন্দু বিবাহতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন করা যায় না। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা হিন্দু পারিবারিক আইন অনুসরণ করেন এবং এই আইন অনুসারেই তাদের মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। খ্রীস্টানদের 'কোড অব ক্যানন ল' অনুযায়ী বিবাহ হচ্ছে একটি ধর্মীয় আচার এবং পবিত্র চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী সারা জীবনের জন্য দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। খ্রীষ্টান বিবাহ সম্পাদিত হয় খ্রীষ্টান ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৮৭২ অনুসারে। হিন্দু পারিবারিক আইনে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের কোন বিধান নেই। এ কারণেই, বাংলাদেশে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা হয় না। তাদের যদি কখনও বিবাহের প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজন হয় তখন নোটারাইজেশনের মাধ্যমে তা করা হয়।

খ্রীষ্টান ম্যারেজ এ্যাক্ট ১৮৭২ অনুযায়ী, প্রতিটি খ্রীষ্টান বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। যেহেতু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন খ্রীষ্টান বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ সেহেতু খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রায় সকল বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা হয়ে থাকে। খ্রীষ্টান বিবাহ আইন যারা বিবাহ সম্পাদন এবং রেজিস্ট্রেশনের দায়িত্বে থাকেন তাদেরকে রেজিস্ট্রেশনকৃত বিবাহ সম্পর্কিত তথ্যাবলী সরকারি রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির জন্য সরবরাহ করতে হয়। তবে বাস্তবে খ্রীষ্টান বিবাহ সম্পর্কিত সঠিক তথ্য পাওয়াও খুব কঠিন।

গবেষণার উদ্দেশ্যঃ

* নিম্ন আয়ের জনগণ এর মধ্যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে সচেতনতা পর্যবেক্ষণ করা।
* নিম্ন আয়ের জনগণের বিবাহ সরকারি খাতায় রেজিস্ট্রি হচ্ছে কিনা সেটা যাচাই করা।
* বিবাহ রেজিস্ট্রি না করলে বিবাহের প্রমাণ থাকে না এবং পরবর্তীতে বিবাহ নিয়ে কোন সমস্যা দেখা দিলে আদালতে আইনত বিচার পাওয়া যায় না। এছাড়া বিবাহ রেজিস্ট্রি না করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ–এই বিষয়গুলো সম্পর্কে নিম্ন আয়ের জনগণ কতটা সচেতন সেটা পর্যবেক্ষণ করা এবং বিষয়গুলো সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করা।
* বিবাহের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করা।
* সুপারিশ প্রদান এবং আমাদের সকলের করণীয় কি সেটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করা।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

গবেষণা কার্য সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করা গবেষণার প্রধান বিষয়বস্তু। তবে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে কিছু সারণী প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও প্রশ্নমালা তৈরী করে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের পরিবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণা এলাকা হিসাবে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার ৪টি গ্রাম যথা মেঘনাপাড়া, মাধবপুর, কুচিয়ামোড়া, আকিকান্দি এবং ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার ১ নং ত্রিবেণী ইউনিয়নের ৪টি গ্রাম যথা ত্রিবেণী, দুলালপুর, মীর্জাপুর এবং শ্রীপুর গ্রাম নির্বাচন করা হয়। এ লক্ষ্যে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ জেলার ৮টি গ্রাম থেকে ১০০ জন মহিলার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয় যাদের বয়স ২৫ বৎসরের মধ্যে। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রধানত প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। এছাড়া এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদন, গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন জার্নাল, ম্যাগাজিন, বইপত্র ইত্যাদি মাধ্যম থেকেও এই গবেষণা প্রতিবেদনে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ

যে কোন গবেষণা করতে গেলে বিভিন্ন রকম সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। আমাদের নির্বাচিত গবেষণার বিষয়টিও এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। আমাদের নির্বাচিত গবেষণার ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা দেখা যায় তা নিম্নরূপ ঃ

১। সময়ের স্বল্পতার কারণে ব্যাপক আকারে নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

২। অনেক ক্ষেত্রে মহিলাদের সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য রাজী করাতে কষ্ট হয়েছে।

৩। তথ্য সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় সঠিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি।

৪। সামাজিকতার ভয়ে অনেকে সঠিক তথ্য প্রদানে সহায়তা করেনি।

বিবাহ কি?

পরিবার হলো সমাজের ক্ষুদ্রতম সামাজিক একক এবং সেই পরিবার গঠিত হচ্ছে বিবাহের মাধ্যমে। বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন এক চুক্তি যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে, অর্জন করে পরিবার গঠনের যোগ্যতা যা সৃষ্টি করে কিছু অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক এবং এই বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্টি হচ্ছে উত্তরাধিকার ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্থির হয়। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারী। আমাদের দেশের আইনও ইসলাম ধর্মের

নির্দেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ হচ্ছে ইসলাম ধর্ম অনুমোদিত একটি দেওয়ানী চুক্তি। বিবাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন উপাদানগুলো যা এই গবেষণার প্রয়োজনেই উল্লেখ করা প্রয়োজন।

প্রথমত ঃ সম্মতি–বিবাহের ক্ষেত্রে বর এবং কনে উভয়েরই সম্মতি প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত ঃ কোন পিতামাতা তাহার কন্যার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ দিতে পারবে না বেশীর ভাগ দেশেই প্রচলিত আইন বিয়েতে স্বাধীনভাবে নারীর সম্মতি দানের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বহু দেশেই এ আইন প্রতিকী মাত্র। বাংলাদেশে পরিচালিত এক জরীপে জানা যায় শতকরা ৫০ ভাগ মেয়ে তাদের বিয়ে বিষয়ে পাত্রপক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ব্যাপারে কিছু জানতে পারে না।[৭] এর ফলে বিয়েতে সম্মতি অথবা 'না' বলার কোন সুযোগ তাদের দেয়া হয়নি।

মোহরানা ঃ

কোরআন শরীফে আছে, আর তোমরা স্ত্রীদেরকে তাদের মহর স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিয়ে দাও। আর যদি তারা সন্তুষ্টচিত্তে মহরের কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তা হলে তোমরা তা সানন্দে ভোগ কর।[৮] সেই অর্থে সুস্পষ্ট ভাষায় স্ত্রীর মোহরানা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বিবাহ বন্ধন কায়েম করার সময় মোহরানাও ধার্য করা উচিত। দেনমোহর হল কিছু টাকা অথবা অন্য কোন সম্পত্তি যা স্ত্রী স্বামীর নিকট হতে বিবাহ চুক্তির একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে পাওয়ার অধিকারী হয়। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে দেনমোহর পরিশোধ করতে হয় প্রধানত দুইটি কারণে। (ক) ধর্মীয় অধিকার লাভের জন্য (খ) স্ত্রীর প্রতি একটি দায় বা কর্তব্য সম্পাদনের জন্য দেনমোহর স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি নিদর্শন। দেনমোহর কোন পুরুষ কর্তৃক কোন মহিলাকে বিবাহ করার জন্য চুক্তিতে উপনীত হওয়ার জন্য কোন বিনিময় বা মূল্য স্বরূপ নহে। বরং এটা স্ত্রী লোকটির প্রতি সম্মানের প্রতিফলরূপে স্বামীর উপর আইনত আরোপিত একটি দায় মাত্র। দেনমোহরের জন্য কোন সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত নেই। কিন্তু কোন অবস্থায় আইনে নির্ধারিত পরিমাণের কম হতে পারবে না। তবে বর্তমানে মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণ স্বামী ও স্ত্রীর অন্যান্য বিষয়াদি ও অবস্থার বিবেচনার উপর নির্ভর করে। যেমন স্বামীর উপর ন্যস্ত ক্ষমতাবলে স্বামী যাতে স্বেচ্ছাচারীভাবে স্ত্রীকে তালাক দিতে না পারে এর একটি কৌশল হিসাবে মোহরানার পরিমাণ নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা, স্ত্রীর পৈত্রিক পরিবারের অবস্থা, স্ত্রী বুদ্ধিবৃত্তিগত সফলতা বা ব্যক্তিগত যোগ্যতা, স্বামীর সম্পদ, স্ত্রীর চতুর্দিকস্থ সামাজিক অবস্থান এবং পক্ষগণের গৌরব প্রকাশের ইচ্ছা ও অহঙ্কারবোধের উপর নির্ভর করে।

সাক্ষী ঃ

কোরআন পাকে নির্দেশ দেওয়া আছে যে, তোমাদের পুরুষগণ হতে দুই জন সাক্ষী রাখ। দুই জন পুরুষ না হলে অন্তত একজন পুরুষ ও দুই জন মহিলাকে সাক্ষী রাখ।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ঃ

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন যা আমাদের প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। বিবাহ সম্পর্কিত সকল তথ্য সরকারি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করাই হচ্ছে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন। রেজিস্ট্রেশনের কপি হচ্ছে আইনগতভাবে বিবাহের প্রমাণপত্র। বিবাহের রেজিস্ট্রি পত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ঃ

* বর, কনের স্বাক্ষর
* বিয়ের স্বাক্ষীদের স্বাক্ষর
* কাজী বা যিনি বিয়ে পড়িয়েছেন তার স্বাক্ষর
* রেজিস্ট্রি অফিসের সিল
* রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষর

বাংলাদেশে মুসলিম, বৌদ্ধ, হিন্দু ও খ্রীষ্টানদের জন্য রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন আইন। মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন (১৯৭৪), ধারা ৫(২) অনুযায়ী অবশ্যই প্রতিটি বিয়ে এবং তালাক রেজিস্ট্রি করতে হবে যদিও রেজিস্ট্রেশন ছাড়াও কেবল কাজী বা হুজুরের পরিচালনায় এবং সাক্ষী থাকলে বিয়ে বৈধ এবং স্বীকৃত। তবে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের স্বামী, স্ত্রী উভয় পক্ষের স্বার্থই সংরক্ষিত থাকে। তবে স্ত্রীর স্বার্থ সংরক্ষণে রেজিস্ট্রেশন একটি আইনী দলিল, এ দলিলের এক কপি রেজিস্ট্রি অফিসে সংরক্ষিত থাকে, এক কপি স্বামী-স্ত্রীর কাছে সংরক্ষিত থাকে এবং এর জন্য একটি ফি পরিশোধ করতে হয় যা নির্ভর করে মোহরানার উপর।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কেন গুরুত্বপূর্ণ?

বিবাহের রেজিস্ট্রেশন উভয় পক্ষকে বিশেষ করে স্ত্রী কে বিভিন্নভাবে সুরক্ষা প্রদান করে। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে রেজিস্ট্রেশনের দলিল অর্থাৎ নিকাহনামা (অথবা কাবিন) অথবা বিবাহ প্রত্যয়নপত্র যা বিবাহের সত্যতা প্রমাণ করে। মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে, নিকাহনামা বিবাহ চুক্তির অত্যাবশ্যক শর্তাবলীর লিখিত দলিলও বটে। বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সুবিধা হচ্ছে ঃ

* কেউ এর সত্যতা অস্বীকার করতে পারে না।
* স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামী পুনরায় বিবাহ করলে অথবা এ রকম বিবাহ বন্ধ করার

জন্য স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

* স্বামী কাছ থেকে স্ত্রী ভরণপোষণ আদায় করতে পারেন।

* স্ত্রী-নিকাহ নামায় উল্লিখিত দেনমোহর আদায় করতে পারেন যে ক্ষেত্রে এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করা লাই সে ক্ষেত্রে স্ত্রী ন্যায় সঙ্গত পরিমাণ দেনমোহর আদায় করতে পারেন।

* স্বামী অথবা স্ত্রীর মৃত্যু ঘটলে দুইজনের মধ্যে যিনি বেঁচে থাকবেন তিনি মৃতের সম্পত্তি থেকে নিজের বৈধ অংশ আদায় করতে পারেন।

* অধুনা বাংলাদেশে অনেক পুরুষ ও নারী বিদেশে চাকরি করছে এবং পরিবার নিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছে। বিয়ে প্রমাণ করার জন্য বিদেশে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন দলিলের প্রয়োজন হয়। এছাড়া বাল্য বিবাহ রোধ, আইনগত সহযোগিতা, রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করার জন্য বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রবণতা ব্যপক ভাবে লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে গ্রাম এলাকায় দরিদ্র পরিবারগুলোতে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয়; রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে এ প্রবণতা কমানো সম্ভব।

কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় ঃ

যে দিন বিবাহ সম্পাদিত হয়, সেই দিনই বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। সেদিন রেজিস্ট্রেশন যদি সম্ভব না হয় তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই বিবাহ রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সময় বিবাহ রেজিস্ট্রারকে কিছু নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। নিকাহ রেজিস্ট্রার অবশ্যই বিয়েতে বর-কনে উভয়ের সম্মতি আছে কিনা তা নিশ্চিত হবেন, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সকল শর্ত পূরণ হয়েছে কিনা। যদি বিবাহ রেজিস্ট্রার নিজেই বিবাহ সম্পাদন করেন, তাহলে তিনি নিজেই বিবাহ রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করবেন। নিজে স্বাক্ষর করবেন এবং সিলমোহর দেবেন। বিবাহ অনুষ্ঠানে তিনি যে উপস্থিত আছেন তা তাকে রেজিস্টারে উল্লেখ করতে হবে। নিকাহ রেজিস্ট্রার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক বিবাহ সম্পাদিত হলে তার দায়িত্ব হল সংশ্লিষ্ট নিকাহ রেজিস্টারকে ১৫ দিনের মধ্যে বিবাহের রিপোর্ট পেশ করা। বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য যাদের স্বাক্ষর প্রয়োজন তাদের সবাইকে নিয়ে তিনি অবশ্যই নিকাহ রেজিস্ট্রারের কাছে উপস্থিত হবেন। রেজিস্ট্রারের কাছে বিবাহের রিপোর্ট পেশ না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এজন্য জেল এবং জরিমানা উভয় প্রকার দণ্ডই হতে পারে। মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে দেনমোহরের উপর ভিত্তি করে বিবাহ রেজিস্ট্রার ত্রিশ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা নেন। দেনমোহরের ১ম এক হাজার টাকার জন্য ৩০ টাকা, পরবর্তী প্রতি

হাজারের জন্য ৫ টাকা ফি দিতে হয়। এছাড়া প্রতিটি বিবাহের রেজিস্ট্রেশন ফি বাবদ রেজিস্ট্রার ২৫ টাকা কমিশন পাবেন এবং তিনি যদি বিবাহের অনুষ্ঠানে গিয়ে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করেন তবে যাতায়াত ভাড়া বাবদ প্রতি মাইলে ১ টাকা করে পাবেন। এক্ষেত্রে বর পক্ষ রেজিস্ট্রেশনের টাকা দেবেন। বিবাহ রেজিস্ট্রার টাকা পেয়ে একটি প্রাপ্তি রশিদ দেবেন। রেজিস্ট্রেশনের পর রেজিস্ট্রার বাধ্যতামূলকভাবে বিনা মূল্যে বর এবং কনে উভয় পক্ষকে নিকাহনামার সত্যায়িত কপি প্রদান করবেন।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইনের জটিলতাঃ

মুসলিম বিবাহ আইন ১৯৭৪-এর আওতায় সমস্ত বিবাহ নিবন্ধনের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে। এ আইন দৃশ্যত কার্যকর হলেও এর প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে হয়নি। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ এখনও এদেশে বলবৎ আছে কিন্তু এ আইনের সফল প্রয়োগ দেখা যায় না। এর কারণ হিসাবে বলা যায়-

* মুসলিম বিবাহ আইন ১৯৭৪ এর আওতায় সমস্ত বিবাহ নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে হবে। এ আইন দৃশ্যত কার্যকর হলেও সম্পূর্ণভাবে হয়নি।
* বর্তমান কাবিননামা ফর্মটি নানাবিধ অসংগতিতে পূর্ণ। সুতরাং ফর্মটি নতুনভাবে তৈরী করা প্রয়োজন।
* মুসলমান ও খৃষ্টানদের জন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইনের ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি প্রচলিত কোন ধর্ম বিশ্বসী নন এমন ব্যক্তির জন্যও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের জন্য কোন বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নেই।
* বাল্য বিবাহ সম্পর্কিত অন্য আইনটি স্ববিরোধী।

এখানে একদিকে অপরিণত বিবাহকে আইনগতভাবে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে, অন্যদিকে যদি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিয়ে সংগঠিত হয়ে যায় তাহলে এ বিয়েকে বাচানোর কথাও বলা হয়েছে। এ স্ববিরোধী আইন এর পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ বিদ্যমান থাকলেও এখনো বাল্য বিবাহ হচ্ছে কিন্তু তা কোন রকম রেজিস্ট্রেশন ছাড়াই। এবং যখন এমন বিয়ে হচ্ছে তখন মেয়ের বয়সের পরিপূর্ণতার স্বপক্ষে মিথ্যা দলিল দাখিল হচ্ছে, এবং বিবাহটা বৈধ হচ্ছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে বাংলাদেশে বসবসকারী সকল মানুষের জন্য সর্বজনীন বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন প্রবর্তনের চিন্তা করা যেতে পারে।

গবেষণার ফলাফল ঃ

নিম্ন আয়ের জনগণ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে কতটা সচেতন এই সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য আমরা মাঠ পর্যায়ে গিয়ে প্রশ্নপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে নিম্ন আয়ভুক্ত ১০০ জন

মহিলার সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে যে সকল তথ্য পেয়েছি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ নিম্নে সারণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলঃ

টেবিল-১ ঃ নিম্ন আয়ের মহিলাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	মহিলার সংখ্যা (জন)	শতকরা
নিরক্ষর	৪২	৪২%
অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন	২৪	২৪%
১ম-৫ম শ্রেণী	২৪	২৪%
৬ষ্ঠ-এস.এস.সি	১০	১০%
এইচ.এস.সি.-তদূর্ধ	০	০%
মোট	১০০	১০০

উপর্যুক্ত সারণী থেকে দেখা যাচ্ছে নমুনা হিসাবে যে ১০০ জন মহিলাকে বেছে নেয়া হয় তাদের মধ্যে ৪২% নিরক্ষর, ২৪% অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন, ২৪% ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী, ১০% ৬ষ্ঠ-এইচ.এস.সি. এবং এইচ.এস.সি. বা উচ্চ শিক্ষার হার মোটেও নাই অর্থাৎ নিম্ন আয়ভুক্ত অধিকাংশ মহিলা নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত।

টেবিল-২ ঃ পিতার মাসিক আয়

আয়ের পরিমাণ (টাকা)	বাবা	শতকরা
৫০০-১০০০	৩০	৩০
১১০০-২০০০	৪০	৪০
২১০০-৩০০০	২০	২০
৩১০০-৪০০০	৯	৯
৪১০০-৫০০০	১	১
৫১০০-তদূর্ধ	০	০
মোট	১০০	১০০

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে ১০০ জন পিতার মধ্যে অধিকাংশের মাসিক আয় ১১০০-২০০০ টাকা। এই টাকায় একজন পিতা তার পরিবারের সদস্যদের জৈবিক চাহিদাগুলোই পূরণ করতে পারে না। অনেক সময় তারা অর্ধাহারে, অনাহারে

দিনাতিপাত করে। তাই দেখা যায় নিম্ন আয়ের লোকদের মাঝে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে সচেতনতা বোধ থাকলেও তারা অনেক সময় অর্থের অভাবে ছেলেমেয়ের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে পারে না। কারণ আমাদের দেশে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে হলে প্রতি ১ হাজার টাকা দেনমোহরের জন্য ১০ টাকা এবং একজন সরকারি কাজীকে গ্রামে আনতে হলে তাকে ৪০০-৫০০ টাকা দিতে হয়। এটা একজন দরিদ্র পিতার পক্ষে সম্ভব নয়।

টেবিল-৩ ঃ পিতা মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	পিতা	মাতা
নিরমার	৭০	৯০
অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন	১৫	৬
১ম-৫ম শ্রেণী	৯	৩
৬ষ্ঠ-এস.সি.সি.	৬	১
এইচ.এস.সি.-তদূর্ধ	০	০

এ সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে এ সকল দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ বাবা-মা নিরক্ষর। উচ্চ শিক্ষিতের হার মোটেও নেই। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে বাবা-মার মধ্যে শিক্ষার অভাবই নিম্ন আয়ের লোকদের মধ্যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে অসচেতনতার জন্য দায়ী।

টেবিল-৪ ঃ স্বামীর মাসিক আয়

আয়ের পরিমাণ (টাকা)	স্বামী (জন)
৫০০-১০০০	১৮
১১০০-২০০০	৩৮
২১০০-৩০০০	২৫
৩১০০-৪০০০	১২
৪১০০-৫০০০	৫
৫১০০-তদূর্ধ	২
মোট	১০০

এ-সারণী থেকে বোঝা যায় দরিদ্র পরিবারের মেয়েছেলে অধিকাংশের বিবাহ হয় দরিদ্র পরিবারে এবং অধিকাংশ স্বামীর মাসিক আয় থাকে ১১০০-২০০০ টাকা। তারা

অত্যন্ত দরিদ্র এবং অস্বচ্ছল। স্বামীর অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতাও নিম্ন আয়ভুক্ত মহিলাদের বিবাহ রেজিস্ট্রি না হওয়ার অন্যতম কারণ।

টেবিল-৫ ঃ যৌতুক প্রবণতা

যৌতুক		সংখ্যা
দেওয়া হয়েছে		৭৮
হয়নি		২২
মোট		১০০

উপর্যুক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে নিম্ন আয়ভুক্ত ১০০ জন মহিলার মধ্যে ৭৮ জন মহিলার বিবাহতে যৌতুক দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় নিম্ন আয়ের লোকদের মাঝে যৌতুকের প্রবণতা বেশি। আমাদের দেশে ধনী পরিবারেও যৌতুকের প্রবণতা আছে তবে তারা সেগুলোকে যৌতুক হিসাবে না দিয়ে জামাই মেয়েকে গিফ্‌ট হিসাবে দেয়। কিন্তু দরিদ্র পরিবারে অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়ের বিয়ের যৌতুকের টাকা জোগাড় করতে গিয়ে তারা তাদের মাথা গোজার আশ্রয়টুকু বিক্রয় করে বা সমাজের বিত্তশালীদের কাছে থেকে সুদে ঋণ নেয়। এরপর আর তাদের মানসিকতা থাকে না টাকা খরচ করে বিবাহ রেজিস্ট্রি করার।

টেবিল-৬ ঃ দরিদ্র পরিবারের কত বছর বয়সে মেয়েদের বিবাহ হয়

বয়স (বছর)	বিবাহিত মহিলা
৮-১২	২৫
১৩-১৫	৪৫
১৬-১৭	২১
১৮-২০	০৭
২১-২৫	০২

এ-সারণীতে দেখা যাচ্ছে ২৫% মহিলার বিবাহ হয়েছে ৮-১২ বছর বয়সে ১৩-১৫ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে ৪৫% মহিলার ১৬-১৭ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে ২১% মহিলার আর ১৮-২০ বছর বয়সে বিবাহ হয়েছে ৭% মহিলার। সুতরাং নিম্ন আয়ভুক্ত পরিবারে অধিকাংশ মহিলার বিবাহ হয় অপরিণত বয়সে। আর অপরিণত বয়সের

কারণে মেয়েরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই তাদের বিবাহ অপরিণত বয়সের কারণে রেজিস্ট্রি হয় না।

টেবিল-৭ ঃ বিয়েতে কন্যার মতামত সম্পর্কিত প্রশ্ন।
বিয়ের সময় কন্যার সম্মতি নেয়া হয়েছে কিনা

	না	হ্যাঁ
মেঘনাপাড়া	১০	০৬
মাধবপুর	০৯	০৩
কুচিয়ামোড়া	১০	০৫
আকিকান্দি	০৬	০৮
ত্রিবেণী	০৬	০৬
মীর্জাপুর	০৬	০৬
দুলালপুর	০৪	০৫
শ্রীপুর	০৪	০৬
মোট	৫৫	৪৫

আমাদের জরিপকৃত গ্রামগুলোতে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত সচেতনতার যে চিত্র পাওয়া যায় তা থেকে দেখা যায় যে এ সমস্ত এলাকায় বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন সম্পর্কিত বিষয়ে যথেষ্ট অজ্ঞতা রয়েছে। এই এলাকার মহিলারা জানে না যে, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ্ এই গ্রামসমূহের মহিলাদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, "আপনি কি জানেন বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ?" এ প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে প্রায় ৫৭% মহিলা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের কথা শুনেনি এবং ৬০% মহিলা জানের না যে রেজিস্ট্রেশন না করা দণ্ডনীয়।

বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের হার ঃ

আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এমন কিছু প্রতিরোধ শক্তি আছে যা নারীদের বাড়তে দেয় না এবং যা তাদের মর্যাদা রক্ষা এবং প্রাপ্য আদায়ের প্রতিবন্ধক। এই প্রতিরোধ নারী-

পুরুষ উভয়ের চেতনে-অবচেতনে নিরন্তর ক্রিয়াশীল। এই সমস্ত প্রতিরোধের কারণে আমাদের দেশে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের হার অত্যন্ত কম। আমাদের জরিপকৃত গ্রামসমূহে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের হার নিচে দেওয়া হল–

টেবিল-৮ ঃ সরকারি খাতায় বিয়ে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে কত জনের

	হ্যাঁ	না
মেঘনাপাড়া	০৬	১০
মাধবপুর	০২	১০
কুচিয়ামোড়া	০৮	০৭
আকিকান্দি	০৭	০৭
ত্রিবেণী	০৬	০৬
মীর্জাপুর	০৪	০৮
দুলালপুর	০৩	০৬
শ্রীপুর	০৪	০৬
মোট	৪০	৬০

টেবিল-৯ ঃ মোট রেজিস্ট্রেশন হার

রেজিস্ট্রিকৃত	রেজিস্ট্রিকৃত নয়
৫৪%	৪৬%

বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের প্রতিবন্ধকতা ঃ

১৯৯৮ সালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও ইউনিসেফ-বাংলাদেশ পরিচালিত দুইটি সীমিত আকারের জরিপে দেখা যায়, আমাদের দেশে প্রায় ৪০ শতাংশ বিয়ে রেজিস্ট্রি হয় না। এর কারণ হিসাবে জরিপ রিপোর্টে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়।

* রেজিস্ট্রেশনের সুফল এবং প্রয়োজনীতার বিষয়ে সচেতনতার অভাব এবং এই সচেতনতা বোধ না থাকার পিছনে অজ্ঞতা, অশিক্ষা ইত্যাদির প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে

* রেজিস্ট্রেশনের পদ্ধতি এবং এ সম্পর্কে বিদ্যমান আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। রেজিস্ট্রেশন কি এবং এর পদ্ধতি কি এ সম্পর্ক উক্ত শ্রেণী সচেতন নয়।
* রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নারীর অবস্থান দৃঢ় করার ব্যাপারে আগ্রহের অভাব।

আমাদের চলমান সমাজ ব্যবস্থায় অনেকগুলো বৈষম্য বদ্ধমূল হয়ে আছে। যার মধ্যে নারীর প্রতি বৈষম্য অন্যতম। নারীর মৌলিক অধিকারই যেখানে বিপর্যস্ত সেখানে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের প্রতি সচেতনতার প্রশ্ন অনেক পরে আসে। নিম্নবিত্ত পরিবারের ক্ষেত্রে এ বিবাহ রেজিস্ট্রেশনে সংখ্যা প্রায় নাই বললেই চলে যা আমরা আমাদের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে দেখিয়েছি। তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় তা নিম্নরূপ ঃ

* পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ–পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে নারীরা মূলত পুরুষের অধীনে থাকে। যদি মুসলিম বিবাহ চুক্তি কিন্তু এতে উভয় পক্ষ অবস্থানগতভাবে সমান নয়। কনে এবং তার পরিবার স্বভাবতই দুর্বল অবস্থানে থাকে। যার ফলে কনের পরিবার রেজিস্ট্রেশনের কথা বলতে পারে না এবং বরের পক্ষও রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখায় না।
* অন্ধবিশ্বাস–অন্ধ বিশ্বাসও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না হবার পিছনে একটি কারণ। তারা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত নয়। তারা মনে করে আমার ভাগ্যে যা লেখা আছে। ভাগ্য মন্দ থাকলে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন কোন সুফল আনবে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে প্রকট।
* আর্থিক অস্বচ্ছলতা–আমরা কয়েকটি গ্রামের উপর জরিপ চালিয়ে দেখেছি, উক্ত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল। এদের অধিকাংশের দৈনিক আয় ৫০-৬০ টাকা। অর্থাৎ মাসিক আয় ১৫০০ থেকে ২০০০ এর মধ্যে। এই নিম্ন-আয়ের মাধ্যমে তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোই প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ে, আর্থিক স্বচ্ছলতা তো কল্পনাতীত। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামের অস্বচ্ছল জনগণ বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পায় না। সুতরাং আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণের পথে অন্যতম প্রধান বাধারূপে চিহ্নিত করা যায়।
* নিরক্ষরতা–আমাদের দেশের গ্রামের অধিকাংশ জনগণ অশিক্ষিত। এই অশিক্ষাই মূলত গ্রাম পর্যায়ে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের পথে প্রধান অন্তরায়। পাত্রপক্ষ ও পাত্রীপক্ষের অভিভাবকগণ এবং অন্যান্যদের অজ্ঞতার কারণে গ্রামের অধিকাংশ বিবাহ রেজিস্ট্রি করা হয় না। অতএব নিরক্ষরতাই বিবাহ

রেজিস্ট্রিকরণের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কার্যকর করার ব্যাপারে প্রধান অন্তরায়।

* সচেতনতার অভাব–আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণই বিভিন্ন বিষয়ে অসচেতন। আর গ্রামের জনগণের মধ্যে এ সচেতনতার অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অশিক্ষা, স্বল্প শিক্ষার কুপ্রভাবের ফলে তারা বিবাহ রেজিস্টিকরণের মত গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে অসচেতন। বিয়ে রেজিস্ট্রি না করা হলে বিবাহ যে আইনসিদ্ধ হয় না এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এছাড়া বিবাহ পরবর্তীকালীন কোন সমস্যা যেমন যৌতুকের জন্য নির্যাতন, অন্যান্য নির্যাতন, স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ ইত্যাদির জন্য যে আইনের সাহায্য নেয়া প্রয়োজন এবং এর জন্য যে বিবাহ রেজিস্ট্রি করা অবশ্য প্রয়োজনীয় এটা সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অসচেতন। এই অসচেতনতার ফলে তারা সুষ্ঠু বিচার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে সর্বক্ষেত্রেই নারী থাকে নির্যাতিত।

* আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা–বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কে সুষ্ঠু আইন থাকলেও গ্রামের অশিক্ষিত জনগণ এ সম্পর্কে অজ্ঞ। এছাড়া তাদের মধ্যে আইন আদালত থেকে দূরে থাকার প্রবণতা দেখা যায়। এক্ষেত্রে গ্রামের অশিক্ষিত জনগণের পাশাপাশি আইন প্রণেতাদেরও ত্রুটি দেখা যায়। বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণ সম্পর্কিত আইন সম্বন্ধে তাদেরকে ব্যাপকভাবে অবহিত না করার ফলেই মূলত তারা এ ব্যাপারে অজ্ঞ। গ্রামের অনেক মহিলারা জানে না যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা হলে বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আদালতে গেলে কোন বিচার পাওয়া যায় না।

* কুসংস্কার–বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার গ্রামীণ উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায়। গ্রামের মহিলাদেরকে কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখা হয়। গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণ বিবাহ রেজিস্ট্রিকে একটি সামাজিক ও অন্যায় কার্যকলাপ হিসাবে অভিহিত করেন। এর ফলে অভিভাবকগণের মধ্যে সরকারি কাজী ডাকা এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি করার মধ্যে অনীহা দেখা যায়, অনেকে বলে থাকেন যে, "কালেমা পড়ানো হয়ে গেছে আবার রেজিস্ট্রি কি?"–অনেক গ্রাম্য মোড়ল, মাওলানাদের এই সব কথাবার্তার বশবর্তী হয়ে অনেকে বিবাহ রেজিস্ট্রি করে না।

* যৌতুকের প্রবণতা–যৌতুক আমাদের দেশে একটি অভিশাপ স্বরূপ। যৌতুক বিবাহের কোন অংশ বা শর্ত নয়। এটা একটা সামাজিক ব্যাধি। বিবাহের সংশ্লিষ্ট পক্ষকে অথবা বা কোন এক পক্ষের মা-বাবা কর্তৃক বা অন্য কোন বাদী কর্তৃক অন্য পক্ষকে বা পরোক্ষভাবে বিবাহের সময়ে বা বিবাহের আগে বা পরে পণ হিসেবে প্রদত্ত বা প্রদানের সম্মত কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানত যার মূল্য ৫০০/- টাকার বা তার ঊর্ধ্বে তাকেই যৌতুক বলে। আমাদের গবেষণার

পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে অত্র এলাকাসমূহের মধ্যে যৌতুক গ্রহীতার হারই বেশি যা একবিংশ শতাব্দীর এক চরম অমানবিক চিত্র। গ্রামের প্রায় সকল জনগণই বিয়েতে যৌতুক গ্রহণ করে। তাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল নয় এবং নিম্ন আয়ের মাধ্যমে জীবনযাত্রার ব্যয়ভার বহন করতে হয়। ফলে তারা বিয়ের সময় একটা মোটা অঙ্কের টাকার অলঙ্কার অথবা অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী দাবি করেন। কন্যা পক্ষকে যে কোন প্রকারে ঐ দাবি পূরণ করতে হয়। স্বভাবতই বিয়ে রেজিস্ট্রি করা থাকলে কন্যা পক্ষ যৌতুকের বিরুদ্ধে আদালতের সাহায্য নিতে পারে এবং এর প্রতিবাদ করতে পারে। সুতরাং যৌতুক নেবার প্রবণতা বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণের পথে বাধাস্বরূপ।

* ধর্মীয় গোড়ামী–আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে ফতোয়াবাজ এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। এ সমস্ত ফতোয়াবাজরা বিভিন্ন বিষয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে উন্নয়নের ধারাকে রুদ্ধ করে দেয়। বিবাহ রেজিস্ট্রিকরণের মত অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ বিষয়কে তারা ফতোয়াবাজির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে দেয় না। তারা এটাকে অধর্মীয় বলে গণ্য করে এবং গ্রামের অশিক্ষিত জনগণকে এ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা প্রদান করে। বিভিন্ন ধর্মীয় ভয়-ভীতি প্রদান করে তাদেরকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অসচেতন করে তোলা হয়।

* জীবনযাত্রার নিম্নমান–বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। গ্রামের জনগণের জীবনযাত্রার মান আরও নিম্ন। এদের যে আয় তা দিয়ে ন্যূনতম অভাব পূরণ করাই কষ্টকর। এদের সর্বদাই মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য চিন্তিত ও ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে অন্যান্য সামাজিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ তাদের নেই। এ কারণে তারা বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করার গুরত্ব সম্বন্ধে সচেতন নয়। বিয়ে কোন রকমে সম্পন্ন হলেই হল। বিবাহ যে সরকারিভাবে রেজিস্ট্রি করা প্রয়োজন এ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অসচেতন।

* পাত্র পক্ষের অনিচ্ছা–নিম্ন-আয়ের লোকদের মাঝে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে অনিচ্ছা দেখা যায়। অনেক দরিদ্র পরিবারে মনে করে রেজিস্ট্রি করতে হলে আবার অর্থের প্রয়োজন। যদি মৌলানা দ্বারা বিবাহ পড়ানো হয় তবে আর সেই অর্থের প্রয়োজন পড়বে না। সাধারণত পাত্র পক্ষের আয় নিম্ন হয় বলে তারা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনে যে খরচ তা বহন করতে চায় না। বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য কাজীকে যে পরিমাণ টাকা দিতে হয় সেই টাকা দেয়ার ভয়ে অনেক পাত্র পক্ষ বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করতে চায় না। তারা গ্রামের মওলানা ও নিকটবর্তী মসজিদের ইমামের মাধ্যমে বিয়ে পড়াতে উৎসাহী হয়।

* প্রচার মাধ্যমের অনীহা–নিম্ন-আয়ের মহিলাদের মধ্যে যে সব অসচেতনতা

রয়েছে সে ব্যাপারে প্রচার মাধ্যম একটা গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু গ্রামের মহিলাদের সাথে কথা বলে দেখা যায় তারা বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে প্রচার মাধ্যম থেকে তেমন সহযোগিতা পায়নি। প্রচার মাধ্যমের মধ্যে তেমন কোন উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। প্রচার মাধ্যম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে নিম্ন-আয়ের মহিলাদের সচেতনতার ব্যাপারে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

* স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের সদিচ্ছার অভাব-বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিদের যে ভূমিকা রয়েছে সেই ভূমিকা তারা কার্যকর করে না। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণ গ্রামের মহিলাদের এ ব্যাপারে সচেতন করার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে সদিচ্ছার অভাব লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিগণের এ ব্যাপারে সচতেন করে তোলার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা এ ব্যাপারে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। বর্তমানে প্রতিটি গ্রামে স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে ১ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন মহিলা সদস্য এবং ৩ জন পুরুষ সদস্য দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে তারা যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতো তবে এই সমস্যার সমাধান অনেকাংশে ত্বরান্বিত হত।
* মেয়েদের মতামত প্রকাশে স্বাধীনতার অভাব-গ্রামে মেয়েরা সব ব্যাপারেই অবহেলিত। তারা তাদের মতামতকে কোনভাবেই প্রকাশ করতে পারে না। বিবাহ রেজিস্ট্রিশন সম্পর্কে যদি গ্রামের মহিলাদের মধ্যে কোন ধারণা থাকে সেটাকে গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তি, অভিবাবকগণ গ্রহণ করে না। ফলে তাদের এ ব্যাপারে কোন মতামত থাকলে তা অপ্রকাশিত থেকে যায়। সে কারণেই বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের মত একটা গুরত্বপূর্ণ বিষয় অকার্যকর থাকে।
* রেজিস্ট্রি অফিসের দূরত্ব-রেজিস্ট্রি অফিসও দূরে থাকায় অনেক দরিদ্র পরিবার বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে আগ্রহী হয় না।

সমস্যা সমাধানের উপায়ঃ

বাবা মায়ের দায়িত্ব-

* প্রত্যেক বাবা-মা তাদের মেয়ের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে বিবাহ করার অনুমতি দেবে না।
* প্রত্যেক বাবা-মা কর্তৃক তাদের প্রতিটি সন্তানের বিবাহের জন্য আবশ্যকীয় পূর্বশর্ত হবে বিবাহ রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিতকরণ।
* বিবাহ অনুষ্ঠানের দিন বাবা-মা বিবাহ অনুষ্ঠানস্থলে নিকাহ রেজিস্ট্রারকে নিয়ে

আসবে এবং সেইদিনই বিবাহের রেজিস্ট্রেশন করাবে।

* প্রত্যেক বাবা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সময় যাতে নিকাহনামার সবগুলো কলাম সঠিকভাবে পূরণ করা হয় তা নিশ্চিত করবে।
* যদি বিবাহ সম্পাদনের দিন রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব না হয় তাহলে বিবাহের দিন থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিকাহ রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে গিয়ে বিবাহটির রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নেবে।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের পর তাদের সন্তান যাতে নিকাহনামার একটি কপি পায় এবং যথাযথভাবে তা সংরক্ষণ করে সে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।
* এসকল ভূমিকা পালনের জন্য প্রত্যেক বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ করবে।

নিকাহ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব-

* যদি সে জানতে পারে যে তার আওতাধীন এলাকায় কোন বিবাহ সম্পাদিত হয়েছে তাহলে যত দ্রুত সম্ভব সে সেই বিবাহটি রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা করবে।
* বিভিন্ন ফোরামে যেমন স্কুল এবং এনজিও কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সভায় বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে সে মানুষকে সচেতন করবে।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সময় সে নিশ্চিত হয়ে নেবে যে বর এবং কনে অপ্রাপ্ত বয়স্ক নয় এবং বিবাহে তাদের সম্মতি আছে।
* সে নিকাহনামার প্রতিটি কলাম সঠিকভাবে পূরণ করবে।
* সর্বসাধারণের সুস্পষ্ট অবগতির জন্য সে তার কার্যালয়ে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ফি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের তথ্য যথাযথভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে।
* রেজিস্ট্রেশন ফি জমা নিয়ে সে প্রাপ্তি রশিদ দেবে।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের পর সে উভয় পক্ষকেই নিকাহনামার কপি প্রদান করবে।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দায়িত্ব-

* ইউনিয়ন পরিষদ/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মাসিক সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনুষ্ঠিত সালিশে তারা বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করবে।
* তিনি তার এলাকার জনসাধারণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত করবেন-

– মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

– বিবাহের রেজিস্ট্রেশন, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ এবং মুখে মুখে তালাক ইত্যাদি প্রতিরোধ করতে সহায়তা করবেন।

– তাদের এলাকায় অনুষ্ঠিত সকল বিবাহের রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করার জন্য তিনি সমাজের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

– বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য একজন নিকাহ রেজিস্ট্রার আইনগতভাবে যেসব ফি দাবি করতে পারেন যে সম্পর্কে তিনি জনসাধারণকে অবহিত করবেন।

সাধারণ নাগরিকদের দায়িত্ব-

* কোন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব অথবা প্রতিবেশী যেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের বিবাহ না দেন তা নিশ্চিত করার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।
* বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে হবে।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে বোঝাতে হবে এবং মুসলিম বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করা যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ তাও সংশ্লিষ্ট জনগণকে জানাতে হবে।
* পরিবারে, বন্ধু-বান্ধবের পরিবারের অথবা প্রতিবেশীর পরিবারে অনুষ্ঠিত প্রতিটি বিবাহের যাতে রেজিস্ট্রেশন করা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
* যেসব বিবাহ সম্পাদনের সময় রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হবে না সেসব বিবাহ সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য উভয় পক্ষকে উৎসাহিত করতে হবে।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য নিকাহ রেজিস্ট্রার আইনগতভাবে যেসব ফি দাবি করতে পারেন তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করা।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করার পরিণতি সম্পর্কে মানুষকে বুঝিয়ে বলাও একজন নাগরিকের কর্তব্য।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সময় নিকাহনামার সবগুলি কলাম যাতে যথাযথভাবে পূরণ করা হয় তা করার ব্যাপারে সচেতন নাগরিকগণ উৎসাহিত করবে।
* উভয় পক্ষই যাতে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের পর নিকাহনামার কপি সংগ্রহ করে তা নিশ্চিত করার জন্য অন্যান্যরা তাকে উদ্বুদ্ধ করবে।

গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব-

ইস্যুভিত্তিক প্রতিবেদন লেখা এবং পত্র-পত্রিকায় সেসব প্রতিবেদন প্রকাশের ব্যবস্থা করে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের গুরুত্ব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা গণমাধ্যমের প্রতিনিধির দায়িত্ব।

* গবেষণামূলক প্রতিবেদন-
  - প্রতি বছর সংশ্লিষ্ট এলাকায় কতগুলি বিবাহ সম্পাদিত হয়।
  - শতকরা কত ভাগ বিবাহের রেজিস্ট্রেশন হয়।
  - নিকাহনামা যথাযথভাবে পূরণ হয় কিনা।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সুফল এবং রেজিস্ট্রেশন না করানোর কুফল সম্পর্কে প্রতিবেদন।
* বিবাহ রেজিস্ট্রেশন না করানোর পলে বাস্তব জীবনে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে কেস স্টাডি।
* বাল্য বিবাহের কুফল সম্পর্কে নিবন্ধ।

উপসংহার ঃ

আমাদের দেশের মত বেশীরভাগ উন্নয়নশীল দেশেই নারী সমাজ পিছিয়ে আছে, পদে পদে তারা অপমান ও প্রবঞ্চনার শিকার। সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টির দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে বহু দূর পর্যন্ত , কিন্তু সেই তুলনায় মেয়েরা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট অগ্রসর হতে পারেনি। পরিস্থিতি বিশ তিরিশ বৎসর আগের মত নেই সত্যি; নারী শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, অনেক মহিলা এখন কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কর্তব্যকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে, কর্মক্ষেত্রে অনেক নারী একালে মেধা ও দক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। তাহলেও সামগ্রিক দিক দিয়ে বিচার করলে বৃহত্তর নারী সমাজ পিছনেই পড়ে আছে। পরিবারে, সমাজে এবং বাইরের বিশাল কর্ম-জগতে নারী কতটা মূল্যায়ন পাচ্ছে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তার মতামতের কতটা মূল্য দেওয়া হচ্ছে। মানবিক মর্যাদায় সে কতটা অভিষিক্ত হচ্ছে তার আমরা দেখার চেষ্টা করছি। এ গবেষণার মাধ্যমে দেখা গিয়েছে গ্রামের মহিলাদের বিবাহ রেজিস্ট্রি সম্পর্কে সচেতনতা তেমনভাবে দেখা যায়নি। এই সচেতনতার অভাবের পিছনে কয়েকটি কারণকে দায়ী করা যায়, যথা–

* শিক্ষার অভাব।
* মেয়েদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অভাব। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক

মনোনীত কাজী দ্বারা বিবাহ না পড়ানো।

* বিবাহ রেজিস্ট্রি না করলে পরবর্তীতে যে পুনরায় বিবাহের অসুবিধা এবং আইনের সাহায্য পাওয়া যায় না এ ব্যাপারে তারা অবহিত নয়।

* এবং গ্রামের মহিলারা অধিকাংশ দরিদ্র।

এ গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা জানতে পারি যে, গ্রামের মহিলাদের এ ব্যাপারে সচেতন করে তুলতে সরকারি ও বেসরকারিভাবে মাঠ পর্যায়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। গবেষণা কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে অবহতি হয়েছি যে, গ্রামের মহিলারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহেলিত, কারণ সরকারি ও বেসরকারিভাবে মাঠ পর্যায়ে তাদেরকে সচেতন করে তোলার কোন পএক্ষপই নেয়া হয়নি। গ্রামের মহিলারা যাতে নির্যাতনের হাত হতে রক্ষা পায় এবং তাদের যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য আদালতের স্মরণাপন্ন হতে পারে এবং সুবিচার পায় সেজন্য বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা জরুরী। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

আশার বিষয় এই যে, বাংলাদেশের পরিবেশ পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। পিছনে টেনে ধরে রাখার শক্তি যেমন সক্রিয়, তেমনই ক্রমান্বয়ে প্রবল হয়ে উঠছে প্রগতির ধারা। তাই আশা করা যায় ভবিষ্যতে ধারা আরও বৃদ্ধি পাবে। আমরা আশা করি কাঙ্ক্ষিত সেই প্রগতিকে নিকটে নিয়ে আসতে সময়োচিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। জন্ম ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। "রেজিস্ট্রেশন বিহীন বিয়ে বন্ধে যে আইন ও শাস্তি তা খুবই দুর্বল। ১৯৭৪ সালের বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন কার্যকর করতে শাস্তির মাত্রা আরো বাড়াতে হবে। পুলিশ, ধর্মীয় প্রতিনিধি, আইন প্রণেতা ও বিবাহ রেজিস্ট্রেশনকারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান। মসজিদের ইমামদের এ লক্ষ্যে এবং তার সুফল সম্পর্কে জনগণকে অভিহিত করার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে।

FOOTNOTE

1. Huda, Shanaz. Child Marriage: Social marginalization of the Statutory Law, Bangladesh Journal of Law, December-1997, Vol-1 No-1 P-166.
2. Nasir, Rasheda Irshad & Pervin, F.R, Marriage Registration among the poor urban women, Social Science Review, Dhaka University, December-1997, Vol-14, No-2, P-91.
3. Haviland, W.A, (1993) Cultural Anthropology, P-209.
4. Murdock (1949) Social Structure, U.S.A, Macmilan.
5. Huda, Shanaz, ibid, P-90.
6. Thanvi, Ashraf Ali (1985), Behesti Jeor. P-8.
7. বাল্য বিবাহঃ শিশুর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সেপ্টেম্বর-২০০১, পৃ-১৩।
8. আল কুরআনঃ সুরা নিসা, ৪।
9. Huda, Shanaz, ibid, -95.
10. Uddin, M, Gias, & Selim, M. (2000), An agony into the nature and consequences of Child Marriage in Bangladesh, Journal of Bangladesh Society, IMIT, P-93.
11. Huda, Shanaz, ibid, P-86.

ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
অষ্টম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১০

বাংলাদেশে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

মোঃ আবুল হোসেন*

মুহঃ মিজানুর রহমান**

Abstract : The majority portion of the people of Bangladesh is living in rural areas. So the sustainable development of Bangladesh means the development of rural areas and the living conditions of the rural masses. This is why various efforts have been taken by the GO's and NGO's. But it is accredited that after passing 32 years of our independence and in spite of spending a lot of money the situation have not improved significantly rather in some respect the plight of the rural masses has been worse. Countrywide poverty, process of polarisation, growing disparities among the rich and the poor bear the testimony of this harsh reality. The aim of this article is to overview the various efforts of GO's and NGO's to alleviate poverty and find out the limitations of the past programmes. Finally, it will provide some recommendations to improve the situation.

ভূমিকাঃ

দারিদ্র্যের দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রায় এক ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১২.৩২ কোটি এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৮৩৪ জন।[১] দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক দরিদ্র, নিরক্ষর, অসংগঠিত এবং আয়ের উৎস ও ক্ষমতার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ খুবই কম। বিগত ৩২ বছরে পনেরো হাজার কোটি টাকা ব্যয় করার পরও জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার প্রায় ২ শতাংশ। মোট জনসংখ্যার ৭৬.৬১% গ্রামে ও ২৩.৩৯% শহরে বাস করে।[২] পল্লী ও নগরে দরিদ্রাবস্থা বিরাজ করলেও চরম কেন্দ্রীকতা পল্লীতে সবচেয়ে বেশী। পল্লী এলাকায় ৫৩.১০ শতাংশ মানুষ যেখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে সেখানে শহরে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারীর সংখ্যা ৩৬.৬০ শতাংশ।[৩] জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি মানব উন্নয়ন সূচক ১৯৯৪-এ প্রত্যাশিত আয়ু, বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার এবং ক্রয়ক্ষমতা সমন্বিত প্রকৃত মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদন-এ তিনটি বিষয়কে মানদণ্ড ধরে নিয়ে ১৭৩টি দেশের যে মানব উন্নয়ন সূচক তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৬তম। মানব উন্নয়নের কথা বাদ দিলেও মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এদেশের অবস্থান বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে নিম্নতম পর্যায়ে রয়েছে।

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

** সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

এক্ষেত্রে উন্নত বিশ্বের তুলনায় (যেমন সুইজারল্যান্ডের বার্ষিক মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ৩৬,২৩০ মার্কিন ডলার) এদেশের মাথাপিছু আয় (বার্ষিক ৩৯০ ডলার) বহুগুণে কম। শুধু তাই নয়, মাথাপিছু আয়ের বিচারে দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম; এসব তথ্য এদেশের দারিদ্র্যেরই বহির্প্রকাশ।

এদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। সুতরাং একথা সহজেই অনুমেয় যে, দারিদ্র্য গ্রামাঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী। উপরন্তু নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, বেকারত্ব, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সীমাহীন দুর্নীতি ইত্যাদির বেড়াজালে এদেশের পল্লী সমাজের টেকসই উন্নয়ন আজো আটকে পড়ে আছে। এহেন অবস্থা থেকে আশু উত্তরণ না ঘটলে পল্লী উন্নয়ন তো দূরের কথা জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির গতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব নয়। এ কারণে এদেশের পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনার দুর্বলতা, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সর্বগ্রাসী দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে গৃহিত কর্মসূচিসমূহ কাঙ্ক্ষিত সফলতার মুখ দেখতে সক্ষম হয়নি। অথচ একথা সত্য যে, বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের মতো নগর ও শিল্পভিত্তিক উন্নয়নের উপর অধিকতর দৃষ্টি প্রদান করায়, শহরবাসীদেরকে বেশি উপকৃত করেছে। চাকচিক্য, জৌলুস, আর বিলাসিতা বেড়েছে শহরবাসীর। শিল্পভিত্তিক উন্নয়নের এ-ধারা ক্রমাগত শহরকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে পল্লীবাসীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে তেমন কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি।

পল্লী দারিদ্র্য প্রবণতা/ প্রাসংগিক তথ্যঃ

বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ অথচ জনসংখ্যার সক্ষমতা (Capacity)-র বিচারে খুবই দুর্বল। এ কারণে বাংলাদেশকে তার সীমিত সম্পদ নিয়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্যে ভীষণ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। গ্রাম প্রধান এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আয়ের প্রধান উৎস কৃষি হলেও দুভার্গ্যজনকভাবে এ খাত ভূমিহীনদের জন্যে লাভজনক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। ফলে দেশের মোট শ্রমশক্তির এক-তৃতীয়াংশ বেকার থাকে যা শ্রমিকের সংখ্যায় প্রকাশ করলে দাঁড়ায় ১ কোটি ৬০ লাখ। এর সাথে প্রতি বছর ১৭ লাখ নতুন জনসংখ্যা যুক্ত হচ্ছে।[৪] এদেশে এমনিতেই মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ খুবই কম তাতে প্রতিনিয়ত নতুন মুখ যোগ হওয়ায় ভূমিহীন জনসংখ্যার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৬৮ সালে এদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ছিলো ২০%, স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৫ সালে ৩৩%, ১৯৭৭ সালে ৫০%, ১৯৭৮ সালে ৫৬% এবং বর্তমানে তা ৭০%-এ উপনীত হয়েছে।[৫] বিআইডিএস-এর এক সমীক্ষায় পরিবারের আয়ের ভিত্তিতে দেখানো হয়েছে যে, দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হার ১৯৮৯-৯০ সালে ৬০%। পুষ্টি সম্পর্কিত জরিপের উপাত্ত থেকে জানা যায়, এদেশের অধিকাংশ মানুষ অপুষ্টির শিকার। পুরুষদের মধ্যে এ হার ৪৩% আর মহিলাদের মধ্যে প্রায় ৫৯%। প্রায় ১০% পরিবার

ঝুপড়িতে আর ৩২% পরিবার এক কক্ষবিশিষ্ট ঘরে পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করে থাকে। এক জোড়া পরিধেয় বস্ত্র নেই এমন প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার হার ১৭% এবং শীতবস্ত্র নেই এমন জনসংখ্যার হার ২২%। দেশের স্বাস্থ্য সুবিধাও অপ্রতুল। এদেশের প্রতি ৪২১৮ জন লোকের জন্যে মাত্র ১ জন রেজিস্টার্ড ডাক্তার রয়েছে। ১৯৯০ সালের উপাত্ত অনুযায়ী প্রতি হাজার জনসংখ্যার মধ্যে হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ রয়েছে মাত্র ২২ জনের। স্বাস্থ্য সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলের চিত্র আরো করুন। গ্রামাঞ্চলে মাত্র ১৩% লোক সরকারি স্বাস্থ্য সুবিধা ভোগ করতে পারে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ৪৮% এবং শহরতলির প্রায় ১৮% জনগোষ্ঠী প্রতিদিন ২,১২২ ক্যালরি খাদ্যশক্তি গ্রহণ করে ন্যূনতম ৩,৬০০ ক্যালরির বিপরীতে (সারণী-১)।

সারণী-১

এলাকাভিত্তিক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য পরিমাণ (ক্যালোরি পরিমাপে) শতকরা হারে)।

প্রকৃতি	সাল	এলাকা		
		গ্রাম	শহর	জাতীয়
দরিদ্র	১৯৮৩-৮৪ ১৯৯৫-৯৬	৬১.৯০ ৪৭.১০	৬৭.৭০ ৪৯.৭০	৬২.৬ ৪৭.৫
চরম দরিদ্র	১৯৮৩-৮৪	৩৬.৭০	৩৭.৪০	৩৬.৭৫
	১৯৯৫-৯৬	২৪.৬০	২৭.৩০	২৫.১০

(সূত্র ঃ খানা জরিপ-১৯৯৫-৯৬, বিবিএস)

দ্রষ্টব্য ঃ ৯৫-৯৬ অর্থ-বছরের Cost of Basic Method দ্বারা উচ্চ পর্যায়ের দারিদ্র্যের হার ৫৩.১% এবং নিম্ন পর্যায়ের দারিদ্র্যের হার ৩৫.৬% পরিমাপ করা হয়েছে।

একজন লোকের দৈনিক প্রোটিনের প্রয়োজন ২৫ গ্রাম। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিটি লোক গড়ে প্রায় ৭.৫ গ্রাম প্রোটিন গ্রহণ করার সুযোগ পায়। ফলে পুষ্টির অভাবে এদেশের জনগণের জীবনীশক্তি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে এবং বছরে প্রায় ৪০ হাজার শিশু অন্ধত্বের অভিশাপ বরণ করে নিতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৯০ সালের হিসেব অনুযায়ী এদেশে নবজাতকের মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ছিল ৯৪ জন, ১৯৯৮ সালের তা হ্রাস পেয়ে ৫৭ জনে দাঁড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এ সংখ্যা হাজারে ৬৬ জন। এদেশে প্রসূতি মৃত্যুর হার শহরাঞ্চলে ২.৯ জন হলেও গ্রামাঞ্চলে এ সংখ্যা ৩.৪ জন। বাংলাদেশের সকল ইউনিয়নে মা ও শিশু কেন্দ্র স্থাপিত হলেও ৪০% অসুস্থ মহিলার পক্ষে ইউনিয়ন কেন্দ্রে পৌঁছানোর বাহন যোগাড় ও অর্থ ব্যয় করা সম্ভব নয়। ১৯৯০-৯১ সালের নিরীক্ষাধর্মী এবং ১৯৯২ সালে 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' কার্যক্রমের আওতায় এবং শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ও মাধ্যমিক পর্যায়ে মহিলাদের অবৈতনিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার ফলে বিগত ১০ বছরে শিক্ষার হার ৩২% থেকে ৬২% এ উন্নীত হলেও এখনো প্রায় ৩ কোটি বয়স্ক মানুষ এবং ৫০ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব

হয়নি। ১৯৯৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ৫-৯ বছর বয়স্কদের ৯৫% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ১০-১৪ বছর বয়স্কদের ৩৪% উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং ১৫-২০ বছর বয়স্কদের ৬% মাত্র কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষারত।

ধনী দরিদ্র বৈষম্যঃ

বাংলাদেশের গ্রাম-শহর উভয় অঞ্চলে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশী। ফলে এদেশে ধনী আরো ধনী এবং গরীব আরো গরীব হচ্ছে। প্রতিদিন, প্রতি মাস ও বছরে এই দুই বিপরীত শ্রেণীর সম্পদের বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। শহরগুলোতে একশ্রেণীর মানুষের ভোগ বিলাসের পাশাপাশি সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যের বিষয়টি কারো অজানা নয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষায় উদ্ধৃত তথ্যাবলী এর সুস্পষ্ট প্রমাণ (সারণী-২)।

সারণী-২

জাতীয় পর্যায়ে পরিবারভিত্তিক আয় বণ্টন (শতাংশ)

	১৯৯৫-৯৬	২০০০
সর্বাধিক ৫% ধনী পরিবার	২৩.৬২%	৩০.৬৬%
অবশিষ্ট ৯৫% পরিবার	৭৬.৩৮%	৬৯.৩৪%
সর্বাধিক দরিদ্র ৫% পরিবার	০.৮৮%	০.৬৭%

(সূত্রঃ দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩)

অর্থনীতিবিদরা মনে করেন দীর্ঘদিন যাবত জাতীয় আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে গরীব জনগোষ্ঠীকে বঞ্চিত রাখা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে গ্রামাঞ্চলকে উপেক্ষা করাই এই বৈষম্য বৃদ্ধির কারণ। সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচনের বাহারি কর্মসূচিগুলো এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে পারছে না। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কর্মসূচি নেয়া সত্ত্বেও ধনী-গরীবের আয়ের ব্যবধান না কমে বরং আরো বাড়ছে। তথ্যানুযায়ী ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে এদেশে চরম দরিদ্র ১০% লোকের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিলো মোট সম্পদের ২.২৪%। যা ২০০০ সালে কমে দাঁড়ায় ১.৮২%-এ। আর ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ধনী ১০% লোকের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিলো মোট জাতীয় সম্পদের ৩৪.৬৭%। যা ২০০০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪০.৭২%-এ। উল্লিখিত দু'টো বিবেচ্য সময়ে ধনী-গরীবের আয়ের ব্যবধান ৩৫.৭% গুণ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩.৪% গুণ-এ। সরকারি এই পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায় '৯০ দশকের পরবর্তী সময়ে গড়ে ৪% প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত লোকসংখ্যার পরিমাণ হ্রাস বা মাথা পিছু আয় কিছুটা বাড়লেও সেটা সমাজের সুবিধাভোগী ধনী শ্রেণীর অনুকূলে কাজ করেছে।

শ্রেণীবিভাজন ও আয় বৈষম্য দেশটিতে ক্রমেই প্রকট আকার ধারণ করছে। এদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫% মোট জাতীয় আয়ের ২১% নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে ১৮% আয়

নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ৪০% লোক। আয় বৈষম্যের ভিত্তিতে এদেশের মানুষ নিঃস্ব, গরীব, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, ধনী, অতি-ধনী ইত্যাদি অভিধায় চিহ্নিত হচ্ছে (সারণী-৩)। ১৯৮৯-৯০ সালে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী পল্লী অঞ্চলে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিবার একাধিক মারাত্মক অসুস্থতাজনিত সংকটের সম্মুখীন হয়ে থাকে। আর এ সংকট মোকাবেলায় তারা তাদের জমি ও অন্যান্য সম্পদ বিক্রি করে টিকে থাকার প্রয়াস চালায়। কিন্তু একথা দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের ব্যাংক কিংবা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তারা সংকট উত্তরণের সুস্পষ্ট কোন দিক নির্দেশনা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্যের কোনটাই পায় না।

সারণী-৩
সামাজিক শ্রেণী অনুসারে বাংলাদেশীদের আয় বণ্টন

	পর্যায়	১৯৭৩-৭৪	১৯৮১-৮২	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৮-৮৯
উচ্চবিত্ত (৫ শত্যাংশ)	গ্রাম	১৬.৮০	১৬.৭৮	১৮.১৪	২১.৩৬	১৯.৮১
	শহর	১৮.৬০	২০.৮৯	১৬.৯৩	১৮.০৪	২০.০২
	জাতীয়	১৬.৪০	১৮.৯৫	১৮.৩৫	২১.৩৫	২০.৫১
উচ্চমধ্যবিত্ত (১৫ শত্যাংশ)	গ্রাম	২৬.৫০	২৫.৬৪	২৪.৫৬	২৩.৭১	২৫.৩৭
	শহর	২৬.৬০	২৭.০১	২৭.৭৯	২৬.১০	২৬.৩৭
	জাতীয়	২৬.৩৭	২৫.০৯	২৪.৬৭	২৫.৬৯	--
মধ্যবিত্ত (১৫ শতাংশ)	গ্রাম	১৯.১০	১৮.৮২	১৯.২৪	১৯.৯৫	১৮.০২
	শহর	১৭.৮০	১৬.০৭	১৮.৮৪	১৯.২০	১৭.৫২
	জাতীয়	১৮.৩০	১৭.৩৬	১৮.৯৫	১৯.৩৫	১৭.৫৩
নিম্ন মধ্যবিত্ত (৪০ শতাংশ)	গ্রাম	৩৮.৪০	৩৮.৭৭	৩৮.০৬	৩৬.২১	৩৬.৮০
	শহর	৩৮.০০	৩৬.০২	৩৭.৯১	৩৭.৮৭	৩৫.৭৪
	জাতীয়	--	৩৭.৩২	৩৭.৬৭	৩৫.৮০	৩৬.২৮

সুতরাং কি ভয়াবহ হারে দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে নিঃস্বকরণ প্রক্রিয়ার (Process of Pauperisation) প্রসার হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। আশঙ্কাজনক হারে দারিদ্র্য বৃদ্ধির কারণেই মূলত সমাজ ও রাজনৈতিক অঙ্গনে অশনি সংকেতের পূর্বাভাস হিসেবে একদিকে যেমন অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যদিকে তেমনি সামাজিক ব্যাধি হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে সন্ত্রাস। সেই সাথে বাড়ছে দুর্নীতি, ঘুষ, চাঁদাবাজি, চোরাচালান ইত্যাদি। দারিদ্র্যের চোরাবালিতে পথ হারাচ্ছে আমাদের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রা। বিঘ্নিত হচ্ছে কাঙ্ক্ষিত দারিদ্র্য বিমোচন তথা মানব উন্নয়ন কর্মসূচি।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ঃ তত্ত্ব ও বাস্তবতা

দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় হল কর্মসংস্থান সৃষ্টি। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে কলকারখানা গড়ে উঠার কোন আলামত না পাওয়া গেলেও একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

লোকশানের ভয়ে অনেক প্রতিষ্ঠিত কলখারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে অনেক দক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়ে ঢাকা শহরের বস্তিতে এসে আশ্রয় নিচ্ছে।

বর্তমানে ঋণ প্রাপ্তি মানুষের একটা মৌলিক অধিকার হিসাবে আলোচিত হলেও দাতা সংস্থার ঋণের কিস্তি পাওয়ার শর্তানুসারে একটা রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক ব্যক্তি খাতে হস্তান্তর ও গ্রামীণ এলাকায় ব্যাংকের শতাধিক শাখা বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এই সব ব্যাংক স্থাপনের ফলে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কার্যক্রম ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হচ্ছিল তাও ব্যাহত হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। এ ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে গ্রামীণ এলাকায় দারিদ্র্য বেড়ে গিয়ে গ্রামের ছিন্নমূল মানুষের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতাকে উৎসাহিত করবে-একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এদেশের মোট জনগোষ্ঠীর তিন-চতুর্থাংশের মতো মানুষ গ্রামে বাস করলেও তারা সম্পদ বন্টনে বৈষম্যের শিকার। তারা ব্যাংক আমানতের ২৩% যোগান দিলেও ঋণ পায় মাত্র ১৩%। এদিকে ব্যাংকের অর্থায়ন সুবিধাকে যখন গ্রামাঞ্চলের জন্যে ক্রমে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হচ্ছে তখন সরকার রাজস্ব সংগ্রহের জন্যে কর-শুল্ককে ক্রমেই গ্রামমুখী করছে। নতুন অর্থ বছর ২০০৩-২০০৪ থেকে জেলা শহেরর বাইরে সব দোকান থেকে দুই হাজার টাকা মূল্য সংযোজন কর এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সবাইকে আয়কর রিটার্ন দাখিল করার কথা বলা হয়েছে। সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপ গ্রামীণ সম্পদকে শহরমুখী করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা–দ্যা হাংগার প্রজেক্ট-এর এক হিসাবে দেখা যায়, জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের হিস্যা অনুযায়ী প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় যেখানে প্রায় দশ কোটি টাকা ব্যয় হওয়ার কথা সেখানে প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হয় মাত্র এক কোটি থেকে এক কোটি দশ লাখ টাকার মত। গ্রামের এ জাতীয় হিস্যা শহরের চাকচিক্য বৃদ্ধিতে ব্যয় করা হয়। অথচ গ্রাম এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপেক্ষিতই থেকে যায়।

দারিদ্র্য ও দারিদ্র্য পরিমাপের কৌশল ঃ

দারিদ্র্যের পরিমাপ নিঃসন্দেহে একটি জটিল বিষয়। এর এমন কোন দৃশ্যমান ভৌত কাঠামো নেই যা দ্বারা এটি পরিমাপ করা যায়। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, মানুষের মৌলিক চাহিদা-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা-এই পাঁচটির ভারসাম্য বিনষ্ট হলে তা মানুষের অস্তিত্বের উপর প্রভাব ফেলে। কিন্তু নীতি নির্ধারণের জন্যে নির্দিষ্ট একটি মাপকাঠি তো থাকা দরকার। গ্রামীণ দারিদ্র্য চিহ্নিত হতে পারে ভূমি-কে কেন্দ্র কের। কারণ ভূমিই গ্রামীণ আয়ের প্রধান উৎস। কিন্তু অন্যান্য স্তরে আমরা কি পদ্ধতি অবলম্বন করবো? বিশেষ করে ভিন্নমুখী আয়ের ক্ষেত্রে? যেমন দালালি ও মাস্তানি করে, ইজারা দিয়ে আয় ইত্যাদি নেগেটিভ আয় (Negative Income) বলে চিহ্নিত। অন্যদিকে শ্রমজীবী, ব্যবসাভিত্তিক, কর্মভিত্তিক আয়কে পজিটিভ (Positive Income) আয় হিসেবে গণ্য করা হয়। দুর্নীতিও একটি আয় এবং এটি নেগেটিভ। যাহোক, দারিদ্র্যের পরিমাপ করার জন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর সাহায্য নেয় যেতে পারে। যেমন ঃ

ক. আয়স্তর বিচারে দারিদ্র্য (মাসিক আয় ১২০০ টাকার নিচে)

খ. কর্মসংস্থান বিচারে দারিদ্র্য (বছরে ৬ মাসের বেশি সময় কায়িকশ্রম দেবার সুযোগ হতে বঞ্চিত)

গ. ভোগের বিচারে দারিদ্র্য (ন্যূনতম ৩৬০০ ক্যালরির কম গ্রহণ)

ঘ. আবাসন অবস্থার বিচারে দারিদ্র্য (যাদের বসবাসের জন্যে নিজস্ব কোন ভিটে-মাটি নেই)

ঙ. পরিবেশগত বিচারে দারিদ্র্য (প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ,-আক্রান্ত)

চ. নিরাপত্তা বিচারে দারিদ্র্য (সামাজিক ন্যায় বিচার পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত)

ছ. শিক্ষা বিচারে দারিদ্র্য (পরিবারের সবাই নিরক্ষর)

জ. স্বাস্থ্য বিচারে দারিদ্র্য (চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত)।

দারিদ্র্যের কারণসমূহঃ

দারিদ্র্যের কারণ একাধিক এবং এ নিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সুস্পষ্ট মতভেদ রয়েছে। তবে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে দারিদ্র্যের কারণ হিসাবে আমরা ধরে নিতে পারিঃ

১. সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার অন্যায্য বন্টন

২. অসম ও বিকৃত বাজার ব্যবস্থা

৩. পরিবেশ দূষণ ও তার ক্ষয়

৪. পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত পারিবারিক, সামাজিক, ও রাষ্ট্রীয় রীতি-নীতি, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি

৫. জবাবদিহিমূলক গণতন্ত্র ও সু-শাসনের বিকাশ না হওয়া

৬. অশিক্ষা

৭. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ অদক্ষতা বা অনীহা

৮. ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা -

৯. প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি।

দারিদ্র্য বিমোচন ও বিভিন্ন মডেল ঃ

দারিদ্র্য বিমোচন শব্দটির মধ্যে অর্থনৈতিক দিক অপেক্ষা মানবিক দিকের প্রাধান্য বেশী। বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্য দূরীকরণে তিনটি ফর্মুলা রয়েছে। প্রথম ফর্মুলা হলো ডাল-ভাত

তত্ত্ব। কিন্তু ডালের কথা হচ্ছে অথচ ডালের আবাদ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। ডাল এখন সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। দারিদ্র্য দূরীকরণের আরেকটি ফর্মুলা হচ্ছে দরিদ্রদের কিছু কিছু ঋণ দেয়া; এতে কোনমতে বেঁচে থাকা যায় কিন্তু দারিদ্র্যের দুষ্ট বলয় থেকে কিছুতেই মুক্ত হওয়া যায় না।

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত আরেকটি প্রয়াস হলো এলিট শ্রেণীমুখী উন্নয়ন (Development Towards Elite Class), যার সূচনা হয় পাকিস্তান আমলে। এলিট শ্রেণীমুখি উন্নয়নের প্রধান কথা "Trickle Down Theory' বা 'চুঁইয়ে পড়া' তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুযায়ী সমুদয় সম্পদ ব্যয় হবে মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর জন্যে। তা থেকে ছিটে ফোঁটা সম্পদ উপচে পড়বে বিপুল সংখ্যাগুরিষ্ঠ গরীবদের জন্যে। ধরে নেওয়া হয়েছে সামগ্রিক জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে তা চুঁইয়ে পড়ে আস্তে আস্তে সাধারণ জনগণের দারিদ্র্যে দূর হয়ে যাবে এবং জনগণের ন্যূনতম মৌলিক অধিকার ও সক্ষমতাগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে। এই হয়ে আসছে এতকাল যাবৎ। উন্নয়নের এই ধারাকে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা উন্নয়নের পালে ফুঁ দিতেছি, যতখানি গাল ফুলিতেছে, ততখানি পাল ফুলিতেছে না'। আমাদের সকল রক্ত মুখে জমছে আর সেই তুলনায় বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কৃশ হয়ে পড়েছে। একে কি সুস্বাস্থ্য বলা যাবে? আমাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। একটি শ্রেণী ফুলে-ফেঁপে উঠছে, অন্যদিকে বাদবাকি সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিলো তার চেয়ে গভীরতর তিমিরে নিমজ্জিত হচ্ছে।

উন্নয়নের নতুন মডেলঃ

IFAD (International Fund for Agriculture Development)-এর প্রধান ইদ্রিস জাজায়রী "Trickle-up" মডেল নামে উন্নয়নের নতুন এক মডেল দিয়েছেন যা তৃণমুল পর্যায় থেকে শুরু করে উপরের স্তরে যাবে। আগের মতো চুঁইয়ে নিচে পড়বে না। দাতা সংস্থা, দেশ, বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী এবং আমাদের আমলা ও মুৎসুদ্দীরা কোন কর্মসূচির বিপরীতে মোট বরাদ্দকৃত সম্পদের ৮১%-ই খেয়ে ফেলে। মাত্র ১৯% যাতে জনগণের জন্যে অবশিষ্ট না রাখার সুযোগ পায় সে চিন্তাই করেছেন জাজায়রী।

দারিদ্র্য বিমোচনে 'Trickle-up' থিওরী বা তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন তত্ত্বকে কার্যকর করতে হলে কৃষিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যে খাতটিতে জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই নিয়োজিত এবং যাদের ৮৬ শতাংশই দরিদ্র। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের 'Empowering the poor' বা দরিদ্রের ক্ষমতায়নের নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্যে কৃষিখাতে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। কৃষকদের শিক্ষার অধিকার দিতে হবে; প্রযুক্তির অধিকার দিতে হবে; দিতে হবে ঋণ, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের অধিকার। সেই সঙ্গে নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করতে হবে উন্নয়নের মূল স্রোতধারার সঙ্গে।

বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের উদ্যোগঃ
ক. সরকারি উদ্যোগঃ

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে এযাবৎকাল যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তন্মধ্যে পরীক্ষামূলক সরকারি, আধা-সরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্বল্প সংখ্যক প্রকল্প উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ প্রত্যক্ষভাবে সরকারি এবং স্বায়ত্তশাসিত (আধা-সরকারি) সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত কর্মসূচির কথা বিবেচনা করা যাক। পল্লী দারিদ্র্য দূরীকরণে সবচেয়ে ব্যাপক এবং উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BARD)'র সমবায় ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচি। যার ভিত্তি স্থাপিত হয় কুমিল্লায়, পরীক্ষিত বিশিষ্ট কৃষক সমবায়ের অবদানে। এ কর্মসূচিটি মূলত কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত যা কৃষিক্ষেত্রে পুঁজি সৃষ্টি এবং পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি করলেও তা বিশেষ কোন অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। এছাড়া সম্পদ ও ক্ষমতা বিন্যাস কাঠামোতে ধনী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অধিক সুবিধা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে বজায় রেখেছে বা আরো বৃদ্ধি করেছে। আমূল আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের কোন সম্ভাবনা এ কর্মসূচির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়নি যাতে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। কৃষি উন্নয়নে এবং সেই হিসেবে পল্লী উন্নয়নে উপরোক্ত কর্মসূচি যে ইতিবাচক ভূমিকাই রাখুক না কেন তা যে গণদারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি হতে পারে না–এর প্রমাণ হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরবর্তীকালের ভিন্নধারার কর্মসূচি। এ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এদেশের পল্লী অঞ্চলের গণদারিদ্র্য নিরসনে অপর যে সরকারি প্রকল্পটি আরো সীমিত পরিসরে পরিচালিত হচ্ছে তা হলো সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'গ্রামীণ সমাজ সেবা প্রকল্প'। এ প্রকল্পের প্রত্যক্ষ আওতায় আছে প্রকল্প এলাকাধীন গ্রামের দরিদ্র পরিবারসমূহ। তাদের আয় বৃদ্ধির জন্যে সহায়তা হিসেবে দেয়া হয় স্বল্পমাত্রার পুঁজি (ঋণ হিসেবে) আর অর্থকরী কাজের জন্যে দেয়া হয় নাম মাত্র প্রশিক্ষণ। এতে এসব দরিদ্র পরিবার কিছু রোজগারের অবলম্বন পায় এবং দারিদ্র্যসীমা ঘেঁষেই জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুযোগ এমনকি অপ্রত্যাশিত কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় টিকে থাকার অবলম্বন প্রকৃত প্রস্তাবে এই কর্মসূচির মধ্যে নেই। এমনি ধরনের আরো একটি কর্মসূচি রয়েছে ইউনিসেফ-এর সাহায্যে পরিচালিত স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতায়। প্রায়শই এসব সরকারি কর্মসূচি অনেকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ফলে দেশের সকল এলাকা জুড়ে এ ধরনের কর্মসূচি দরিদ্র জনগণের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন কল্যাণ বয়ে আনছে না।

খ. বিকল্প প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা ঃ বেসরকারি উদ্যোগ

স্বাধীনতা লাভের পর সরকারি উদ্যোগে গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বটে তবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়টি সরকারি নীতির কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা হলেও তা গ্রামীণ ভূমিহীন ও দরিদ্র শ্রেণীর কোন উপকারে আসেনি; বরং সরকারের শহরমুখী স্বার্থপরতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। সরকারের পল্লী উন্নয়ন প্রচারণা এবং কার্যত নগর উন্নয়নমুখী প্রবণতা এক ধরনের

উন্নয়ন সংকট সৃষ্টি করেছে। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানের ১৬নং অনুচ্ছেদে কৃষি বিপ্লব, বিদ্যুতায়ন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তন করে গ্রামীণ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।[১৯] বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ ১৯৫২ সাল থেকে ভি-এইড (V-Aid) কর্মসূচির মাধ্যমে যাত্রা শুরু হলেও তা সুদীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী কার্যকর উন্নয়ন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। সরকারি কর্মসূচিগুলো বাংলাদেশের উন্নয়ন-প্রশ্নে সব সময় এক ধরনের সংকটকাল অতিক্রম করেছেন। সরকারের গৃহীত এসব পদক্ষেপ বাংলাদেশের জন্যে এক ধরনের পরীক্ষণমূলক কর্মসূচি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।[২০]

পল্লী উন্নয়নের গতানুগতিক প্রচলিত কাঠামোর ফলপ্রসূতার অভাবে পল্লী অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থঅর ক্রমাবনতি, ভূমিহীনদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, নিঃস্বকরণ ও এর বিপুল ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালে পল্লী উন্নয়নের বিকল্প পথ উদ্ভাবনের তাগিদ অনুভূত হয়। ফলশ্রুতিতে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি বেসরকারি কিছু সংগঠনও পল্লীকেন্দ্রিক নতুন নতুন কর্মসূচি হাতে নেয়। পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহের দুর্বলতা অতিক্রম করে গ্রামীণ জনসমষ্টির দরিদ্রতম অংশের জীবনের মানোন্নয়নই এসব প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

এ কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক রূপই হচ্ছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও। যারা তাদের ভাষায় উন্নয়নকে এদেশের তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দিতে আত্মনিবেদিত। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এনজিও কার্যক্রম আজ ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং এসব দেশের গরীব জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও নন্দিত। দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের কাছেও রয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা। স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশে বা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বেসরকারি উদ্যোগ মূলত মাতৃমঙ্গল, পরিবার পরিকল্পনা, মসজিদ, মিশন, মন্দির কমিটি ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও স্বাধীনতা লাভের পর এদেশে বেসরকারি সংস্থাসমূহের কার্যক্রমে নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। সংস্থাগুলোর বেশিরভাগ ১৯৭১-এর যুদ্ধের পর জরুরী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি থেকে যাত্রা শুরু করে দরিদ্র এবং অসহায়দের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে অর্থনীতি, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনাসহ অন্যান্য কর্মসূচি প্রবর্তন করেছে। এগুলোর মধ্যে বেশকিছু আন্তর্জাতিক সংস্থাও রয়েছে যারা এদেশের পল্লী এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। এসব সংস্থার মধ্যে কেয়ার, হিড (বাংলাদেশ), অক্সফাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থাসমূহ বাংলাদেশের উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। যেমন-ইউনিসেফ মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা, শিক্ষা বিস্তার, পুষ্টি উন্নয়ন, নারী কল্যাণ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধমূলক কর্মসূচির অধীনে পরিচালিত কার্যক্রম, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (ইউনেস্কো) শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং বিকাশের লক্ষ্যে গ্রামীণ স্কুলগুলোতে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ

প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর কয়েক হাজার টিউবওয়েল বিতরণ করা হয়। এসব বিদেশী সংস্থা ছাড়াও বেশকিছু সংখ্যক দেশীয় সংস্থা পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে (সারণী-৪)।

সারণী - ৪

দারিদ্র্য বিমোচনে অ-কৃষিখাতে বিতরণকৃত ঋণ প্রবাহ (মিলিয়ন অংকে)

প্রতিষ্ঠান	বৎসর				
	১৯৮৯-৯০	১৯৯০-৯১	১৯৯১-৯২	১৯৯২-১৯৯৩	১৯৯৩-৯৪
ক. সরকারি প্রতিষ্ঠান	১৪১.৩৯	২৬৪.৯৪	২০৩.৫৯	৬২৬.৭২	১০৪৪৮১
(মোট) মহিলা বিষয়ক	-	৩.৪৯	-		৬০.২১
মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পল্লী	-	৬১.৯৭	-	৩.২৮(১৭৩৫)	১০১.৬৬
উন্নয়ন বোর্ড	১৪১.৩৯	১৯৯.৪৮	২০৩.৫৯	৬৮.০০(৪৯)	৮৮২.৯৪
	(৪১)	(২)	(১৬৮)	৪৪৫.৪৪ (৬২)	
খ. বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ	২৭৫০.৫৪	৩৪৫৬.৮১	৭৯৬৩.৪০	১২৫৪৩.৯৭১	২১৬২৮.০৭
(মোট)	৩৭০.০৪	৫২৮.৪১	৬৪৫.১৯	১০৪.৯৭	১৭০০.৬৪
ব্র্যাক	(৪৩)	(২২)	(৭১)	(৫৪)	১৮৬৯৪.৯৫
গ্রামীণ ব্যাংক	২২৬২.৯০	২৬৩৯.১০	৫২০৩.৯০	১০৬২২.০০	(৭৬)
প্রশিকা	৪২.৮০	(১৭)	(৯৭)	(১০৪)	২৬১.২১)
আশা	-	৯৮.২৬	১০৩.৫৩	১৯১.৪১	(৩৬)
স্বনির্ভর বাংলাদেশ	৭৪.৮০	(১৩০)	(৫)	(৮৫)	৮৮৭.৯০
	(২৪)	৯৮.১১	১৯৪.৭৭৪	৫৭২.৬৭	৭৯.৩৭
		(৯৯)	(১৯৪)	(৫৫)	
		৯২.৯৩	৬৩.০৪	৫২.৯২	
		(-৫৩)	(২৩)	(৫০)	
গ. ব্যাংকসমূহ (মোট)		৩৩৪১.৮০	৪১২৫.০০	৪৪৩১.২০	৫৮৩৬.৬০
জাতীয়করণকৃত ব্যাংকসমূহ		২৮২.১০	৪২১.২০	৫৪২.৫০	৯৪৯.৮০
		(৪৯)	(২৯)	(৭৫)	
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকও		৩০০২.০০	৩৬৩৭.১০	৩৮১৬.৬০	৪৮৭৫.২০
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক			(২১)	(৫)	(২৮)
ব্যক্তি মালিকানাধীন		৫৭.৭০	৬৬.৭০	৭২.১০	১১.৬০
ব্যাংকসমূহ					
সর্বমোট (ক+খ+গ)	২৮৯১.৯৩	৭০৬৩.৫৫	১২২৯১.৯৯	১৭৫৯১.৮৯	২৮৫০৯.৪৮

টীকা ঃ গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক ও আশার তথ্যগুলো গৃহায়ণ ঋণ বহির্ভূত ও পঞ্জিকা-বর্ষ অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। তথ্যে গৃহায়ন ঋণ ধরা হয়নি।

(সূত্র ঃ অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা ঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, পৃঃ ২০০।)

এক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক, ব্রাক, আশা'র কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামীণ ব্যাংকের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ১৯৯০ সালে তাদের সর্বমোট ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ছিলো ৮,৫২,৫২২ জন। ১৯৯০ সালে এ ব্যাংকের বছর ভিত্তিক অকৃষি খাতে ঋণদানের পরিমাণ ২২৬২.৯০ মিলিয়ন টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৪ সনে ১৮৬৯৮.৯৫ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। ১৯৯০ হতে ১৯৯৪ পর্যন্ত ঋণ বিতরণের বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি ছিলো শতকরা ২৪ ভাগ। এখানে উল্লেখ্য, গ্রামীণ ব্যাংকের মোট সদস্যের শতকরা ৯৪ ভাগ মহিলা এবং মোট বিতরণকৃত ঋণের শতকরা ৯১ ভাগ পেয়েছে মহিলা সদস্যগণ। নভেম্বর ১৯৯৯ পর্যন্ত এ সংস্থাটি ১১৪৩টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ৩৯,৬৩৫টি গ্রামে তাদের ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের পরেই ব্র্যাকের স্থান। ১৯৯৬ সনের তথ্য অনুযায়ী, এই সংস্থা ৩২১০২টি গ্রামে ঋণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করেছে ২২,৬০২টি গ্রামে। ব্র্যাক দল গঠন সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্রাকের দলীয় সদস্য সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৮ লক্ষ তন্মধ্যে ৮৫ শতাংশই মহিলা। ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এ সংস্থাটি ১৪৭২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। সংস্থাটি সাধারণত স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ বরাদ্দ দিয়ে থাকে যার পরিমাণ ১০০০ থেকে সর্বোচ্চ ১০,০০০ টাকা। ব্র্যাক কার্যক্রমের দুটি বিশেষ দিক হলো দারিদ্র্য বিমোচন ও গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর ক্ষমতায়ন।[২১] ব্রাকের মোট ঋণ গ্রহীতার শতকরা ৮৮ ভাগ মহিলা এবং মোট ঋণের শতকরা ৮৭ ভাগ পেয়েছে মহিলা সদস্যগণ। গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক উভয়ে তাদের স্ব-স্ব কর্মকাণ্ডকে বাংলাদেশের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী অঞ্চলে বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আশা ১৯৯১ সালে ঋণ বিতরণ করেছিল ৯৮.১১ মিলিয়ন টাকা যা ১৯৯৪ সালে জাতীয় কর্মসূচি হিসেবে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮৮৭.৯০ মিলিয়ন টাকা এবং ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ১৯৯৪ সালে দাঁড়ায় ২,৬২,৪২৯ জনে। স্বনির্ভর বাংলাদেশ ও প্রশিকার ১৯৯৩-৯৪ সনে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ছিলো যথাক্রমে ২৬,৯৭২ জন ও ১,৩৩,৯৭৮ জন এবং বছর ভিত্তিক ঋণদান ছিলো ৭৯.৩৭ মিলিয়ন ও ২৬১.২১ মিলিয়ন টাকা। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশীয় এসব ক্ষুদ্রঋণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পল্লী দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এক নব দিগন্তের সূচনা করে চলেছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত এ জাতীয় ক্ষদ্র ঋণের উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৬ কোটি যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৬%।[২২] এসব সংস্থার গৃহীত কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য সরকারি কর্মসূচির বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্নতর। এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন লোকদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি, বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের প্রবল আগ্রহ, নিজেদের মাঝে একতা ও সংঘবদ্ধতা এবং সম্মিলিত উদ্যোগ সৃষ্টি করে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের নিমিত্তে একটা গতিময়তা সৃষ্টি করা (সারণী-৫)।

সারণী - ৫

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বিস্তার ও তার ইতিবাচক দিকসমূহ

কর্মকাণ্ডের আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা	৪০ হাজার
সুফলভোগী পরিবার সংখ্যা	৩৫ লাখ
নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী সংখ্যা	১ লক্ষাধিখ
দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)
উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৩০ হাজার
উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	৮ লাখ
উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	১০ লাখ
বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা	৪৪ হাজার
স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা	২০ লাখ
স্বাক্ষরতা লাভের প্রক্রিয়াধীনের সংখ্যা	৯ লাখ (১৯৯৪)
রোপিত বৃক্ষের সংখ্যা	৪ কোটি

(সূত্র ঃ অধুনা, এডাব-এর ২০ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯৪)

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যে, কোনো এলাকার সম্পদ বিন্যাসের জন্যে বিশ্ব-ক্ষমতা কাঠামো পরিবর্তন করে দরিদ্রদের উন্নতির অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। তবে সচেতনতা, উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ও সংঘবদ্ধ তৎপরতা সৃষ্টি করে দরিদ্রদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে তারা অধিক সফল-একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যেমন-ডায়রিয়া চিকিৎসায় খাবার স্যালাইন এবং ছয়টি মারাত্মক ব্যাধির প্রতিষেধক হিসেবে টিকাদান কর্মসূচি, নারী উন্নয়ন, সঞ্চয়, শিক্ষা, বনায়ন প্রভৃতি কার্যক্রমে বেসরকারি সংস্থাসমূহের অবদান রয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল ঃ

নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থানের পর পরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পরিকল্পনা উপদেষ্টামণ্ডলীর অনুপ্রেরণায় উন্নয়ন সমস্যা মোকাবেলার জন্যে ২৯টি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। দারিদ্র্য বিমোচন সম্পর্কিত টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদনে (মাহবুব হোসেন ও অন্যান্য, ১৯৯২) বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের যে তিনটি এ্যাপ্রোচ বা কৌশলের কথা বলা হয়েছে সেগুলো দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর জন্যেও সমভাবে প্রযোজ্য। এ তিনটি কৌশল হলো–

ক. শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসহ সামাজিক খাতসমূহে বিনিয়োগ বাড়িয়ে মানুষের সক্ষমতা সেই সঙ্গে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করতে হবে।

খ. ম্যাক্রো অর্থনীতির কাঠামো ঢেলে সাজিয়ে অর্থনৈতিক নীতি-কৌশলকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন গরীবদের আয় বাড়ে এবং প্রবৃদ্ধিতে তাদের অবদান বৃদ্ধি পায়।

গ. বাজার ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন নীতিমালা বাস্তবায়ন সত্ত্বেও গরীবদের একটি অংশ, যারা চরম দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাস করে তারা সক্ষমতা অর্জনে সফল নাও হতে পারে। নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করার লক্ষ্যে তাদের আয় বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং কর্মসংস্থান ও স্ব-নিয়োজনের সুযোগ সৃষ্টির কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

বিআইডিএস থেকে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় (রহমান ও হোসেন, ১৯৯২) আরো সুনিদিষ্টভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের কিছু নীতি বির্ধারণের তাগিদ এসব নীতিমালার মধ্যে রয়েছে–

১. গরীবরা একটি মাত্র আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। এদেশের এক-চতুর্থাংশ মানুষ শ্রমজীবী। বাজার নির্ভরতার বাইরেও এদের বড় একটি অংশ গৃহস্থালি ও প্রকৃতিনির্ভর। এদের জন্যে তাই স্ব-নিয়োজনের সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। এদেরকে লক্ষ্য হিসেবে ধরে নিয়ে ঋণ কর্মসূচি, দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারিক শিক্ষাদানের কার্যক্রম গ্রহণ করে এদেরকে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পশুপালন, মৎস্যচাষ ও বনায়ন কর্মসূচির প্রসার এই স্ব-নিয়োজন প্রক্রিয়াকে বেগবান করতে পারে।

২. লক্ষ্যনির্ভর দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে ভূমিহীন ছাড়াও প্রান্তিক চাষীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। তাদের সক্ষমতা বাড়ানো বিশেষ করে তারা যেন তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়, সে রকম একটি পরিবেশ তৈরিতে উপযুক্ত সমর্থন দিতে হবে।

৩. দরিদ্ররা প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ে পড়লে দ্রুত নিঃস্ব হয়ে যায়, আর আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে না। সেজন্যে ম্যাক্রো অর্থনীতিতে এমন কিছু ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে দুর্বিপাকের সময় তাদের স্বার্থ ক্ষুন্ন না হয় এবং ব্যক্তি ও সম্প্রদায় পর্যায়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনষ্ট না হয়। সেজন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কাঠামোয় বিদ্যমান সুযোগ বিতরণ চালু রাখা, কার্যকর প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো, রাষ্ট্রের নিপীড়ন বন্ধের জন্যে পুলিশ, নিম্ন বিচার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো ও তাদের দায়বদ্ধতা বাড়ানো এবং স্থানীয় সরকার কাঠামোর শক্তি বৃদ্ধি ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সচল করার উদ্যোগ নিতে হবে।

৪. চরম দারিদ্র্যে নিপতিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কর্মসূচি চালু রাখতে হবে। আঞ্চলিক বিভাজন, মৌসুমী মন্দা ইত্যাদির কথা মনে রেখে এই বিশেষ কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

৫. টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গ্রাম পর্যায়ে সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুতায়ন এবং পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন করতে হবে।

৬. মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্যে স্থানীয় সরকার কাঠামোকে জোরদার করতে হবে এবং গরীবদের বিকল্প ক্ষমতায়নের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায় ঃ

দারিদ্রের বিষয়ে Friedlander যে মন্তব্য করেছিলেন 'Poverty has always been with us and undoubtedly will be' দারিদ্র্য সমাজে সবসময় ছিলো এবং নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতেও থাকবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ধরে নেয়া যায়, দারিদ্র্য থাকবে এ সমাজে।

কিন্তু তাই বলে নৈরাশ্যবাদীদের কাতারে শামিল হওয়া তো চলবে না। উদ্যোগ প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে অন্তত পুরোপুরি দূর না হলেও যাতে হ্রাস পায় মানবতার চিরবঞ্চনারূপী দারিদ্র্য নামের এ অভিশাপ। এ বঞ্চনা থেকে মুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজন সুষ্ঠু নীতিমালা, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সমন্বিত কর্মসূচির বাস্তবায়ন। স্বল্পমেয়াদী ও বিচ্ছিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র্যের বল্গাহীন গতিকে, কোনো মতেই রোধ করা সম্ভব নয়। বাস্তব এবং তথ্যভিত্তিক ধারাবাহিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তার যথাযথ বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা ব্যতীত শুধুমাত্রা বাহ্যিক সাহায্য নির্ভর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান আশা করা বাতুলতা মাত্রা।

প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি ঃ

স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দর্শন ছিল অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শর্তযুক্ত বৈদেশিক ঋণ বা অনুদান সম্পূর্ণরূপে বর্জন। কিন্তু বাস্তবতা? বাস্তবতা হচ্ছে 'মানি ইজ নো প্রবলেম'-এর খাতক-সংস্কৃতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে উন্নয়নের নামে গত একুশ বছরে বিদেশীদের কাছ থেকে আমরা অমর্যাদাকর ভিক্ষা বা সাহায্য গ্রহণ করেছি এক লাখ কোটি টাকা। আমাদের মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ আজ ১৩৩ ডলার। শর্তযুক্ত ঋণ বা ভিক্ষা-সংস্কৃতি উদ্ধমুখিতা-এর বিপরীতে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে ঘিরে সমানতালে আবর্তিত হচ্ছে উন্নয়নের নিম্নমুখিতা। ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরের প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩.৩ ভাগ থেকে বেড়ে গত এক দশকে মাত্র ৫ ভাগে উপনীত হয়েছে। বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি একটি স্থায়ী ঘটনা, যার পরিমাণ বছরে ১৫ থেকে ২০ লাখ টন। নগরায়ন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে দেশটিতে। ফলে অস্বাস্থ্যকর, নোংরা বস্তির সম্প্রসারণ ঘটছে রাজধানীসহ অন্যান্য প্রধান নগরীগুলোতে। চুরি, ছিনতাই, মাস্তানি, চাঁদাবাজি, রাজনৈতক সন্ত্রাস আর দশটা সাধারণ ঘটনার মতোই স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হচ্ছে নাগরিক জীবন। বন উজাড়, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, পরিবেশ দূষণ, অপরিকল্পিত গ্রামীণ অবকাঠামো, মরুকরণ, বন্যা–প্রভৃতির ভয়াবহতা দেশটিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে।

এদেশের মোট ভূমির প্রায় ৩০ শতাংশ প্রতিবছর বন্যায় আক্রান্ত হচ্ছে। ঘটছে ফসলহানি, বাড়ছে দারিদ্র্য। বন্যা ও নদী ভাঙন প্রক্রিয়ার আবর্তে প্রতিবছর সহায়-সম্বলহীন বা নিঃস্ব হচ্ছে শত শত পরিবার। এসব পরিবারের ছেলেরা শ্রমবাজারে জায়গা পেলে ভালো, কিন্তু নাপেলে জড়িত হচ্ছে সমাজ বিরোধী কর্মকাণ্ডে। মেয়েরা পাচার হচ্ছে দেশের বাইরে কিংবা

আশ্রয় মিলছে দেশেরই কোনো পতিতালয়ে। দেশে কোটিপতি বৃদ্ধির ধারাক্রম স্বাধীনতা-পূর্ব তেরো থেকে তেরোশ'-এর দিকে ধাবমান। অন্যদিকে, দারিদ্র্য বৃদ্ধির স্রোত প্রবলগতিতে উজান অভিমুখে বহমান। প্রত্যাশার স্বপ্ন, যা স্বাধীনতা অর্জিত হবার পর দেখেছিলো এদেশের জনগণ, তার সঙ্গে প্রাপ্তির ব্যবধান বিস্তর।

উপসংহার ঃ

সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক প্রতিকূলকতার বলয়ে বন্দী বাংলাদেশের যে উন্নয়ন, তাকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য সামাজিক জরিপ ও গবেষণা, সুনির্দিষ্ট জাতীয় নীতি প্রণয়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও শিক্ষার প্রসার, কৃষির সার্বিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিতকরণ, গণমুখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তোলা, যোগাযোগ, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সরকারি বিভাগ এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়, গণমুখী প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সহজলভ্যতা, দরিদ্র জনগণকে সংগঠতি করা, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি, ভূমিস্বত্ব প্রথার সংস্কার সাধন এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অঙ্গকার প্রয়োজন।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কৃষি উন্নয়ন এবং কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন ছাড়া দারিদ্র্য নিরসন মোটেই সম্ভব নয় কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবার পর যখন সৃষ্টি হবে প্রচুর উদ্বৃত্ত তখন তা শিল্পের বাজার ও বিনিয়োগের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরী করবে। আবিস্কৃত হবে চৌদ্দ কোটি মানষের একটি বিরাট বাজার। তখন কর্মসংস্থান হবে; বেকারত্ব দূর হবে; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি হবে। সুতরাং শুরু করতে হবে কৃষি দিয়ে। কেননা, আমাদের দেশের কৃষির সম্ভাবনা প্রচুর। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, কৃষি বিপ্লবের হাত ধরেই আসে শিল্প বিপ্লব। কৃষির উদ্বৃত্তই সৃষ্টি করে শিল্পের পুঁজি এবং লাভজনক কমসংস্থানের ক্ষেত্র। চীনের জিডিপি (GDP)-র হার বর্তমানে সর্বোচ্চ ১২%। এটা সম্ভব হয়েছে এ পথেই। কাজেই কৃষির উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নিরসন পরস্পর সম্পর্কিত। এছাড়াও দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার। রাজনীতি ও উন্নয়ন অবিভাজ্য। উন্নয়ন ও উৎপাদনমুখী রাজনীতি জনগণের সঙ্গে একাত্মতার প্রধান স্তম্ভ উন্নয়নের অনুকূলে। তাই উপযুক্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্য নিম্ন পর্যায়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি অপরিহার্য। এতে উন্নয়ন প্রক্রিয়া নিম্ন পর্যায়ে প্রবাহিত হবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে আর্থিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার। একেই বলা হয় Participatory Development Model, যে মডেলে কর্মরত মানুষ বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত মানুষ উন্নয়নের মুখ্য উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই মডেলে মানুষ সমস্যা নয় বরং মানুষই সমস্যার সমাধান। দারিদ্র্য দূর করাই যদি প্রধান রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচ্য বিষয় হয় তাহলে মানুষের সৃজনশীল উদ্যমকে কাজে লাগাতে হবে; তৃণমূল পর্যায়ে সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। এটাই হচ্ছে দারিদ্র্য নিরসনের স্বীকৃত কৌশল।

তথ্যনির্দেশিকাঃ

* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুক, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস্, বাংলাদেশ সরকার ২০০১, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
* (২০০১) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
* প্রাগুক্ত
* সম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, জুন ২১, ২০০৩।
* হোসেন মনির, বেকারত্ব বেড়েই চলেছে, চাকুরী যেন সোনার হরিণ, দৈনিক যুগান্তর ২৯ জুলাই ২০০৩।
* হোসেন মোঃ আবুল ও হোসেন মোকাম্মেল, উন্নয়ন প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, ১৯৯৯, গতিধারা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০০১, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্টাটিসটিকস্, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
* বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ২০০১, পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ১৯৯৯, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
* মোহাম্মদ আনু, উন্নয়নধারার সাতাশ বছরঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি রাষ্ট্র ও সমাজের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ, ১৯৯৯, লোকপ্রশাসন সাময়িকী, ১৪শ সংখ্যা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
* মাহবুবুজ্জামান আ. ক. ম, বাংলাদেশে দারিদ্র্যের গতি-প্রকৃতি এবং দারিদ্র্যে বিমোচনে গৃহীত সরকারি বেসরিকারি কার্যক্রম, ডিসেম্বর ২০০১, লোকপ্রশাসন সাময়িকী, একবিংশতিতম সংখ্যা, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।
* কর্মকার অরুণ, দেশে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছেই, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩।
* মাহমুদ সুজন, বায়ান্ন হাজার কোটি টাকার স্থিতিশীল অর্থনীতির বাজেট, সাপ্তাহিক।
* খবরের কাগজ, ২২ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা, জুন ২৪, ২০০৩।
* হোসেন মোঃ আবুল ও হোসেন মোকাম্মেল, উন্নয়ন প্রসঙ্গঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত, গতিধারা প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
* শফিকুজ্জামান, কার নির্দেশে চলছে বাংলাদেশের অর্থনীতি, দৈনিক আজকের কাগজ, সেপ্টেম্বর ২০০৩।
* শফিকুজ্জামান, প্রাগুক্ত।

* সম্পাদকীয়, দৈনিক সংবাদ, জুন ২১, ২০০৩।
* কর্মকার অরুণ, দেশে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য বাড়ছেই, দৈনিক ইত্তেফাক, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩।
* দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্পর্কে ইফাদ-এর প্রাক্তন সভাপতি ইদ্রিস জাজায়রীর সাক্ষাতকার, দৈনিক সংবাদ, ২১ জানুয়ারী ১৯৯৩।
* মিয়া আহমদুল্লা, বাংলাদেশে গণদারিদ্র্য মোচনের পন্থা, সামাজিক বিজ্ঞান সমিতি, বাংলাদেশ, মে ১৯৮৫।
* The Constitution of the People's Republic of Bangladesh.
* Faaland Just and Parkinson J. R. (1986) Bangladesh-the test case for developement, UPL, Dhaka.
* BRAC Annual Report, 1996.
* চৌধুরী মসিহ্ মালিক, ক্ষুদ্রঋণ প্রসারের সম্ভাবনা, দৈনিক ভোরের কাগজ, অক্টোবর ২০, ২০০৩।